সুশৃঙ্খল সমাজ বিনির্মাণে ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্মের ভূমিকা

(Role of Applied Buddhism in Making Well-Disciplined Society)

রত্না রানী দাস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি. ডিগ্রি প্রাপ্তির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

জুন ২০২৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, রত্না রানী দাস কর্তৃক উপস্থাপিত **'সুশৃঙ্খল সমাজ বিনির্মাণে ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্মের ভূমিকা' (Role of Applied Buddhism in Making Well-Disciplined Society)** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। অভিসন্দর্ভটি বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্যকোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রি প্রাপ্তির জন্য উপস্থাপন করেননি। আমি অভিসন্দর্ভটি পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের অধীনে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জনের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করার জন্য চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করছি।

ড. নীরু বড়ুয়া
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক
ও
সহযোগী অধ্যাপক
পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

সূচি

ভূমিকা
অবতরণিকা
প্রথম অধ্যায় : ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্মের উৎস বিচার প্রসঙ্গ
দ্বিতীয় অধ্যায় : সমাজ বিনির্মাণে বুদ্ধের শিক্ষা-দর্শন : প্রায়োগিক ব্যবহারের স্বরূপ অন্বেষণ
প্রথম পরিচ্ছেদ : দুর্নীতি, মাদকাসক্ত, নৈতিক অবক্ষয় এবং নিরসন
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সমতা নিশ্চিতকরণ
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : মৃতুদণ্ড, গর্ভপাত, আত্মহত্যা, মানসিক হত্যা এবং প্রতিকার
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : বুদ্ধের প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতির প্রয়োগ
তৃতীয় অধ্যায় : টেকসই পরিবেশ সংরক্ষণে বুদ্ধের শিক্ষা
চতুর্থ অধ্যায় : বুদ্ধের শিক্ষা-দর্শন ও সুশাসন : প্রায়োগিক বিশ্লেষণের রূপ-রূপান্তর
উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

আমার পিএইচ.ডি. গবেষণাকর্মের শিরোনাম **'সুশৃঙ্খল সমাজ বিনির্মাণে ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্মের ভূমিকা' (Role of Applied Buddhism in Making Well-Disciplined Society)**। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের অধীনে উপরি-উক্ত শিরোনামে ২০২০–২০২১ শিক্ষাবর্ষে (রেজি নং : ৫৯/২০২০-২০২১) পিএইচ.ডি. গবেষণাকর্মের জন্য নিবন্ধন লাভ করি। গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ড. নীরু বড়ুয়া- এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে আমি অভিসন্দর্ভটি রচনা করি। আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ড. নীরু বড়ুয়া-এর গভীর জ্ঞান, নিষ্ঠা ও আন্তরিক নির্দেশনায় অভিসন্দর্ভটি রচিত হয়েছে।

আধুনিক সমাজে নানাবিধ চ্যালেঞ্জ ও প্রতিকূলতার মধ্যেও বৌদ্ধধর্মের ব্যবহারিক দর্শন ব্যক্তি, পরিবার ও রাষ্ট্রে কীভাবে শান্তি, সদ্ভাব, সম্প্রীতি, নৈতিকতা ও সামাজিক সুশৃঙ্খলা স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখতে পারে তা এই গবেষণার মূল উপজীব্য বিষয়। সংসার, কর্মজীবন ও গবেষণার সমন্বয় সাধন করা সহজ ছিল না কিন্তু তত্ত্বাবধায়কের অক্লান্ত আন্তরিক সহযোগিতা, প্রাজ্ঞ পরামর্শ এবং অনুপ্রেরণা এই কাজ সম্পন্ন করতে আমি সক্ষম হয়েছি।

ড. নীরু বড়ুয়া-এর গবেষণাগত দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞা, বিশ্লেষণী দক্ষতা, সর্বোপরি অনুপ্রেরণামূলক নির্দেশনা এই অভিসন্দর্ভকে একটি সুসংহত রূপ দান করেছে। তাঁর স্নেহ, আন্তরিকতা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ পরামর্শ আমার গবেষণাকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি আমাকে একজন প্রকৃত গবেষক হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। আমি তাঁর প্রতি অন্তরের অন্তস্থল থেকে গভীর শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পাশাপাশি ঋণস্বীকার প্রকাশ করছি।

এই গবেষণা শুধু তাত্ত্বিক বিশ্লেষণই নয়, বরং বাস্তবজীবনে বৌদ্ধদর্শনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ কীভাবে একটি সুশৃঙ্খল ও সমৃদ্ধ সমাজগঠনে ভূমিকা রাখতে পারে, তা অনুসন্ধানের একটি গভীর প্রয়াসমাত্র। আশাকরি, এই গবেষণাকর্ম সামাজিক উন্নয়ন ও আত্মিক পরিশুদ্ধির পথে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। এই গবেষণাকর্মে বিভিন্ন প্রাজ্ঞ ও সুধীজন তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ, সমালোচনা ও নির্দেশনা দিয়ে আমার গবেষণাকে অগ্রসর করতে সহায়তা করেছেন এবং অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি এণ্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের সুপার নিউমারারি খ্যাতিমান অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া, কিশোরগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি এণ্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানীয় উপ-উপাচার্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি এণ্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. সুমন কান্তি বড়ুয়া, অধ্যাপক ড. বেলু রানী বড়ুয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি এণ্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান ও সহযোগী অধ্যাপক ড. শান্টু বড়ুয়া - এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়াও আমার এই গবেষণা কর্ম সম্পাদনে সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ড. অসীম সরকার, অধ্যাপক ড. চন্দনা রানী বিশ্বাস, দর্শন বিভাগের ড. রেবেকা সুলতানা, সহকারী অধ্যাপক আরিনা খাতুন জিনিয়া, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক নাজমা, ট্যুরিজম এণ্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগের সহকারী অধ্যাপক উচিং লয়েন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও অধ্যাপক ড. জ্ঞানরত্ন শ্রমণসহ আরও অনেকেই আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করে গবেষণাকর্ম সম্পাদনে উৎসাহ যুগিয়েছেন। আমি তাঁদের কাছে ঋণী ও কৃতজ্ঞ।

তাছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি এণ্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যাপক ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়ার নাম বিশেষভাবে স্মরণ করছি। তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য, গবেষণাগত অন্তর্দৃষ্টি এবং আন্তরিক সুপরামর্শ এই অভিসন্দর্ভকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করতে অপরিসীম ভূমিকা রেখেছে। তাঁর শিক্ষকসুলভ স্নেহ, অমায়িক নির্দেশনা এবং জ্ঞানগর্ভ মতামত আমাকে গবেষণার জটিল বিষয়গুলো সহজ করার দিকনির্দেশনা দিয়েছে। তাঁর কাছ থেকে সতত প্রাপ্ত প্রেরণা ও জ্ঞানচর্চার আদর্শ আমার জন্য এক অমূল্য সম্পদ এবং চলার পথের পাথেয় স্বরূপ। আমি তাঁর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ ও ঋণী, এবং এই ঋণ কোনোদিন শোধ করার নয়।

এছাড়াও, গবেষণা পর্বে বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ, সহকর্মী. সহপাঠী এবং গ্রন্থাগারিকসহ অন্যান্যদের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা ছাড়া গবেষণাটি সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না। এই গবেষণাকর্মের পেছনে আমার পরিবারের অবদান অপরিসীম। আমি গভীর কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি সহকারে জন্মদাতা পূজনীয় মা-বাবা-কে স্মরণ করছি, যাঁদের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও অফুরন্ত উৎসাহ আমাকে এই গবেষণার পথে অবিচল থাকতে সাহায্য করেছে। তাঁদের প্রার্থনা ও আর্শীবাদই আমার চলার পথের শক্তি ও সাহস। আমার ভাই-বোন, সন্তান ও পরিবারের সকল সদস্যের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ, যারা আমাকে এই দীর্ঘ গবেষণাকালে ধৈর্য্য সহকারে সহযোগিতা করেছেন, সময় দিয়েছেন এবং নানাভাবে গবেষণাকর্ম সম্পাদনে উৎসাহিত করেছেন। তাঁদের সহমর্মিতা ছাড়া এই কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না।

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট-এর সহযোগী অধ্যাপক ও আমার স্বামী ড. ইমন কুমার দে-এর প্রতিও কৃতজ্ঞ। তিনি আমাকে নানাভাবে সহায়তা করে আমার গবেষণা কর্ম সম্পাদনে সর্বদা অনুপ্রেরণা ও সাহস দিয়েছেন। পরিবারই আমার শক্তি। আমার প্রেরণার মূলউৎস। তাঁদের অবদান শুধু এই গবেষণাপত্রেই নয়, বরং আমার সমগ্র জীবনে চলার পথের নৈতিক শক্তি। আমি তাঁদের সকলের কাছে চিরঋণী।

Dhaka University Institutional Repository

অবতরণিকা

বুদ্ধ শান্তিপূর্ণ ও সৌহার্দময় সমাজগঠনে সাম্য, মৈত্রী, মানবতা ও শান্তির অমীয় বাণী প্রচার করে গেছেন। তাঁর নিদের্শিত নীতি-নৈতিকতা আদর্শ মানবিকতায় পরিপূর্ণ ও ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল তেমনি অহিংস বাণী ও জীবপ্রেম বিশ্বব্যাপী বিপুল সমাদৃত। একইসাথে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় তাঁর শিক্ষা-দর্শন অসামান্য ভূমিকা পালন করতে পারে। বুদ্ধ যিনি মহান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিজ্জাচরণসম্পন্নো, সুগত, লোকবিদূ, অনুত্তরো পুরিসধম্মসারথি, সত্থা দেবমনুস্সানং, বুদ্ধো, ভগবা তিনি খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের কপিলাবস্তু (বর্তমান নেপাল) অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে সুমণ্ডিত লুম্বিনী উদ্যানে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন রাজা শুদ্ধোদন এবং মাতা রানি মহামায়া। জন্মের পরে পঞ্চম দিনে আটজনগণক (রাম, দ্বিজ, লক্ষণ, মন্ত্রী, ভোজ, সুয়াম, সুদন্ত ও কৌণ্ডিণ্য) ব্রাহ্মণ নামকরণ দিবসে উপস্থিত হোন। তাঁদের মধ্যে সাতজনই বলেন তিনি যদি গৃহে থাকেন তবে রাজচক্রবর্তী রাজা হবেন। আর সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করলে বুদ্ধ হবেন। গণক ব্রাহ্মণদের মধ্যে সর্বকনিষ্ট ছিলেন 'কৌণ্ডিণ্য' যিনি একমাত্র তর্জনী উঁচিয়ে বলেছিলেন কুমার 'বুদ্ধ' হবেন। নামকরণ দিবসে রাজপুত্রের নাম রাখা হয় 'সিদ্ধার্থ'। যথাসময়ে তিনি শিশু- কৈশোর পেরুলেন। সিদ্ধার্থকে সংসারে আবদ্ধ রাখতে পিতা রাজা শুদ্ধোদন প্রাসাদের বাইরের যাপিতজীবনের দুঃখ কষ্ট থেকে তাঁকে দূরে রাখার চেষ্টা করতেন। মুক্ত থাকা যার নিয়তি তাঁকে আর সংসারের মায়ায় আবদ্ধ করা যায় না। তাঁর জন্মই যে মানবমুক্তির পথ অন্বেষণ করা। পরিণত বয়সে তিনি যশোধরা সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হোন। একদিন নগর পরিভ্রমণে গিয়ে চারটি দৃশ্য দেখতে পান। বৌদ্ধদর্শনে যেটি চারি নিমিত্ত দর্শন হিসেবে পরিচিত। চারি নিমিত্তগুলো হলো : একজন জরাজীর্ণ ব্যক্তি, একজন ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তি, একটি মৃতদেহ এবং একজন সন্ন্যাসী। এই নিমিত্তগুলো তাঁর মনে সংসারের অনিত্যতা সম্পর্কে গভীর প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে। সেই মুহূর্তেই তিনি বুঝতে পারেন সমস্ত ঐশ্বর্য, সুখ, ধনসম্পত্তি সবই ক্ষণস্থায়ী এবং মানবজীবনের আসল সত্য হলো দুঃখের অবসান। পরক্ষণে তিনি রাজকীয় জীবনের ভোগবিলাস ত্যাগ করে সত্যের সন্ধানে ব্রতী হোন।

একদিন নগর পরিভ্রমণে গিয়ে রাজদূতের মাধ্যমে পুত্র রাহুলের জন্মের খবর পান। তখন তিনি উপলব্ধি করলেন রাহু আসছে বন্ধন বাড়ছে। এমতাবস্থায় এক রাতে পিতা রাজা শুদ্ধোদন, বিমাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমী, আত্মীয়-স্বজন-পরিজন, প্রিয় স্ত্রী যশোধরা ও পুত্র রাহুলকে নিদ্রায় রেখে, সিদ্ধার্থ সারথী ছন্দক ও কন্থক অশ্বকে নিয়ে রাজ-প্রাসাদ ত্যাগ করেন। তিনি ছয় বছর কঠোর তপস্যা করেন। অবশেষে ভারতের বিহার রাজ্যের বোধগয়ার বোধিবৃক্ষের নিচে ধ্যানস্থ হয়ে ৩৫ বছর বয়সে বুদ্ধত্ব লাভ করে সম্যকসম্বুদ্ধ হোন। পরবর্তী সময়ে সকলের সুখ-কল্যাণ ও দুঃখ থেকে মুক্তির জন্য প্রচার করলেন জ্ঞানলব্ধ অমৃতবাণী।

বুদ্ধ জন্মসূত্রে ছিলেন একজন রাজপুত্র আর কর্মসূত্রে হয়েছিলেন একজন আত্মত্যাগী, নির্লোভ, সত্যসন্ধানী, মানব মুক্তির আলোকতর্তিকা, মানবতার আধ্যাত্মিক ও মানব দুঃখমুক্তির পথপ্রদর্শক। তাঁর জীবনদর্শন শান্তি, সমতা,

Dhaka University Institutional Repository

মানবিকতা, মনুষ্যত্ববোধ, নিয়ম, নীতি, শৃঙ্খলা ও প্রজ্ঞার এক মহাকাব্য। মহামতি বুদ্ধের জীবনকাহিনি কেবল ধর্মীয় ইতিহাস নয়, বরং একটি চিরন্তন মানবিক সংগ্রামের প্রতীক যা মানবমুক্তির এক অনন্য সাধারণ উদাহরণ। আর এভাবেই একজন মহামানব রাজপুত্র থেকে মানবতার মুক্তিদাতা হয়ে উঠলেন।

মানবজীবনে বহুবিধ দুঃখ, দুর্দশা ও সমস্যা রয়েছে । সমাজের প্রতিটি মানুষকে জগতসৃষ্ট সমস্যাবলীর সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই-সংগ্রাম করে বাঁচতে হচ্ছে। আধুনিক সমাজব্যবস্থায় যে সমস্ত সমস্যা সম্মুখীন হচ্ছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো হত্যা বা মৃত্যুদণ্ড, ব্যাভিচার, দুঃখ, গর্ভপাত, আত্মহত্যা, দুর্নীতি, নৈতিক অবক্ষয়, জলবায়ু পরিবর্তন, মাদকাসক্ত ইত্যাদি। এই সমস্যাসমূহ যা সমাধানের জন্য বৈজ্ঞানিক উপায় ছাড়াও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা প্রয়োজন হয়। মানবজীবনের এই সব সমস্যা ও সংকট থেকে উত্তরণের উপায় সম্বন্ধে বুদ্ধের মতবাদগুলো খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বুদ্ধ প্রদর্শিত নীতিকথা তথা বাণীর আলোকে সকল প্রকার সংকীর্ণতা, হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-দ্বেষ-মোহ ত্যাগ করে অহিংসা, নৈতিকজীবনবোধ, আত্মসংযম, স্থিতিশীলতা এবং মানবমর্যাদার মাধ্যমে সমাজগঠন করতে পারলে আদর্শসমাজ কিংবা রাষ্ট্রগঠন করা সম্ভব হবে। বুদ্ধের শিক্ষা-দর্শনের আলোকে বর্ণিত যাপিতজীবনের সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা ও সংকট থেকে উত্তরণের স্বরূপ অন্বেষণ করা এবং সমাজ বাস্তবতায় তার প্রায়োগিক দিক উপস্থাপন করাই হলো আমার গবেষণার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

'সুশৃঙ্খল সমাজ বিনির্মাণে ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্মের ভূমিকা' শিরোনামীয় গবেষণাকর্ম সম্পাদন করতে এখানে ত্রিপিটকের অন্তর্গত (Canonical Text) এবং বহির্ভূত (Non-Canonical Text) গ্রন্থ, দেশি-বিদেশি বিভিন্ন গবেষণাধর্মী জার্নাল ও সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে। যেহেতু গবেষণাকর্মটি সাহিত্য নির্ভর সেহেতু Content Analysis পদ্ধতিতে গবেষণাকর্মটি রচনা করার চেষ্টা করেছি।

এই গবেষণাকর্মে **'সুশৃঙ্খল সমাজ বিনির্মাণে ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্মের ভূমিকা'** বুদ্ধের শিক্ষা-দর্শনের প্রায়োগিক দিকসমূহকে ভূমিকা, চারটি অধ্যায়, অধ্যায়ের অন্তর্ভূক্ত পরিচ্ছেদ রয়েছে। সবশেষে রয়েছে উপসংহার। নিম্নে অভিসন্দর্ভের অধ্যায় ভিত্তিক সারাংশ উপস্থাপন করা হলো।

ভূমিকা

এখানে গবেষণা কর্মের অধ্যায়ভিত্তিক বিষয়বস্তুগুলো সম্পর্কে একটি ধারণা উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় : ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্মের উৎস বিচার প্রসঙ্গ

এই অধ্যায়ে ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্ম বলতে কী বোঝায়, ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্মের স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্মের প্রায়োগিক বিষয়সমূহ চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : সমাজ বিনির্মাণে বুদ্ধের শিক্ষা-দর্শন: প্রায়োগিক ব্যবহারের স্বরূপ অন্বেষণ

অধ্যায়টিকে সমাজ বাস্তবতার আলোকে চারটি পরিচ্ছেদে বিভাজিত করে বুদ্ধের শিক্ষা-দর্শনের প্রায়োগিক বিষয়বস্তুর নির্দেশনা উপস্থাপন করা হয়েছে। সেগুলো হলো :

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ : দুর্নীতি, মাদকাসক্ত, নৈতিক অবক্ষয় এবং নিরসন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সমতা নিশ্চিতকরণ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : মৃত্যুদণ্ড, গর্ভপাত, আত্মহত্যা, মানসিক হত্যা এবং প্রতিকার

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : বুদ্ধের প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতির প্রয়োগ

উপরি-উক্ত প্রতিটি পরিচ্ছেদে মানবজীবনের বিভিন্ন সমস্যা বা সংকট চিহ্নিত করে কীভাবে এই সমস্যা থেকে উত্তরিত হয়ে সততার সাথে জীবযাপন করা যায় তা বুদ্ধের শিক্ষা-দর্শনের আলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে। একই সাথে মানবমুক্তির জন্য বুদ্ধনীতি শিক্ষার অবলম্বনে কিছু সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে যা সমাজ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশাবাদ প্রকাশ করছি।

তৃতীয় অধ্যায় : টেকসই পরিবেশ সংরক্ষণে বুদ্ধের শিক্ষা

এ অধ্যায়ে মানবজীবনের বেড়ে ওঠার অবিচ্ছেদ্য অংশ পরিবেশ-এর অবদান, পরিবেশ দূষণ, প্রতিরোধ, প্রতিকার ও কিছু সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এই অধ্যায়ে বুদ্ধ জীবনের সাথে পরিবেশের যে গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে সেই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : বুদ্ধের শিক্ষা-দর্শন ও সুশাসন : প্রায়োগিক বিশ্লেষণের রূপ-রূপান্তর

এ সমাজ যাদের (শাসক/রাজা) দ্বারা পরিচালিত হয়। যাদের (রাজা/শাসক) উপর সমাজ পরিচালনার গুরু দায়িত্ব রয়েছে তাদের দায়িত্ব, কর্তব্য, বৈশিষ্ট্য, আচার-আচরণ সর্বোপরি তাদের নৈতিক, আদর্শ, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার বিষয়ে এতে বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে।

উপসংহার : উপসংহারে সার্বিক গবেষণার প্রাপ্তি ও ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্ম অনুশীলনে প্রায়োগিক ধারণা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাছাড়া বর্তমান অভিসন্দর্ভ রচনায় যে সব গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে 'গ্রন্থপঞ্জি' অংশে তা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায় যুক্তিনির্ভর তথ্য এবং তত্ত্বে প্রাসঙ্গিক বিষয় অত্যন্ত সহজ, সরল ও সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্মের উৎস বিচার প্রসঙ্গ

১. প্রাক্‌কথন

বুদ্ধ বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক। তাঁর উপদেশ ও বাণী ত্রিপিটকে সংরক্ষিত রয়েছে। বৌদ্ধ প্রধান দেশগুলো বিশেষ করে জাপান, চীন, মায়ানমার, কোরিয়া, লাওস, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, হংকং, ভূটান, থাইল্যান্ড এবং মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশে বুদ্ধ বাণীর আচরণের চেয়ে ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক দিকটাই সবেচেয়ে লক্ষণীয়। বর্তমান Sustainable Development Goals-এর মাধ্যমে মানুষের জীবনমানে ব্যাপক পরিবর্তন আসছে। জীবনমানকে উন্নতকরণের জন্য বর্তমান টেকসই উন্নয়নের যে সমস্ত সূচক ব্যবহার করা হয় তাতে বৌদ্ধধর্মের দিক নির্দেশনাও লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের যাপিতজীবনের প্রয়োজনে বৌদ্ধধর্মের ব্যবহারিক দিকের ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান বিশ্ব বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তিময়। এখানে মানুষ প্রতিনিয়ত নানারকম সমাস্যার[১] সন্মুখীন হচ্ছে। বৌদ্ধধর্ম মানুষের আত্মিক উন্নয়ন ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পাশাপাশি ব্যবহারিক জীবনে বিভিন্ন রকম সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ প্রদর্শন করে। মানবজীবনকে মহান করে তোলার জন্য বুদ্ধ শীল (Morality), সমাধি (Concentration of Mind) এবং প্রজ্ঞার (Wisdom) কথা বলেন। এগুলো চর্চার ফলে জীবন সুন্দর থেকে সুন্দরতর ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করা যায়।

২. ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্ম-এর ধারণা

'ফলিত' শব্দের সমার্থক শব্দ হিসেবে আমি এখানে 'ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্ম' প্রয়োগ করছি। আমার পিএইচ.ডি. গবেষণাকর্মের অভিসন্দর্ভের ইংরেজি শিরোনাম '*Role of Applied Buddhism in Making Well- Disciplined Society'* 'ফলিত বৌদ্ধধর্ম' শব্দটা একবারে নতুন মনে হলেও ফলিত গণিত, ফলিত জীববিজ্ঞান, ফলিত নৃবিজ্ঞান, ফলিত রসায়ন বিষয়গুলোর সাথে আমরা কম-বেশী সবাই পরিচিত।

জীববিজ্ঞানের যে শাখায় তত্ত্বীয় বিষয় আলোচনা করা হয় তাকে 'ভৌত জীববিজ্ঞান' বলে। যেমন শরীরবিদ্যা, ভ্রুণবিদ্যা, কোষবিদ্যা ইত্যাদি। অন্য দিকে জীববিজ্ঞানের যে শাখায় জীবসংশ্লিষ্ট প্রায়োগিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়-সেই শাখাটি 'ফলিত জীববিজ্ঞান'। ফলিতগণিত হলো পদার্থবিজ্ঞান, প্রকৌশল, চিকিৎসা, জীববিজ্ঞান, ব্যবসা, কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং শিল্প-কারখানায় গাণিতিক পদ্ধতির প্রয়োগ। ফলিত নৃবিজ্ঞান-এর কাজ কোনো তাত্ত্বিক বিষয়বস্তুর ব্যবহারিক প্রয়োগ। মানবসমাজ সম্পর্কে কোনো বিষয়বস্তুর পেশাদার বা ব্যবহারিক প্রয়োগ হলো ফলিত নৃবিজ্ঞান। ফলিত রসায়ন শাস্ত্রে কেমিক্যাল ও ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে রসায়নের প্রয়োগ সংক্রান্ত সম্যক জ্ঞান প্রদান করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

আমরা কম-বেশি সকলেই উপরি-উক্ত বিষয় সম্পর্কে অবগত। এখানে উপরি-উক্ত বিষয়গুলো উল্লেখ করার মূল উদ্দেশ হলো বৌদ্ধধর্মের সাথে 'ব্যবহারিক বা ফলিত' শব্দের ব্যবহার করার যৌক্তিকতা উপস্থাপন করা। এখানে ব্যবহারিক বলতে কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার পাশাপাশি সেই জ্ঞান প্রয়োগ করার দক্ষতা অর্জন করাকে বোঝায়।

'বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান' অনুসারে 'ফলিত' শব্দের অর্থ 'ফলবিশিষ্ট', 'সফল', 'পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধ', 'সত্যরূপে প্রমাণিত' এবং 'প্রায়োগিক'।[২] 'ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্ম' বা 'ফলিত বৌদ্ধধর্ম' হলো বুদ্ধ প্রচারিত ধর্মবাণী ও দর্শনের সর্বজনীনভাবে বিচার-বিশ্লেষণ। অন্যভাবে বলা যায়, 'ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্ম' বা 'ফলিত বৌদ্ধধর্ম' বলতে বোঝায় বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে বুদ্ধের শিক্ষা ও দর্শনের প্রয়োগ করা। বর্তমান সমাজব্যবস্থাপনায়ও বুদ্ধের এই ব্যবহারিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত বৌদ্ধতত্ত্ববিদ দীপক কুমার বড়ুয়া বলেন :

> 'These new interpretations of as well as search in Buddhas Gospel may simple be termed as Applied Buddhism. The applications of Buddhism in the modern way of life or the practical aspects of Buddhism'.[৩]

তাছাড়া এ বিষয়ে নিচের উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :

> 'It is done deliberately to make the Buddhist concepts seem more appealing to the representatives of other religious spheres and cultures. The concept of this is to allow people to practice Buddhism but not get converted into becoming a Buddhist. It is expected to know that Buddhism is no more a religion but a living style'.[৪]

৩. ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্মের বিষয় স্বরূপ

যাপিতজীবনে বুদ্ধের শিক্ষার ব্যবহারিক দিকটাকেই ব্যবহারিক বা ফলিত বৌদ্ধধর্ম বলা হয়। জীবনধারার মান পরিবর্তনে বুদ্ধের শিক্ষার কল্যাণকর, নৈতিক, শৃঙ্খলিত সর্বজনীন দিকগুলো ব্যবহার করা যায়। ফলিত বা ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্ম নীতি-নৈতিকতা, সমতা, সহিষ্ণুতা, মানবতাসহ আধুনিক বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেহেতু ব্যক্তির সুস্থতার ধারণাটি ব্যক্তির মানসিক এবং আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত, তাই মানসিক রোগ প্রতিরোধের জন্য বৌদ্ধধর্মে ধ্যানের অনুশীলনকে প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হয়। বৌদ্ধধর্ম কেবল একটি ধর্ম নয়, এটি একটি জীবনধারা। বৌদ্ধ না হয়েও সততার সাথে জীবনযাপনে বুদ্ধের শিক্ষা অনুশীলন করতে কোনো বাধা নেই। বুদ্ধের শিক্ষা সুন্দর জীবন গঠনের পাশাপাশি জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং সমাজের সংস্কৃতি সমৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এই বিষয়ে নিম্নের বাক্যটি স্মরণযোগ্য :

Dhaka University Institutional Repository

> 'Just like in continuation of that historical process of adaptation in cultures of Asia, Buddhist resources to also adaptively serve new purposes towards attempting to meet perceived needs and problems of modern cultures and societies are now in use in various ways as well'.[৫]

ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্মের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বুদ্ধের শিক্ষা ও দর্শনকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়া। এটির মাধ্যমে ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকলের কল্যাণ হয়। সাম্প্রতিক সময়ে বৌদ্ধধর্মের সাথে সম্পৃক্ত সামাজিক বৌদ্ধধর্ম, সামাজিকভাবে জড়িত বৌদ্ধধর্ম এবং সবুজ বৌদ্ধধর্মের নতুন নতুন ধারণা ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্মকে আকর্ষণীয় করে তোলে। ব্যবহারিক তথা ফলিত বৌদ্ধধর্ম হলো বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন প্রায়োগিক দিকগুলোর একটি একক এবং ঐক্যবদ্ধ ধারণার অধীনে একীভূত করার প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে বৌদ্ধধর্মের ব্যবহারিক দিকটা আরো আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। বুদ্ধের সময়কালে জাতি-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ বুদ্ধের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেকে বিকশিত করেছিলেন। বৌদ্ধধর্মের প্রায়োগিক দিকটির নতুন ধারণা বর্তমান সমাজব্যবস্থাপনায় খুবই আবশ্যকীয় বলে মনে করা হয়। বুদ্ধ প্রদর্শিত নীতিগুলো পরিবার, সমাজে, রাষ্ট্র সর্বোপরি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে শান্তি, সম্প্রীতি, সদ্ভাব-সৌহার্দবোধ বৃদ্ধিতে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্ম হলো বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনকে আধুনিক বিশ্বায়নের উন্নয়নের ধারায় সবাইকে সম্পৃক্ত করার এক মহান প্রয়াস।

বৌদ্ধধর্মের ব্যবহারিক দিকগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে বিবেচিত। ব্যক্তি মাত্রই সুন্দর জীবনযাপনে বুদ্ধের নীতি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। চিত্ত বা মনের প্রশান্তির জন্য ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্মের গুরুত্ব রয়েছে। কেননা, এটি অনুশীলন করার মাধ্যমে অস্থিরতা, চঞ্চলতা, অসুখ-বিসুখ নিয়ন্ত্রণে আসে। শরীর সুস্থ এবং আপনকর্মে মনোযোগী হওয়ার জন্য বুদ্ধ প্রদর্শিত ধ্যানানুশীল মহৌষধ হিসেবে কাজ করে। আদর্শ জীবনগঠনে বুদ্ধের শিক্ষা ও বাণীর আদর্শ, নৈতিক ও শৃঙ্খলিত উপায় খুঁজে পেতে এবং তৈরি করতে সাহায্য করতে পারে। সকল প্রকার দ্বন্ধ-সংঘাত, সংঘর্ষ, নিরসনে এবং মানবিক সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনে বৌদ্ধধর্ম সতত সুন্দর দিক নির্দেশনা দেয়। বুদ্ধ নির্দেশিত পথ অনুসরণ করলে টেকসই সমাজ বিনির্মাণ করাও সম্ভব। ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্মকে নানাভাবে ব্যবহার করা যায়। এ বিষয়ে উক্ত রয়েছে :

> 'It is the case today that Buddhist thinking is used to guide modern issues of economic and social and gender inequality, ecology, education, criminal justice, war and peace, and inter-religious dialogue'.[৬]

পৃথিবীব্যাপী বৌদ্ধধর্মের থেরবাদ এবং মহাযান শাখার মাধ্যমে ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্মের বহুল চর্চা হচ্ছে। স্বাস্থ্য এবং সুখ, মঙ্গল এবং কল্যাণ কামনা এবং মানবিক সমাজ ও শান্তি প্রতিষ্ঠাকরণে ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্ম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্মের স্বরূপ প্রসঙ্গে নিচের মন্তব্যটি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য :

Dhaka University Institutional Repository

> ‘ Applied Buddhism means that Buddhism can be applied in every circumstance in order to bring understanding and solutions to problems in our world. Applied Buddhism offers concreate ways to relive suffering and bring peace and happiness in every situation’[৭]

ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্মের প্রায়োগিক দিকের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করা হয় এভাবে :

> ‘*Applied* Buddhism also shares valuable information on Buddhist contributions to modern science, health and well-being. As our concept of well-being is directly related to our mental and spiritual health, Buddhist Meditational practices are given the price importance for prevention of mental illnesses and recommended for incorporation in the regimen of regular psychotherapy and in primary and secondary school curriculum as a part of primordial prevention’.[৮]

৪. ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্মের পরিধি

প্রতিনিয়ত আমরা জীবনে নানারকম কর্ম সম্পাদন করে চলছি। কোনোটা কুশল অর্থাৎ, ভালো কাজ আবার কোনোটা অকুশল অর্থাৎ, খারাপ কাজ। দৈনন্দিন জীবনযাপনে অকল্যাণকর আচরণ বা অশোভনীয় আচরণ, অশুভ চিন্তা-চেতনা, অপরের ক্ষতি করার চিন্তা এরূপ ধ্বংসাত্মক এবং অমানবিক কর্মগুলো ত্যাগ করা উচিত। পাশাপাশি দরকার গঠণমূলক এবং ইতিবাচক কর্ম সম্পাদন করা। বুদ্ধ ইতিবাচক কর্ম সম্পাদনের পথ প্রদর্শন করেন। তিনি সাধনালব্ধ জ্ঞানের আলোকে মানুষের সুখ, শান্তি ও কল্যাণের জন্য দেশনা করে গেছেন যা চিরন্তন ও সর্বজনীন। বুদ্ধ তাঁর পঞ্চবর্গীয় শিষ্যকে প্রথম ধর্ম দেশনা করেন। এটি প্রথম ‘ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র’ নামে পরিচিত। এখানে তিনি দিকে দিকে বিচরণ করে বহুজনের সুখ ও কল্যাণের জন্য তাঁর ধর্ম প্রচারের কথা বলেন।[৯] এতে বৌদ্ধধর্মের ব্যবহারিক দিকটির পরিধির ব্যাপকতা প্রকাশ পায়। ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্মের পরিধি বা সীমা অবারিত। ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্ম বলতে সেই বুদ্ধবাণীকে বোঝায় যা যাপিত জীবনে দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড, পরিবার, সমাজ এবং পরিবেশের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক মুক্তি নয় বরঞ্চ পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র/রাজ্য, শান্তি, সম্প্রীতি, সদ্ভাব, স্থিতিশীলতা, সমৃদ্ধি, সহমর্মিতা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অনুসৃত হয় ।

৪.১. দৈনন্দিন জীবনযাপনে বুদ্ধের শিক্ষার গুরুত্ব

সততার সাথে জীবনযাপনে বুদ্ধ প্রদর্শিত গৃহীবিনয় কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্যে বুদ্ধ গৃহীদেরকে চারটি[১০] বিষয় মেনে চলার উপদেশ প্রদান করেন। এগুলো হলো : ক. উত্থান সম্পদ, খ. সংরক্ষণ সম্পদ, গ. কল্যাণমিত্রতা এবং ঘ. সমজীবিকা সম্পদ বা শৃঙ্খলাবদ্ধ সম্পদ।

Dhaka University Institutional Repository

উত্থান সম্পদ
উত্থান হলো ধন-সম্পদ আহরণের জন্য যে যে কর্ম সম্পাদন করবে তা উৎসাহের সাথে সম্পাদন করাকে বলা হয় উত্থান সম্পদ।
সংরক্ষণ সম্পদ
বহু কষ্ট ও পরিশ্রম দ্বারা সততার সাথে অর্জিত ধন-সম্পদকে সচেতনার সাথে রক্ষা করাই হলো সংরক্ষণ।
কল্যাণমিত্রতা
প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ করাকে কল্যাণমিত্রতা বলা হয়।
সমজীবিকা সম্পদ
আয় বুঝে ব্যয় অর্থ্যৎ, মিতব্যয়ী হওয়াকে সমজীবিকা সম্পদ বলা হয়

সারণি : ১

উত্থানে সম্পদ আমাদেরকে সৎ ও পরিশ্রমী হবার শিক্ষা দেয়। সংরক্ষণ সম্পদ ধন-সম্পদ সংরক্ষণের কথা জানা যায়। কল্যাণমিত্রতার মাধ্যমে সৎব্যক্তির সান্নিধ্যে যে মহাকুশল লাভ হয় তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সমজীবিকা নিজের আয়-ব্যয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা কথা বলেন।

মানুষ সামাজিক জীব। সুন্দর জীবন গঠনে সতত নিয়ম-কানুন মেনে জীবনযাপন করার অত্যাবশ্যক। চারিত্রিক বিশুদ্ধিতায় মানুষের জীবন পুত-পবিত্রতার পাশাপাশি পরিপূর্ণ হয়। তবে বলে রাখা দরকার যে, সততা, নৈতিকতা, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, ব্যতীত একজন মানুষ কখনো পরিপূর্ণ হয় না। বুদ্ধ মানুষের সুখ, শান্তি, কল্যাণ, সংহতি ও সমৃদ্ধির জন্য উপদেশ প্রদান করেন যা বুদ্ধের দেশনায় দেখা যায়। গৃহীবিনয় পরিবারের প্রধান স্তম্ভ। গৃহী বিনয়ের প্রধান স্তর চারটি।[১১] এগুলো হলো :

চিত্র ১ : গৃহী বিনয়

Dhaka University Institutional Repository

স্পন্দন থাকলে আমরা বেঁচে আছি বলে মনে হয়। অনুরূপভাবে উপরি-উক্ত গৃহীবিনয় পালন করলে বা মেনে চললে বুঝতে পারা যায় একটি পরিবারের স্পন্দন রয়েছে। এগুলো মেনে চললেই বিভিন্ন রকম সমস্যা থেকে উত্তরণ সম্ভব। সর্বত্রে প্রেম-প্রীতি ভালোবাসায় এক মেলবন্ধন বিরাজ করবে। ন্যায়পরায়ণতা, আত্মসংযম, সহনশীলতা এবং ত্যাগ স্বীকার টেকসই সমাজ বিনির্মাণেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৪.২. ন্যায়পরায়ণতা

'ন্যায়পরায়ণতা' বলতে 'সত্যানুরাগী' 'হৃদ্যতা' এবং 'পরস্পর-পরস্পরের প্রতি অবিচল আস্থা'কে বোঝায়। ন্যায়পরায়ণতা হলো সত্যের অপর নাম। জ্ঞানী মাত্রই সত্যে প্রতিষ্ঠিত। ন্যায়পরায়ণতায় নিজের কৃতকর্মকে সম্যক দৃষ্টিতে দেখার কথা বলা হয়েছে। বুদ্ধ অপরের দোষ অন্বেষণ না করে নিজের কৃতকর্মের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ দেওয়ার কথা বলেন।[১২] ন্যায়পরায়ণতা তাৎপর্য হচ্ছে দায়বদ্ধতা বা কর্তব্য পরায়ণ হবার প্রচেষ্টা। ন্যায়পরায়ণতা থেকে বিচ্যুত হলে মানুষের নৈতিক অবক্ষয় ঘটে। মানুষ অন্যায় অবিচারের সাথে জড়িয়ে পড়ে। সমাজে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা, একই সাথে সমাজ হয়ে পড়ে অস্থিতিশীল। সমাজের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে সত্যকে ধারণ করার মধ্যে এই হৃদ্যতার প্রকাশ। ব্যক্তি ও সমাজজীবনে এটির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কেননা, কর্মজীবনে সত্যনিষ্ঠ না হলে শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা লাভ করা যায় না। স্ব-স্ব ক্ষেত্রে আমাদের সকলের ন্যায়পরায়ণতা অনুশীলন করা আবশ্যক। ন্যায়পরায়ণতা মানবজীবনকে মহিমান্বিত করে তোলে। এটি বুদ্ধের শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ন্যায়পরায়ণতা সমাজজীবন পরিচালিত হলে সকলে সুখী ও শান্তি লাভ করতে পারে। 'রথলট্ঠি জাতক' পাঠে ন্যায় বিচারের ধারণা পাওয়া যায়। উক্ত জাতকে রাজাকে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে দেখা যায়। এখানে উক্ত হয়েছে :

> আঘাত করিয়া বলে হয়েছি আহত, জয়ী বলে হয়েছি পরাজিত।
> হেন মিথ্যা অভিযোগ শুনি কত শত, সর্বদা রাজার দ্বারে হয় উপস্থিত।
> ধর্ম অবতাররূপ কিন্তু রাজা যিনি, বিচার কি করিবেন একপক্ষে শুনি।[১৩]

এখানে বোধিসত্ত্বের কথা শ্রবণ করে রাজা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করে। এরূপ ন্যায় পরায়ণতা সমাজ তথা রাষ্ট্রের সর্বত্রে প্রয়োগ হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা হবে।

তাছাড়া, 'মহাসুতসোম জাতকে' দেখা য়ায়, রাজা সুতসোম অসাধারণ সত্য পরায়ণতায় মানুষরূপী খাদক রাজাকে রাক্ষসবৃত্তি পরিহার করতে সহায়তা করে।[১৪]

৪.৩. আত্মসংযম

'আত্ম সংযম' জয় হলো নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ। 'আত্ম সংযম' প্রচলিত কথায় বলা হয় 'স্বশিক্ষণপ্রীতি'। আত্মনিয়ন্ত্রণে কোনো প্রকার শৈথিল্য না দেখিয়ে জ্ঞানবুদ্ধি, দক্ষতা এবং সদ্গুণাবলী অর্জনের প্রচেষ্টাই হলো আত্মসংযম। তাছাড়া নিজেকে সবধরনের লোভ-লালসার উর্ধ্বে রেখে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করাকেও আত্মসংযম বলা হয়। অর্থাৎ, সমাজের বৃহৎ স্বার্থে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করার নাম আত্মসংযম। আত্মসংযমী ব্যক্তি

Dhaka University Institutional Repository

যাবতীয় অনাচার, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্বের উর্ধ্বে অবস্থান করে। এখানে আত্মসংযমের প্রধান লক্ষ্য হলো সর্ববিধ রাগ-দ্বেষ-মোহ থেকে বিরত থেকে পক্ষপাত মুক্ত থাকা। এখানে বুদ্ধ 'সুখ বর্গে' বলেন :

নত্থি রাগ সমো অগ্গি নত্থি দোসসমো কলি

নত্থি খন্ধসমা দুক্খা নত্থি সন্তিপরং সুখং॥[১৫]

অর্থাৎ, আসক্তির ন্যায় অগ্নি নেই, বিদ্বেষের ন্যায় পাপ নেই, পঞ্চ স্কন্ধের ন্যায় দুঃখ নেই, শান্তি অপেক্ষা ন্যায় উত্তম সুখ নেই।

আত্মসংযমকারী নিজের মধ্যে থাকা লোভ-দ্বেষ এবং মোহকে সংযম করতে পেরেছেন তাই তারা সর্বত্রে পূজিত এবং সর্বজন নন্দিত। লোভ-দ্বেষ এবং মোহ প্রতিনিয়ত চিত্তকে বিক্ষিপ্ত এবং অস্থির করে তোলে। তাই দরকার আত্মসংযম। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধ লোভ, দ্বেষ, মোহ, ক্রোধ, তৃষ্ণাহীন ব্যক্তির প্রশংসা করেন বলে ব্রাহ্মণ বর্গের মাধ্যমে জানা যায়।[১৬]

বুদ্ধ চিত্তকে সংযম করে সতত সুন্দর জীবনযাপনে সংযমী হবার কথা বলেন। মানুষ যদি সংযমী হতে শেখে তবে সে নানাভাবে সুখী হবে এটি স্বাভাবিক। এ প্রসঙ্গে 'চিত্ত বর্গে' উল্লেখ রয়েছে এভাবে:

ন তং মাতা পিতা কযিরা অঞ্ঞেঞ বাপি চ ঞাতকা

সম্মাপণিহিতং চিত্তং সেয্যসো নং ততো করে।[১৭]

অর্থাৎ, সঠিক পথে পরিচালিত হলে চিত্ত মানুষের যে পরিমাণ উপকার সাধন করতে পারে, পিতা-মাতা বা জ্ঞাতিরা তা করতে পারে না।

তাছাড়াও বুদ্ধ তিন ভাবে[১৮] আত্মসংযমী হওয়ার কথা বলেন।

চিত্র ২ : আত্মসংযম

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩.১. কায়

মানুষ মাত্রই প্রতিনিয়ত কায় দ্বারা বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করে। এমতাবস্থায় বুদ্ধ কায়কে সংযত হবার কথা বলেন। তিনি 'ক্রোধ বর্গে' বলেন :

কাযপ্পকোপং রক্খেয্য কাযেন সংবুতো সিযা
কাযদুচ্চরিতং হিত্বা কাযেন সুচরিতং চরে।[১৯]

অর্থাৎ, কায়িক আচার-আচরণ থেকে নিবৃত্ত থেকে সংযতকায় হবে এবং কায়িক দুশ্চরিত্রতা ত্যাগ করে সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হবে।

৪.৩.২. বাক্য

প্রতিনিয়ত আমরা বাক্য দ্বারা একে-অপরে সাথে ভাব-বিনিময় করি। বাক্য দ্বারা মানুষ মানুষের প্রিয় হয়। বাক্য দ্বারা আবার অপ্রিয়ও হয়। কাউকে কিছু বলার পূর্বে স্থান কাল পাত্র বিবেচনা করে বাক্য বিনিময় করা উচিত। কেননা অনেক সময় বাক্য সংযমের অভাবে পরিবেশ অশান্ত তথা বিশৃঙ্খলা তৈরী হয়। এমনকি বিবাদ-কলহের সৃষ্টি হয়। সুতরাং, সুভাষিত ও মধুর বাক্য ভাষণ করা কর্তব্য বুদ্ধ 'ক্রোধ বর্গে' বলেছেন:

বচীপকোপং রক্খেয্য বাচায সংবুতো সিযা
বচীদুচ্চরিত হিত্বা বাচায সুচরিতং চরে।[২০]

অর্থাৎ, অপরের সাথে বাচনিক আচার-আচরণ থেকে নিবৃত্ত থেকে বাক্যে সংযত হবে এবং বাচনিক দুরাচার ত্যাগ করে বাক্যের মাধ্যমে সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হবে।

'অঙ্গুত্তর নিকায়' গ্রন্থের 'সুচরিত সূত্রে'[২১] এবং *'সুত্ত নিপাত'* গ্রন্থের 'সুভাষিত সূত্রে'[২২] চার প্রকার বাক্যের কথা উল্লেখ রয়েছে। এই চার প্রকার বাক্য পারস্পরিক শান্তি সম্প্রীতি সদ্ভাব বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এগুলো হলো : সত্য বাক্য, মধুর বাক্য, নম্র বাক্য এবং অর্থপূর্ণ বাক্য।

৪.৩.৩. মন

যার মন, লোভ, দ্বেষ এবং মোহে পরিপূর্ণতায় ভরা তার কাছে সুখ শান্তি সুদূর পরাহত। মন সর্বত্র অগ্রগামী। সবার আগে চলে যায় মন। ভালো কাজে ভালো ফল এবং মন্দকাজে মন্দ ফল অব্যশম্ভাবী। এটা সর্বজন সত্য যে, মনকে সংযত করলে মনোনিবেশ থাকে এবং মানসিক প্রশান্তি লাভ হয়। মনকে সংযত করতে পারলে অনৈতিক কোনো চিন্তা বা কাজ করার কথা আসে না কখনো। বুদ্ধ 'ক্রোধ বর্গে' বলেছেন :

মনোপকোপং রক্খেয্য মনসা বাচায সংবুতো সিযা
মনোদুচ্চরিত হিত্বা মনসা সুচরিতং চরে।[২৩]

অর্থাৎ, মানসিক উত্তেজনা থেকে নিবৃত্ত থেকে সংযত মনের অধিকারী হবে এবং মানসিক দুষ্কর্ম পরিত্যাগ করে সৎ ও সুন্দর কর্মে উৎসাহী হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি এবং সর্বময় উন্নতির জন্য মনকে সংযত করা দরকার। তাই দরকার আত্মপ্রচেষ্টা। মানুষের চিত্ত বা মন সবসময় বিভিন্ন বিষয়ে বিচরণ করে। আত্ম সংযম মনের মধ্যে কোনো অশুভ চিন্তার উদ্রেক হতে দেয় না। বুদ্ধ মনকে সংযত করে চারভাবে কুশলকর্মে[২৪] আত্মনিয়োগ করার কথা বলেন। যথা : অনুৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্মগুলোর অনুৎপাদ না করার চেষ্টা; উৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্মসমূহ বিদূরিতকরণের চেষ্টা; অনুৎপন্ন কুশলধর্মসমূহ সম্পাদন করার চেষ্টা এবং উৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহ প্রবৃদ্ধি করা চেষ্টা।

৪.৪. সহনশীলতা

'সহনশীলতা' হলো পরস্পরের প্রতি ঘৃণা বা অবজ্ঞা প্রকাশ থেকে বিরত থাকা। কারো প্রতি কোনো রকম হিংসাত্মক মনোভাব প্রদর্শন না করে সহনশীল আচরণ উদ্বুদ্ধকরণে প্রচেষ্টা। এটি একটি মানবীয় গুণ। এই গুণ মানুষকে শীত-তাপ, রোগশোক, দুঃখ-দারিদ্র, প্ররোচনা, উস্কানি, বিরক্তি ইত্যাদি পরিস্থিতি সহনশীলতার সাথে সহ্য করতে শেখায়। ঐক্য, সদ্ভাব, সম্প্রীতি, সংহতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে সহনশীলতার প্রয়োজন রয়েছে। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র তথা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সহনশীল আচরণ আমাদের জীবনের এক মহৌষধ হিসেবেও কাজ করে। এটির অভাবে পারস্পরিক কলহ-বিরোধসহ সর্বত্রে অরাজকতার বৃদ্ধি পায়। সহনশীল আচরণ করার জন্য বুদ্ধ ইন্দ্রিয় সংযম করার কথা বলেন।[২৫] বর্তমান সময়ে সহনশীলতার বড়ই অভাব। এটি এমন একটি গুণ যা মানুষকে অর্জন করে নিতে হয়। গুণটি ব্যক্তি পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও খুব প্রয়োজন। সহনশীল পরিবেশ মানুষের কাজের স্পৃহা ও ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। সহনশীলতা শ্রদ্ধা, সম্মান, মর্যাদা প্রদান করতে শেখায়। '*সূত্র পিটক*' -এর অন্তর্গত '*ধর্মপদ*' গ্রন্থে অপ্রমাদ বর্গে দৃঢ়, ধৈর্যশীল, সহনশীল হওয়ার কথা বলা হয়েছে এভাবে :

"তে ঝাযিনো সাততিকা নিচ্চং দলহপরক্কমা,
ফুসন্তি ধীরা নিব্বানং যোগকখেমং অনুওরং॥"[২৬]

অর্থাৎ, যে সকল ধ্যানী, অধ্যবসায়ী উদ্যোগী ও নিয়ত দৃঢ় পরাক্রমশালী, তাঁরা ক্রমে নির্বাণ লাভ করবেন।

কেউ ধ্যানী, অধ্যবসায়ী হতে চাইলে অবশ্যই তাকে আগে সহনশীল হতে হবে। কোনো অবস্থাতেই বাঁধাকে বাঁধা মনে করা উচিত নয়। সব বাঁধাকে জয় করতে হবে। চিত্ত স্বভাবত চঞ্চল, অস্থির, বিক্ষিপ্ত। এ চঞ্চল চিত্তকে স্থির রাখাও এক প্রকার দৃঢ়তা। সংযত চিত্তের ক্ষেত্রে সহনশীলতার গুরুত্ব অপরিসীম। 'চিত্ত বর্গে' এ বিষয়ে বর্ণিত আছে:

"দুন্নিগ্গহস্স লহুনো যত্থকাম নিপাতিনো
চিত্তস্স দমতো সাধু, চিত্তং দন্তং সুখাবহং।"[২৭]

অর্থাৎ, দুর্দমনীয়, লঘু, যথেচ্ছ বিচরণশীল চঞ্চল চিত্তকে দমন করাই ভালো। সংযত চিত্তই সুখ প্রদান করে।

তাছাড়া 'ক্ষান্তিবাদী জাতকে' বোধিসত্ত্বের সহনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।[২৮]

Dhaka University Institutional Repository

শত্রুর সাথে সহনশীল থেকে শত্রুতা না করে মিত্রতার মাধ্যমে শত্রুকে জয় করা যায়। এটি সহনশীলতার অন্যতম একটি গুণ। এই সহনশীলতা আমাদের জীবনযাপনেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৪.৫. ত্যাগ স্বীকার

স্বার্থপরতা থেকে মুক্তির পথই হলো ত্যাগ। এখানে নেতিবাচক মনোভাব ত্যাগ করে দান চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার কথা ধ্বনিত হয়। ত্যাগেই শান্তি। দানের মনোভাব মানুষকে ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে। মহান করে তোলে। মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন : 'জীবে দয়া করে যেই জন সে জন সেবিছে ঈশ্বর'। আবার কবি কামিনী রায় বলেন : 'আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসিনি কেই অবনী পরে, সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'। এখানে বোঝানো হচ্ছে মানুষ মাত্রই মানুষের জন্যে। জীবন জীবনের জন্যে। অলোভ, অদ্বেষ এবং অমোহ পরায়ণ হলে মানুষ ত্যাগ স্বীকার করতে পারে। এখানে বুদ্ধ পরের কল্যাণ এবং সুখের কথা বলেন। তিনি 'ব্রাহ্মণবর্গে' বলেন : 'যার কোনোরকম কামনা-বাসনা নেই, কোনো প্রত্যাশা নেই তিনিই ত্যাগী ও প্রকৃত জ্ঞানী'।[২৯] দান দেওয়ার সময় চিত্তকে প্রসন্ন রাখতে হয়। কখনো অন্যের কথায় দান কাজ থেকে বিরত থাকা যাবে না। তাছাড়া ত্যাগের অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় 'করণীয় মৈত্রী সূত্রে'। এখানে বুদ্ধ বলেন : 'মা যেমন তাঁর একমাত্র পুত্রকে নিজের জীবনের বিনিময়ে সকল প্রকার আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা করেন অনুরূপভাবে সর্বজীবের প্রতি এরূপ মৈত্রীভাব পোষণ করবেন'।[৩০] বুদ্ধের এই শিক্ষা শান্তি ও সম্প্রীতি বৃদ্ধিতে বেশ জোড়ালো ভূমিকা পালন করতে পারে।

৫. বুদ্ধের কালোর্ত্তীণ শিক্ষা

বুদ্ধের উপদেশ বা বাণী কালোর্ত্তীণ। এখনো পর্যন্ত তাঁর বাণীগুলোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বুদ্ধের সময়ে রাজন্যবর্গ রাজ্য পরিচালনায় বৌদ্ধধর্মের নির্যাসকথা সমাজ জীবনে প্রয়োগ করেছিলেন তখন থেকেই ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্মের সূচনা মনে করা যায়। বর্তমানেও এটির প্রয়োজনীয়তা যেমন রয়েছে পাশাপাশি ভবিষ্যতে এটি সবাইকে সুন্দর ও আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে উদ্বুদ্ধ করবে। বুদ্ধ প্রদর্শিত উপদেশগুলোকে 'অকালিক' বলা হয়।[৩১] অর্থাৎ, বুদ্ধের উপদেশগুলো কোনো কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বুদ্ধ ৮০ বছর বয়সে বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশের কুশীনগরে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। এই মহাপরিনির্বাণ লাভের সময়কালে বুদ্ধ তাঁরই প্রিয় শিষ্য আনন্দকে আহ্বান করে বলেছিলেন : 'হে আনন্দ! তোমাদের এরূপ মনে হতে পারে যে, ধর্মোপদেশ দেয়ার জন্য আর তোমাদের কোনো শাস্তা নেই, আমাদের শাস্তার উপদেশ শেষ হলো। না, আনন্দ না, এরূপ চিন্তা করা উচিত নয়। যে ধর্মোপদেশ আমি তোমাদেরকে এতোদিন শিক্ষা দিয়েছি, আমার অবর্তমানে তাই তোমাদের শিক্ষাগুরু হবে'।[৩২] 'মহাপরিনির্বাণ সূত্রে' বুদ্ধ আনন্দকে আরো বললেন; 'হে আনন্দ! আমার অবর্তমানে সম্মিলিতভাবে ভিক্ষুসংঘ ইচ্ছা করলে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদসমূহ পরিবর্তন করতে পারবেন'।[৩৩] এখানে তিনি কাউকে কোনো গুরুর পদে আসীন কিংবা মনোনীত না

Dhaka University Institutional Repository

শিষ্যদেরকে যথাযথ স্থান-কাল বিবেচনা করার অধিকার প্রদান করে তিনি যে উদারতা ও বিচারবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করেন তা বর্ণনাতীত।

বুদ্ধ তাঁর উপদেশের মাধ্যমে জয় করে নিয়েছেন সবার মনকে। বলা চলে তাঁর উপদেশ কালোত্তীর্ণ বা চির শাশ্বত। তাই বুদ্ধের জীবন ও দর্শন আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিময় বিশ্বের এক বিশেষ স্থান অধিকার রয়েছে। বুদ্ধ প্রদর্শিত উপদেশগুলো অকালিক বা শাশ্বত মূল্যবোধ সম্পর্কিত হবার কারণে সুদীর্ঘকাল অতিক্রম করার পর আজও মানবজীবনে সমভাবে প্রযোজ্য।

যে সমস্ত বিষয়সমূহ বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শনকে **'অকালিক বা শাশ্বত'** করে রেখেছে তার একটি ধারণা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

চিত্র ৩ : অকালিক

৫.১. স্বাধীনতা

'স্বাধীনতা'-এর মাধ্যমে ব্যক্তি দায়িত্ববোধ, দায়বদ্ধতা, দায়িত্বশীল আচরণ করতে শিখে। দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার মনোভাব জাগ্রত হয়। সম্যক দৃষ্টির মাধ্যমে অলোভ, অদ্বেষ এবং অমোহ পরায়ণ হয়ে সর্বজনীন কল্যাণে এগিয়ে যাওয়া যায়। স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বুদ্ধ ছিলেন অদ্বিতীয়। তিনি কোনো

Dhaka University Institutional Repository

কিছুই জোড় করে কারো উপর চাপিয়ে দেননি। বুদ্ধ *'ধর্মপদ'* এর 'ভিক্ষু বর্গে' নিজেই নিজের ত্রাণকর্তা বলে বলেন।[৩৪] পাশাপাশি তিনি 'আত্ম বর্গে' আরো বলেন : নিজেই নিজের আশ্রয়। অন্য কেউ নয়।[৩৫] ব্যক্তি স্বাধীনতায় বুদ্ধ নিজেকে নিজের উৎসাহদাতা হিসেবে উপস্থাপন করতে বলেন। বুদ্ধ ভিক্ষুণী সংঘ প্রতিষ্ঠা করে নারীদের সংঘে প্রবেশের যে স্বাধীনতা প্রদান করেছেন তা আজ ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে।[৩৬] আত্মপ্রত্যয় এবং আত্মশক্তি বৃদ্ধিতে স্বাধীনতার শিক্ষা মানবিক সমাজগঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৫.২. বিচারবুদ্ধির সক্ষতা

বুদ্ধি মস্তিষ্কের সাথে সম্পর্কিত। পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে এই ক্রিয়াটি ভিন্ন ভিন্ন রূপগ্রহণ করে যেমন বলা যায় প্রতিভা, সূক্ষ্ম চিন্তা, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শেখার ক্ষমতা প্রভৃতি। আত্ম বিবেচনাপ্রসূত চিন্তাগ্রহণকে বুদ্ধ স্বাগত জানিয়েছে। তিনি *'অঙ্গুত্তর নিকায়'* গ্রন্থের 'কেশপুত্র সূত্রে' কালামদেরকে উপলক্ষ্য করে বলেন এভাবে : 'জনশ্রুতি, বংশ পরম্পরায়, অন্ধবিশ্বাস, শাস্ত্রোক্ত, তর্কবশত, অনুমানবশত, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাবশত কোনো কিছু বিশ্বাস না করে যে ধর্মগুলো কল্যাণকর, শুভকর, নির্দোষ, বিজ্ঞজন কতৃর্ক প্রশংসিত-অনুমিত যা অুনসরণ করলে সুখ-শান্তি উৎপন্ন হবে-তাই সম্পাদন করবে'।[৩৭] স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বুদ্ধ কোশলের কেশপুত্র কালামদেরকে যে উপদেশ প্রদান করেছেন তা ইতিহাসে বিরল। এখানে বুদ্ধ বোঝাতে চেয়েছেন আত্ম বিচারবুদ্ধি দ্বারা কার্য সম্পাদন করলে সর্বত্রে সুখ-শান্তি বিরাজমান থাকে। এছাড়াও 'অপ্রমাদ বর্গে' বিশেষ বিবেচনা সহকারে কার্য সম্পাদনের কথা উল্লেখ আছে।[৩৮] 'রাজাববাদ জাতকে' দেখা যায়, রাজা বিচার কার্য পরিচালনা করার সময় ক্রোধ, লোভাধির বশীভূত না হয়ে বিচার বুদ্ধি দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করতেন।[৩৯]

৫.৩. মনের দৃঢ়তা

মন বা চিত্ত অস্থির দুর্দমনীয়। তাকে কোনো অবস্থায় স্থির রাখা যায় না। সমস্ত কাজের মধ্যে মন অগ্রগামী। মানুষ যে সুখ এবং দুঃখ পায় তার প্রকৃত কারণ মন। মানুষ যা ভোগ করছে তার প্রায়ই মনের সৃষ্টি। মোট কথায় মন ব্যক্তিকে যেমন সুখী করে তোলে আবার ব্যক্তিকে অসুখী করে তোলে। এক্ষেত্রে মন যার সংযম বা যে মনকে আত্মবশ আনতে পেরেছে সুখ আর শান্তি তাঁর অনিবার্য। ত্রিপিটকের অনন্তর্গত *'মধ্যম নিকায়'* গ্রন্থের 'পোটালিয় সুত্ত'-এ বুদ্ধ আট প্রকার চিত্তবিক্ষেপ পরিহার করা কথা বলেন। এগুলো হলো[৪০] :

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৪ : চিত্ত বিক্ষেপ

এই অষ্টবিধ চিত্ত বিক্ষেপ সৎভাবে জীবনযাপনে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং উপরি-উক্ত চিত্ত বিক্ষেপ থেকে দূরে অবস্থান করে সম্যকভাবে জীবনযাপন করা অত্যাবশ্যক। চিত্তকে বিক্ষেপ করে তোলে কিছু ক্লেশ। *'মধ্যম নিকায়ের'* এর 'বস্ত্রোপম সূত্রে' উল্লেখ আছে, চিত্তের উপক্লেশের কথা উল্লেখ রয়েছে। এগুলো হলো : অভিধ্যা (বিষম লোভ) চিত্তের উপক্লেশ, ব্যাপাদ (হিংসা প্রবৃত্তি) চিত্তের উপক্লেশ, ক্রোধ উপক্লেশ, উপনাহ, মক্ষ, পর্য্যাস, ঈর্ষ্যা, মাৎসর্য, মায়া, শঠতা, স্তম্ভ, সংরম্ভ, মান, অতিমান, মদ ও প্রমাদ চিত্তের উপক্লেশ।[৪১] সুতরাং, আমাদের প্রত্যকেই জীবনকে সুন্দর করে গঠন করার জন্য চিত্তকে সংযম করা দরকার।

৫.৪. নৈতিকতা

জাগতিক দুঃখকষ্ট ও নৈরাশ্যের অন্ধকারের মাঝে বুদ্ধ মানুষকে শুনিয়েছিলেন আশার বাণী। প্রবর্তন করেন সাম্যের ধর্ম আর আধ্যাত্মিক ও নৈতিক চেতনায় মানুষকে করেন উদ্বুদ্ধ। জীবন প্রবাহে দুঃখ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার মানুষ প্রতিনিয়ত সুখের আশায় দুঃখকে স্বাগত জানায়। বলা যায়, নদীর জোয়ারের ন্যায় মানবজীবন দুঃখে পরিপূর্ণ। আচার্য শান্তিদেবের ভাষায়: "দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করতে গিয়েও জীব দুঃখের পিছনেই ধাবিত হয়, সুখ প্রত্যাশায় মোহের তাড়নায় তারা শত্রুর ন্যায় আপন সুখকে ধ্বংস করে।[৪২] দুঃখ প্রসঙ্গে বুদ্ধ তাঁর পঞ্চবর্গীয়[৪৩] শিষ্যদের আহ্বান করে বললেন: 'জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, প্রিয় বিয়োগ দুঃখ, ঈপ্সিত বস্তুর অপ্রাপ্তি দুঃখ সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদান স্বন্ধই দুঃখ'।[৪৪]

Dhaka University Institutional Repository

এক্ষেত্রে আদর্শিক ও নৈতিক মানবজীবন গঠন বুদ্ধের শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। তাঁর নির্দেশিত চতুরার্যসত্য"[৪৫] ও অষ্টবিধ মার্গ"[৪৬] অনুসরণের মাধ্যমে অনিন্দ্য চিরশাশ্বত সুন্দর সমাজজীবন গঠন করা সম্ভব। মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য নির্ধারক কুশলা কুশলের কারণ অন্য কেহ নয়। নিজের জ্ঞান, বিদ্যা-বুদ্ধি ও কৌশলে প্রজ্ঞা দ্বারা করলে সুফল অবশ্যম্ভাবী। এ সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন: 'বৌদ্ধ ধর্মের উপদেশ এই যে, প্রত্যেক মানুষ্য কর্মগুণে নিজ পূণ্য বলে, আত্মপ্রভাবে, বীর্য বিসর্জন, প্রেম, দয়া, মৈত্রী বন্ধনে ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল-নিদান মুক্তি লাভের অধিকারী। যে পথে চলতে হবে, তা বুদ্ধ প্রদর্শিত অষ্টাঙ্গিক ধর্মপথ'।[৪৭] শৃঙ্খলিত ও আদর্শ সমাজগঠনের রূপকার বুদ্ধ। এক্ষেত্রে তাঁর নির্দেশিত পঞ্চশীল[৪৮] চরিত্র গঠন করে নিষ্কলুষ জীবনগঠনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে নিম্নের উক্তিটিকে বিশেষভাবে স্মরণ করা যায়। এ বিষয়ে এখানে উল্লেখ রয়েছে : 'মানবাধিকার ভিত্তিক নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটাতে হলে প্রয়োজন ধর্মবর্ণজাতি নির্বিশেষে সকল মানুষের কাজে গ্রহণযোগ্য আচরণ বিধি প্রণয়ন করা। এক্ষেত্রে বুদ্ধের পঞ্চশীল সহস্রাব্দের সংঘাতমুক্ত ও দারিদ্রমুক্ত নতুন মানবসভ্যতা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে নয়; সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য তাঁর দেয়া পঞ্চশীল আদর্শ মানবসমাজ গড়ার অন্যতম হাতিয়ার। যতদ্রুত এর প্রচার সম্ভব হবে ততদ্রুত মানুষে-মানুষে, রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে ও সমাজে-সমাজে ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য সৃষ্টির ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হবে'।[৪৯] এক্ষেত্রে বুদ্ধ অহিংসা নীতির কথা বলেন এভাবে : প্রাণিহত্যা করো না; প্রাণঘাতের কারণ হইও না; অপর কর্তৃক হননের অনুমোদন করো না। সবল দুর্বল নির্বিশেষে সর্ব প্রাণীর প্রতি হিংসা বিরতি হবে।[৫০]

বুদ্ধের নীতিকথা বিশ্ববাসীর জন্য এক উদার আহ্বান। 'বুদ্ধ বর্গে' সকল পাপ কাজ থেকে বিরতি কুশল কর্মের অনুষ্ঠান এবং আপন চিত্তকে বিশুদ্ধি করার কথা বলেন।[৫১] এই ধরনের হিতোপদেশ একদিকে যেমন সুন্দরতম জীবনগঠনে সাহায্য করে অন্যদিকে নিরাশার ঘন অন্ধকারে কাঙ্খিত আশার প্রতিফলন ঘটাতে পারে। আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্বে তাঁর বাণীকে নৈতিকজীবন গঠনকারী, চরিত্র, সামাজিক সম্প্রীতি, সৌহার্দ বন্ধনে মহৌষধ হিসাবেও ব্যবহার করা যায়। তাছাড়া বুদ্ধ ভাষিত কথাগুলো মঙ্গলসূত্র, সিগালোবাদ সূত্র, কূটদন্ত সূত্র, পরাভব সূত্র, দীঘজানু সূত্র, শীল, জাতক সাহিত্যসহ ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়।

৫.৫. চিত্তের একাগ্রতা

চিত্তের একাগ্রতা মানে মনের স্থিরতা। এই স্থিরতা শুধু যারা ধ্যান করবেন তাদের জন্য নয় এটি সকলের জন্য প্রয়োজন। অর্থাৎ, আধ্যাত্মিক উন্নতির পাশাপাশি ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে উন্নতির জন্য চিত্তের একাগ্রতা প্রয়োজন। হতে পারে তা ছোট শিশু থেকে বৃদ্ধ যে কেউ। শিশুরা যদি খাওয়ার সময় খাওয়ার প্রতি একাগ্রতা, খেলার সময় খেলার প্রতি একাগ্রতা, ঘুমানোর সময় ঘুমের প্রতি একাগ্রতা দেখায় তখন সে শিশু সুস্থ ও সুন্দর ভাবে বেড়ে উঠবে। এমনি ভাবে শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার প্রতি একাগ্রতা, কর্মক্ষেত্রে নিজ নিজ কার্জে প্রতি একাগ্রতাসহ সমাজের সকল ব্যক্তি বিশেষে একনিষ্ঠ হলে সমাজ উন্নত ও সমৃদ্ধ হবে। মানবজীবনকে সার্থক করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একাগ্রতার বিকল্প নেই। বিক্ষিপ্ত, বিচরণশীল চিত্তকে সংযত করার ক্ষেত্রে একাগ্রতা অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করে। নৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

আচার-আচরণ পরিপুষ্ট একাগ্রতা মহামঙ্গল সাধন করে। একটি মাত্র বিষয়ে চিত্তের একাগ্র অবস্থানই হলো সমাধি। সমাধি হলো আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অষ্টম মার্গ।[৫২] এই সমাধি কাম, তৃষ্ণা, লালসা, লোভ-দ্বেষ-মোহ, বিদ্বেষ, তন্দ্রালস্য, সৎ কর্মে অলসতা সংশয়াদি অপসারিত করে। বুদ্ধ প্রদর্শিত চিত্তের একাগ্রতা সকলের পালনীয় সাধারণ নিয়মাবলি। এই নিয়মগুলো পালনে সামাজিক জীবন সুখের হবে।

বুদ্ধের উপদেশে বাস্তবতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বোধিজ্ঞান লাভ করার পর কঠোর তপস্যা কিংবা সাধনা দ্বারা যে সত্য লাভ করেছেন তা বিষয়াসক্ত সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবে না মনে করে ধর্মদেশনার প্রতি নিরুৎসাহিত হোন। তারপর প্রথমে আরাড় কালামকে ধর্মোপদেশ প্রদান করার চিন্তা করলেও তাঁর প্রয়াণের কথা জেনে তিনি স্মরণ করলেন পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদেরকে। এমতাবস্থায় তিনি অনুসন্ধান করতে করতে সারনাথে এসে প্রথমেই পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের নিকট ধর্মপ্রচার করেন। বুদ্ধ তাঁদেরকে আহ্বান করে বলেন 'হে ভিক্ষুগণ! দুই অন্ত অনুশীলন (চরম পন্থা) সেবা করা অনুচিত। কামসুখের প্রতি অনুরক্তি বা আসক্তি হওয়া। আর আত্মনিগ্রহে অনুরক্তি (শারীরিক কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন) যা দুঃখদায়ক অনুৎকৃষ্ট এবং অনর্থযুক্ত'।[৫৩] এই দুই অন্তের অনুগামী না হয়ে তিনি তাঁর উপদেশে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করার কথা বলেন। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ (সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি) হলো সেই 'মধ্যম প্রতিপদা'। যাপিতজীবনের প্রতিটি পর্যায়ে এই মধ্যম পন্থা নিয়ম বিশেষভাবে প্রযোজ্য। আধুনিক জীবনের প্রায় প্রতিটি পর্যায়ে মধ্যম প্রতিপদার প্রায়োগিক ব্যবহার বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

৬. ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্মের প্রায়োগিক দিক

বিশ্বশান্তি, সম্প্রীতি-সদ্ভাব-সৌভ্রাত্ববোধ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্মের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বর্তমান হিংসায় উন্মত্ত বিশ্বে বুদ্ধবাণীর তাৎপর্য রয়েছে শান্তি, সংহতি, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃতবোধ রক্ষায়।

৬.১. পারস্পরিক ঐক্য ও সংহতি স্থাপন

সমাজ ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশ্বশান্তি, সৌভ্রাতৃত্ব ও সদ্ভাবের কথা বার বার উচ্চারিত হয়। যা আমরা বুদ্ধের জীবন উপদেশে পেয়ে থাকি। *'মহাবর্গ'* গ্রন্থের 'কৌশাম্বী স্কন্ধে' কৌশাম্বীতে অবস্থানরত ভিক্ষু-সংঘকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা পারস্পরিক ঐক্য-সংহতি ও শান্তি পুনঃস্থাপনে এবং বিভেদগামী শক্তিগুলোকে সন্ধি স্থাপনে মাধ্যমে সমঝোতার পথে নিয়ে আসার এক সৃষ্টিকারী নিদর্শন। এখানে দেখা যায় পরস্পর বিবাদমান দুই দল ভিক্ষু-সংঘ প্রতিকার চেয়ে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হোন। বুদ্ধ তখন তাঁদেরকে তিরস্কার ও কঠোর বাক্য বলতে নিষেধ করেন।[৫৪]

কেননা, শত্রুতার দ্বারা কিংবা কঠোর বাক্য দ্বারা কখনো সমাস্যার সমাধান করা যায় না। শুধু তাই না এটি কখনো সুখ ও শান্তি নিয়ে আসে না। বরঞ্চ প্রত্যেক সংঘের জন্য আলাদা আলাদা বাসস্থানের ব্যবস্থা করা এবং তাঁদের সঙ্গে ঐক্যমতের সাথে বসবাস করার কথা বলেন। প্রত্যেকের কথা অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে শ্রবণ করার জন্য বলেন। যখন

Dhaka University Institutional Repository

উভয়পক্ষ তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করবেন তখন সংঘ একটি সহমতে উপনীত হয়ে ঐক্য পুনঃস্থাপনে খুবই আন্তরিক হবেন। এ ব্যাপারে এক পক্ষ কখনো অন্যপক্ষের চেয়ে বেশি সুযোগ সুবিধা পেতে পারেন না। এখানে ঐক্য, সংহতি এবং একতাবদ্ধতার জন্যে সপ্ত অপিরহিনীয় ধর্ম বিশেষভাবে ভূমিকা পালন করে।[৫৫]

৬.২. আত্ম-অহমিকা ত্যাগ

অশান্তির মূল কারণ হলো তার আত্মঅহঙ্কার। অহঙ্কার ব্যক্তিকে আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে। কেবল মনে করে পৃথিবীটা শুধু তারই। অন্য কারো নয়। এরূপ মিথ্যাবোধ ও অহঙ্কার থেকেই নানাবিধ কলহ, মারামারি, বিভেদ ইত্যাদি। কিন্তু প্রতিদিনের উদাহরণ থেকে কেউ কখনো বুঝতে চায় না জীবন নশ্বর। নশ্বর জীবনে আমাদের আয়ু খুবই অল্প। তাই লাভ-ক্ষতিসহ নানাবিধ কলহ-সংশয়ের শেষ হয় না। একদিন কৌশাম্বী নগরের দুই দল ভিক্ষুর মধ্যে কলহ হলে মীমাংসা করতে না পেরে বুদ্ধ নিকট গিয়ে এর প্রতিকার কামনা করলেন। '*ধম্মপদ*' এ 'যমক বর্গে' উল্লেখ আছে :

পরে চ ন বিজানন্তি মযমেত্থ যমামসে
যে চ তত্থ বিজানন্তি ততো সম্মন্তি মেধগা॥[৫৬]

অর্থাৎ, মুর্খেরা জানে না যে তারা চিরকাল এই সংসারে থাকবে না। যাঁরা জানেন তাঁদের কলহ বিদূরিত হয়।

৬.৩. মানবিক মর্যাদাবোধ

বুদ্ধ তাঁর শিক্ষায় মানবিক মর্যাদার গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তাঁর প্রবর্তিত ধর্মে সকলেই সমান। বুদ্ধ বলেছেন গঙ্গা, যমুনা, অচিরাবতী, সরভূ, মহী, আদি মহানদী মহাসমুদ্রে এসে নিজেদের পূর্বের নাম ও গোত্র পরিত্যাগ করে মহাসমুদ্রে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং শূদ্র চারি গোত্রীয় লোক বুদ্ধের শাসনে এসে পূর্বের নাম, গোত্র এবং বংশ ত্যাগ করে শাক্যপুত্র নামে পরিচিতি লাভ করে।[৫৭] রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, উচু-নিচু কোনো ভেদাভেদ এখানে লক্ষ্য করা যায় না। সমাজের সকল মানুষের সমান মূল্যায়নের কথা উল্লেখ করেছে। '*দীর্ঘনিকায়*' গ্রন্থের 'কূটদন্ত সূত্রে' সমাজের চার উপাদানের কথা উল্লেখ রয়েছে ।[৫৫]

এখানে সকলের সম্মতিতে ঐক্যমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কথা উল্লেখ রয়েছে। সকলে স্ব-স্ব কথাবার্তা স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করতে পারতেন। মত প্রকারের এরূপ স্বাধীনতাকে অনুমতি পক্ষ বলা হয়।

১. রাজ্যের নিগম
২. জনপদ ক্ষত্রিয়
৩. সামন্ত্র রাজগণ
৪. ব্রাহ্মণ মহাজন

১. রাজ্যের নিগম : রাজ্যের নিগম হলো নগর, লোকালয়, হাট, বাজার, বাণিজ্যস্থান এর ব্যক্তিবর্গ।

২. জনপদ ক্ষত্রিয় : জনপদ ক্ষত্রিয় হলো বিভিন্ন রাজ্যের রাজন্যবর্গ।

Dhaka University Institutional Repository

৩. সামন্ত্র রাজগণ : সামন্ত্র রাজগণ হলো রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছোট ছোট প্রদেশের নৃপতি (গ্রামের প্রধান)।

৪. ব্রাহ্মণ মহাজন : ব্রাহ্মণ মহাজন পুরোহিত শ্রেণী অর্থাৎ, পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ।

অর্থাৎ, উপরি-উক্ত চার প্রকার নিগমে মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণেই মানবিক মর্যাদাকে প্রকাশিত করে।

৬.৪. সততার সাথে জীবনযাপন

সংঘবদ্ধ হয়ে মানুষ সমাজে বসবাস করে। জীবিকার তাগিদে নানারকম কর্ম সম্পাদন করে। আর সমাজগঠনে বুদ্ধ অষ্টবিধ মার্গের কথা বলেন। এই মার্গসমূহ বর্তমান টেকসই উন্নয়নে বেশ জোড়ালো ভূমিকা পালন করে। এই অষ্টবিধ মার্গের অন্যতম হলো সম্যক জীবিকা। সম্যক জীবিকা সৎভাবে জীবনযাপনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সৎ ভাবে জীবন যাপন করতে হবে। সৎ জীবনযাপনে জীবিকাই প্রধান। সৎ জীবন যাপনে কোনোরকম পাপের স্পর্শ থাকবে না। রিস ডেভিড সৎভাবে জীবনযাপনের জন্য সৎ পথকে অবলম্বন করার কথা বলেন।[৫৯] বর্তমান বিশ্ব তথ্য ও প্রযুক্তিময়। আধুনিকতার ছোঁয়ায় কেন যেন নিন্দিত ও গর্হিত কর্মকাণ্ড গুলো বেড়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। এই অশোভনীয় কর্মকাণ্ডগুলো সম্যক জীবিকার অন্যতম অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। তাই সুস্থ ও সুন্দরভাবে জীবনযাপনের জন্যে অসাধু উপায়ে অর্থ উপার্জন, চুরি, ডাকাতি, নিন্দিত ব্যবসা-বাণিজ্যকে ত্যাগ করা উচিত।[৬০] সৎজীবন যাপনের ক্ষেত্রে বুদ্ধ পঞ্চ বাণিজ্য[৬১] নিষেধ করেছেন। এগুলো হলো ১. অস্ত্র ব্যবসা হতে বিরত, ২. প্রাণী ব্যবসা হতে বিরত ৩. মাংস ব্যবসা হতে বিরত, ৪. নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত এবং ৫. বিষ ব্যবসা হতে বিরত। এই পাঁচ প্রকার বাণিজ্য পারিবারিক, সামাজিক, ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির সৃষ্টি করে। পঞ্চ বাণিজ্য ব্যতিরেকে এবং সৎকর্মের পরিপন্থীমূলক কর্ম পরিহার করে জীবিকা অর্জনই হলো সৎ জীবিকা। একই সাথে আবার আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের মধ্যে সম্যক জীবিকাতেও সৎ জীবন যাপনের কথা উল্লেখ রয়েছে। কারো কোন ক্ষতি না করে বৈধ ভাবে জীবিকা নির্বাহ করাই হচ্ছে সম্যক জীবিকা ।

৬.৫. জীবনগঠনের মূলমন্ত্র

বুদ্ধের উপদেশ থেকে জীবন গঠনের মূলমন্ত্র পাওয়া যায়। পরস্পর সহমর্মিতা বৌদ্ধধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একে অপরের দুঃখে দুঃখিত, কষ্টে কষ্ট অনুভব, বেদনায় বেদনা প্রদর্শন যখন হৃদয় কেঁদে উঠে তখন পাশে গিয়ে সমব্যথিত হওয়া সহমর্মিতা। সহমর্মিতার প্রধানতম শক্তি হলো মানসিক শক্তি প্রদান। এই সম্পর্কে বুদ্ধের ব্রহ্মবিহার অনুশীলন প্রয়োজন। এগুলোকে জীবন গঠনের মূলমন্ত্র হিসেবে বিবেচিত।

জীবন গঠনের মূলমন্ত্রের এই চারটি[৬২] ধাপ হলো :

- মৈত্রী
- করুণা
- মুদিতা
- উপেক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

মৈত্রী : জগতের সকল প্রাণীর শত্রুহীন নীরোগ সুখী হওয়ার ভাবনা হলো মৈত্রী ভাবনার মূলমন্ত্র। ফলে মানুষের মধ্যে হিংসাভাব থাকবে না। পৃথিবী পরিণত হবে একটি পরিবারে।

করুণা : জগতের সকল প্রাণী দুঃখ মুক্ত হোক। এটা হলো করুণা ভাবনার মূলমন্ত্র। করুণা লক্ষ্য হলো মানুষের আমিত্বভাব দূর করে।

মুদিতা : জগতের সকল প্রাণীর শ্রী বা সৌন্দর্য, সম্পদ, যশ দেখে আপন চিত্তের সুখানুভূতি হলো মুদিতা অনুশীলনের মূলমন্ত্র।

উপেক্ষা : অষ্টলোক ধর্মের (লাভ-অলাভ, যশ-অযশ, নিন্দা-প্রশংসা এবং সুখ-দুঃখ) অবিচল থাকার নামই উপেক্ষা। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষার অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজের মানুষ বিবেকবান ও মানবিক হয়ে উঠে। তাছাড়া বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায়ও এই চারি বিশেষ গুণগুলো বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে।

৬.৬. সমতা নিশ্চিতকরণ

দিন দিন উন্নত থেকে উন্নতর হলেও মন-মানসিকতায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে। আজও ভেদাভেদ হয়। বর্ণ বৈষম্য হয়। মহামানব বুদ্ধ মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ঘুচাতে সাম্যের কথা বলেছেন। বৌদ্ধ সংঘে জাতিভেদ অনুপস্থিত। তিনি তাঁর সংঘে সকল জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্রের, পেশার মানুষকে স্থান দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ বর্গে বুদ্ধ বলেছেন :

ন জটাহি ন গোত্তেহি ন জচ্চা হোথি ব্রাহ্মণো
যমহি সচ্চঞ্চ ধম্মোচ সো সুচী সো চ ব্রাহ্মণো।[৬৩]

অর্থাৎ, জটা, গোত্র কিংবা জাতির পরিচয়ে কেউ ব্রাহ্মণ হয়না। যার অন্তর সত্য ও ধর্ম বিরাজমান তিনিই ব্রাহ্মণ।

৭. টেকসই উন্নয়নে বুদ্ধের ব্যবহারিক শিক্ষার স্বরূপ অন্বেষণ

বর্তমান বিশ্ব তথ্য-প্রযুক্তিময়। বিশ্বায়নের যুগে নানাবিধ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সকলের চাহিদা পূরণ করা হয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মে কথা মনে করে মজবুত ও টেকসই গৃহীত কর্ম পরিকল্পণার নাম হলো টেকসই উন্নয়ন। বর্তমানে এটি Sustainable Development Goals নামে পরিচিত। টেকসই উন্নয়ন বলতে শুধুমাত্র পরিবেশ সংরক্ষণ কিংবা পরিবেশের উন্নয়ন, শিল্প কলকারখানা বৃদ্ধি, এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়। এই উন্নয়নের লক্ষ্য মাত্রায় সামাজিক এবং মানবিক উন্নয়নও অন্তর্গত। দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন করাই হলো টেকসই উন্নয়নের পূর্ব শর্ত। বর্তমান যে টেকসই উন্নয়নের কথা বলা হচ্ছে সেখানে বৌদ্ধধর্মের ব্যবহারিক দিকটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সমাজ তথা রাষ্ট্রের টেকসই উন্নয়ন কেবল প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, উন্নতি বা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি তথা প্রবৃদ্ধির বিষয় নয়, বরং এটি একটি সামগ্রিক নৈতিক দর্শন যা মানবিকতা ও নৈতিকতার মূল্যবোধের উপর অনেকাংশে ভিত্তি করে গড়ে উঠে। এক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্মের ব্যবহারিক দিকগুলো যেমন সহমর্মিতা, সততা, সমতা, ন্যায়পরায়ণতা, সংযম প্রভৃতি আন্তঃনির্ভরশীলতার ধারণা টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই আগামীর টেকসই বিশ্ব গঠনে ধর্মীয় ও নৈতিক দর্শনের সমন্বয় অত্যাবশ্যক।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৫ : টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, উৎস : https://www.bishleshon.com/7229/

প্রাত্যাহিক যাপিতজীবনে ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্ম শৃঙ্খলিত ও সতত সুন্দরভাবে পথ চলতে সহায়তা করে। নিচে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্মের রূপরেখার একটি ধারণা উপস্থাপন করা হলো :

চিত্র ৬ : ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্মের রূপরেখা, উৎস: গবেষক নিজে

Dhaka University Institutional Repository

৭.১. বিশ্বশান্তি

বুদ্ধের ধর্ম শান্তির ধর্ম। বুদ্ধ সারা জীবন তাঁর বিভিন্ন উপদেশে জগৎ ও জগৎবাসীর কল্যাণের জন্য মঙ্গল, শান্তি, অহিংসা, সম্প্রতির বাণী প্রচার করে গেছেন। বর্তমান হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে বুদ্ধ বাণীর খুব প্রয়োজন। মৈত্রী, মুদিতা, করুণা ও উপেক্ষায় পূর্ণ বুদ্ধজীবন। তিনি বলেন :

"ন হি বেরেন বেরানি সম্মন্তী'ধ কুদাচনং
অবেরেন চা সম্মন্তি, এস ধম্মো সনন্তনো॥"[৬৪]

অর্থাৎ, শত্রুতার দ্বারা কখনো শত্রুতা প্রশমিত হয় না। শত্রুহীনতার দ্বারাই শত্রুতা প্রশমিত হয়। এটিই হলো সনাতন ধর্ম।

বুদ্ধের আড়াই হাজার বছর পূর্বেও প্রদত্ত শান্তি, অহিংসা, মৈত্রীর বাণী বর্তমান অশান্ত পৃথিবীতে খুবই প্রয়োজন যা জগৎবাসীর জন্য কল্যাণ, শান্তি বয়ে আনবে। এই শান্তি একক শান্তি নয় এটি সমষ্টিগত শান্তি। এর মধ্যে রয়েছে ব্যক্তি, পরিবার, প্রতিবেশী, সমাজ, রাষ্ট্র, বিশ্ব, আর্ন্তজাতিক অঙ্গন, রাজনীতি অর্থনীতি, পরিবেশ এর উপাদান, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষ-লতা, পশু-পাখি এগুলোর সুখ-শান্তি নিশ্চিয়তা প্রদান করা। বিশ্বশান্তির কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়, জানমালের নিরাপত্তা, খাদ্যের নিরাপত্তা, চিকিৎসা ব্যবস্থার নিরাপত্তা। বৌদ্ধধর্মের বাণীগুলো বিশ্বশান্তির অমূল্য উপাদান রয়েছে যা প্রয়োগ করে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার যে উপদানগুলো ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্মের বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত সেগুলো নিম্নে প্রদান করা হলো:

লক্ষ্য ১ : দারিদ্র্য বিলোপ
লক্ষ্য ২ : ক্ষুধা মুক্তি
লক্ষ্য ৩ : সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ

৭.২. অর্থনীতি

অর্থনীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যা একটি দেশের উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত। একটি দেশ তথা রাষ্ট্র দারিদ্র সীমার মধ্যে রয়েছে নাকি দারিদ্র সীমার উপরে বা নিচে অবস্থান করছে তা আমরা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে জানতে পারি। তাই বলা যায় সামাজিক নিরাপত্তার মধ্যে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অর্থনৈতিক নিরাপত্তার বিষয়টি মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে সুপ্রসারিত। কেননা মানবজীবনের চলাফেরা, জীবিকা, কর্ম, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা সর্বক্ষেত্রে অর্থনীতির সাথে কোনো না কোনো ভাবে সম্পর্কযুক্ত। ফলে জীবিকা অন্বেষণ, ধন-সম্পদ অর্জন উৎপাদন ইত্যাদির ক্ষেত্রে নিরাপত্তার ও সংরক্ষণের প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধ ধন-সম্পদ সুরক্ষা করা প্রসঙ্গে বলেন ; চারটি[৬৫] পথ অনুসরণ করে ব্যক্তি সম্পদ আয় করতে পারেন । চারটি পথ হলো : ক. স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত না হওয়া, খ. মাদকজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ না করা, গ. জুয়া ও পাশা খেলায় না করা, এবং ঘ. কল্যাণকর্ম সম্পাদনকারীর সাথে বন্ধুত্ব, সাহচর্য এবং ঘনিষ্টতা।

একই সাথে বুদ্ধ সম্পদ নষ্ট হওয়ার ছয়টি[৬৬] কারণ উল্লেখ করেছে ১. নেশা জাতীয় দ্রব্যে আসক্তি ২. অসময়ে পথেঘাটে বিচরণ করা, ৩. নৃত্য-গীত গানের মাধ্যমে হওয়া, ৪. দ্যূতক্রীড়ায় অর্থাৎ পাশা, তাস, জুয়াখেলা ইত্যাদিতে আসক্তি হওয়া ৫. পাপমিত্র বা অসৎ মিত্র সংসর্গ লাভ করা ৬. আলস্য পরায়ণতা হওয়া। সঞ্চিত অর্থ যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে নজর দেওয়া দরকার। অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে বিভিন্ন শিল্পকর্ম সম্পাদন করা আবশ্যক। এখানে বুদ্ধ বলেন :

বাহু সচ্চঞ্চ সিপ্পঞ্চ বিনযোচ সুসিকখিতো
সুভাসিতা চ যা বাচা এতং মঙ্গলং মুত্তমং॥[৬৭]

অর্থাৎ, বহু রকম বিদ্যা অর্জন করা বহুবিধ শিক্ষা লাভ করা, বিনয়ী হওয়া এবং মিথ্যা বাক্য ত্যাগ করে সত্যবাক্য বলার মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি করা উত্তম মঙ্গল।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার যে উপদানগুলো ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্মের অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত সেগুলো নিম্নে প্রদান করা হলো :

লক্ষ্য ১ : দারিদ্র্য বিলোপ
লক্ষ্য ২ : ক্ষুধা মুক্তি
লক্ষ্য ১২ : পরিমিত ভোগ ও উৎপাদন

৭.৩. নৈতিকতা/মানবিকতা

বুদ্ধের শিক্ষা ও আদর্শ মানুষের মধ্যে নৈতিকতা মানবিক মূল্যবোধের বীজ রোপন করে। ব্যক্তির নৈতিক শিক্ষা মানবিকতায় উদ্ধুদ্ধকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নৈতিক শিক্ষার বিষয়ে বুদ্ধ আদর্শ ও নীতির কথা বলেছেন তাঁর বাণীর সর্বক্ষেত্রে। নৈতিক শিক্ষায় উন্নতি হলে ব্যক্তির মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে। এজন্য প্রয়োজন প্রকৃত, সৎ, আদর্শিক, নীতি শিক্ষা অর্জন করা। মোটকথা যাকে বলা যায় মানসম্মত শিক্ষা। বর্তমান অস্থির বিশ্বে নৈতিকতার চর্চার খুব বেশী দরকার। যা কিনা ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে কর্ম ক্ষেত্রে মানুষকে নীতির মধ্যে থেকে কাজ করতে শিক্ষা দেয়। এখন এই চর্চাকে শুদ্ধাচার বলে অবহিত করা হয়। ত্রিপিটকের মধ্যে বিনয় পিটক নীতি নৈতিকতা বিষয় সমূহই বর্ণনা করা হয়েছে। সূত্র পিটকের পরাভব সূত্র, মঙ্গল সূত্র, মেত্ত সূত্র প্রভৃতি ছাড়াও পঞ্চ শীল, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ও জাতকসহ পিটকীয় এবং পিটক বহির্ভূত বিভিন্ন গ্রন্থে এই নীতি-নৈতিকতার বিষয়ে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার যে উপাদানগুলো ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্মের নৈতিকতা/মানবিকতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত সেগুলো নিম্নে প্রদান করা হলো :

লক্ষ্য ৪ : মানসম্মত শিক্ষা

৭.৪. সমতা

সমতা হলো জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ, দলিত-অদলিত, সাদা-কালো সকল মানুষের জন্য সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা। বুদ্ধ অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবাইকে এক দৃষ্টিতে দেখেছেন। বুদ্ধই প্রথম জাতিভেদ প্রথার বিরোধী ছিলেন। তাইতো তিনি এখনো ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। তিনি উদাত্ত আহ্বান করে বলেন। 'জটা, গোত্র বা জাতির পারিচয়ে কেউ ব্রাহ্মণ হয় না, গোত্রের পরিচয়ে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। জন্ম দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না, জন্ম দ্বারা কেহ অব্রাহ্মণ হয় না; কর্মের দ্বারাই ব্রাহ্মণ কিংবা অব্রাহ্মণ হয়। জন্মের দ্বারা কেউ চণ্ডাল হয় না আবার কর্মের দ্বারাই চন্ডাল হয় না বলেও বুদ্ধ বলেন।[৬৮] বুদ্ধ জাতিভেদ তথা বর্ণ- বৈষম্য প্রথাকে সামাজিক ব্যাধি হিসেবে অভিহিত করেন। '*দীর্ঘ নিকায়*' নামক গ্রন্থে দেখা যায়: 'জাতিভেদ প্রথা কোন ঐশ্বরিক সৃষ্টি নয়, এটা মানুষের দ্বারা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট'।[৬৯] তাই তো তিনি তাঁর সংঘে সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে প্রবেশাধিকার দিয়েছিলেন।[৭০] এমন কি, একই সাথে নারীদের সমান অধিকারও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন।।[৭১] যা কিনা সমতা প্রদানের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এরকম বহু ধারণা বুদ্ধের শিক্ষা থেকে পাওয়া যায় যেখানে সমতার বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার যে উপদানগুলো ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্মের সমতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত সেগুলো নিম্নে প্রদান করা হলো :

লক্ষ্য ৫ : লিঙ্গ সমতা

লক্ষ্য ১০ : অসমতার হ্রাস

৭.৫. পরিবেশ

মানবসভ্যতার বিকাশের সাথে ধারাবাহিক ভাবে মানুষ গড়ে তুলেছে পরিবেশ। পরিবেশ প্রাণীর ধারক ও বাহক। মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের একমাত্র অবলম্বন হলো পরিবেশ। বুদ্ধের শিক্ষা-দর্শনে পরিবেশ-সম্পর্কিত সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। বুদ্ধের জীবনের সাথে পরিবেশের এক ঘনিষ্ঠ, অনবদ্য ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। কেননা বৌদ্ধধর্মের গোড়াপত্তন থেকে শুরু করে ধর্ম প্রচার-প্রসারসহ প্রায় মহান সব ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল প্রকৃতি ও পরিবেশকে কেন্দ্র করে। প্রকৃতির সকল উপাদান রক্ষা করার প্রতি ছিল বুদ্ধের সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি। কেননা, তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বৃক্ষ শুধু নৈসর্গিক শোভা নয়; মানুষের যাপিতজীবনের অপরিহার্য অংশবিশেষ। বর্তমান সময়ে দূষণসমস্যা পরিবেশের সবেচেয়ে ক্ষতিকর দিক। বুদ্ধ পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখার জন্য আত্মপ্রত্যয়ী ছিলেন। তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে তৃণ-ঘাস-জলে মলমূত্র, থুথু ফেলে পানিকে দূষিত করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন।[৭২] মহামতি বুদ্ধ পরিবেশ পরিচ্ছন্নকরণে সচেতন ছিলেন। তিনি

Dhaka University Institutional Repository

ভিক্ষুদেরকে যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে তা ফেলার জন্য বিশেষ অনুজ্ঞা প্রদান করেন।[৭৩] যত্রতত্র মল-মূত্র ত্যাগ করার কারণে পরিবেশ ভীষণভাবে দূষিত হয়। সর্বত্রে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ না করার জন্য তিনি বিধি-বিধানও আরোপ করেন। তিনি শৌচাগার থেকে যাতে মল-মূত্রের দুর্গন্ধ বের হয়ে না আসে সে জন্য যথাযথ ঢাকনা ব্যবহার করার কথা বলেন। শুধু তাই নয়, তিনি মল-মূত্র ত্যাগ করার স্থানকে কীভাবে তৈরী করতে হয়- সে বিষয়ে ধারণা প্রদান করেন। বর্তমান সময়ের যে শৌচাগার ব্যবহার করা হয়। এই শৌচাগার সম্পর্কে বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের অবহিত করেন।[৭৪]

বৃক্ষ হচ্ছে প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ উপহার। বনজাত গাছ-পালার মাধ্যমে ভূ-মণ্ডলের পরিবেশ ও প্রকৃতির ভারসাম্য সংরক্ষণ করা হয়। বৃক্ষ প্রকৃতি ও পরিবেশের পরম বন্ধু। বৃক্ষকে সর্বপ্রথম এক জীববিশিষ্ট প্রাণী বলা হয় বলে ।[৭৫] সুতরাং ইতঃপূর্বে আর কেউ বৃক্ষকে প্রাণী হিসেবে স্বীকৃতি বা চিহ্নিত করেনি। পরবর্তী সময়ে স্যার জগদীশচন্দ্র বসু প্রমাণ করলেন গাছের প্রাণের অস্তিত্বের কথা। বৃক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রকার ওষুধ তৈরি করা হয় যা *'ত্রিপিটক'* -এর অন্তর্গত *'বিনয় পিটক'* গ্রন্থের মহাবর্গের ভৈষজ্য স্কন্ধে উল্লিখিত রয়েছে।[৭৬]

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার যে উপদানগুলো ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্মের পরিবেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত সেগুলো নিম্নে প্রদান করা হলো :

লক্ষ্য ৬ : নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন

লক্ষ্য ৭ : সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি

লক্ষ্য ১৩ : জলবায়ু কার্যক্রম

লক্ষ্য ১৪ : জলজ জীবন

লক্ষ্য ১৫ : স্থলজ জীবন

৭.৬. সুশাসন

শুদ্ধতা, উন্নত, সংযত, কল্যাণকর, ন্যায়বোধ, নৈতিকতা, বিশুদ্ধ জীবন যাপনের শিক্ষা পাওয়া যায় বুদ্ধ প্রচারিত মতবাদে। তাই বলা যায়, বুদ্ধের শিক্ষা ব্যক্তি থেকে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের সর্বত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম। সমাজে তখনই সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে যখন শাসক সৎ ও সকল ধরনের অনৈতিক ও পাপ কর্ম থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারবেন। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকলের মঙ্গল চিন্তা করে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে যোগ্য ব্যক্তির অভাবে সমাজের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ব্যহত হচ্ছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বুদ্ধ নির্দেশিত পঞ্চশীল, অষ্টবিধ মার্গ ছাড়াও সপ্ত অপরিহানীয় নীতিও[৭৭] বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার যে উপদানগুলো ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্মের সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত সেগুলো নিম্নে প্রদান করা হলো :

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্য ৮ : শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

লক্ষ্য ৯ : শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো

লক্ষ্য ১১ : টেকসই নগর ও জনপদ

লক্ষ্য ১২ : পরিমিত ভোগ ও উৎপাদন

লক্ষ্য ১৬ : শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান

লক্ষ্য ১৭ : অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব

৮. উপসংহার

বুদ্ধ চিরকালের আদর্শ ও মহান ব্যক্তিত্ব। আলোকোদ্ভাসিত বুদ্ধ জীবনদর্শনের আলোকিত স্পর্শে ভারতীয় সভ্যতাকে আলোকিত করে প্রকাশিত করে। যার আলোকচ্ছটায় বিশ্বসভ্যতা আলোকিত হয়েছে ব্যাপক ভাবে। মোটকথা মানবসভ্যতার ওপর বুদ্ধের প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। বুদ্ধ একজন মহান ধর্মপ্রবক্তার পাশাপাশি একজন আদর্শ জীবনশৈলিরও প্রণেতা। যুগে যুগে দেশে দেশে মানুষ বুদ্ধের প্রতি এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণবোধ করেছেন। কেননা তিনি সর্বদা প্রেম ও অহিংসা, মৈত্রী ও করুণার মানবতাবাদী ও যুক্তিবাদীর সহজ সরল পথেই বিশ্বের মানুষকে পরিচালিত হওয়ার পথ নির্দেশ করে গেছেন। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে মানুষ ভোগবাদে জড়িয়ে পড়ছে সৃষ্টি হচ্ছে নানা সমস্যা আর নীতি বর্জিত হচ্ছে মানুষ। এ থেকে মুক্তি পেতে বুদ্ধের ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্ম অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি। বর্তমান বিশ্বে যেখানে উন্নয়নের নামে অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রকৃতি, মানবতা বিপন্ন হচ্ছে, সেখানে বুদ্ধের ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্ম একটি বিকল্প পথ প্রদর্শন করে আশার আলো দেখায়। তাঁর শিক্ষা-দর্শন টেকসই উন্নয়ন, নৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়নসহ আত্মিক সমৃদ্ধির সমন্বয় ঘটিয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সুশৃঙ্খল সমাজ বিনির্মাণে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। বিশ্বায়নের এই যুগে মানবমুক্তির জন্য বুদ্ধের নির্দেশিত বার্তা কেবল প্রাসঙ্গিকই নয়, অত্যন্ত জরুরি ও অত্যাবশ্যক কারণ এটি অস্ত্রে পরিবর্তে ভালোবাসতে শেখায় শোষণের পরিবর্তে সহমর্মিতা শেখায় এবং ভোগ এর পরিবর্তে মধ্যমপন্থার সংযম করা শেখায়। যার মাধ্যমে একটি সুষ্ঠ, সুন্দর, আদর্শ, পরিকল্পিত, সকল প্রাণীর বসবাসযোগ্য স্থিতিশীল বিশ্ব গড়ে তোলা যায়। অর্থাৎ, বদ্ধের শিক্ষা-দর্শনের যথার্থ প্রায়োগিক ব্যবহার বিশ্বে টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ ও টীকা

১. নানারকম সমস্যাগুলো হলো : কৃত্রিমভাবে মানবশিশুর জন্ম, অঙ্গ-প্রতঙ্গ প্রতিস্থাপন, পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ, শান্তি স্থাপনে সংলাপ, অহিংস মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ, মানবিক অধিকার, নৈতিক মূল্যবোধ, কল্যাণকর অর্থচিন্তা, জাতীয় সদ্ভাব-সম্প্রীতি রক্ষায় ঐক্য ও সংহতি স্থাপনসহ বহু বিষয়।

২. ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক, *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, সপ্তদশ পুনর্মুদ্রণ (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১৪), পৃ. ৮০৪

৩. Dipak Kumar Barua, *Studies in the Gospel of Buddha for Modern Perfectives*, First Edition, *Center for Buddhist Studies* (Varnasi : Banaras Hindu University, 2005), p. 1-2

৪. Ankur Barua, Basilio, M.A. *Applied Buddhism in Modern Science*: Episode 1. (Hong Kong: Buddhist Door, Tung Lin Kok Yuen & Unibook Publicans, 2009)

৫. On contemporary Buddhist social applications, Michael Jerryson, edited., The Oxford Handbook of Contemporary Buddhism (New York: Oxford University Press, 2017), p. 487-564

৬. Ibid, p. 487-564

৭. http//wwwmindfulnesbell.org.

৮. http://www.raijmr.com/ijrhs/wp-content/uploads/2017/11/IJRHS_2017_vol05_issue_05_04.pdf

৯. প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত, *মহাবর্গ*, (তাইওয়ান: সন অনুল্লেখিত, করপর‍্যাট বডি অব দি বুদ্ধ এডুকেশনাল ফাউন্ডেশন) পৃ. ৮

১০. অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া অনূদিত, *অঙ্গুত্তর নিকায়*, চতুর্থ খণ্ড (রাঙ্গামাটি : বনভান্তে প্রকাশনী, ২০০৫), পৃ, ২৭৩

১১. শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ, *জাতক*, দ্বিতীয় মুদ্রণ (কলিকাতা : করুণা প্রকাশনী, ১৩৯১ বাংলা), পৃ. ১৭০; ভদ্দন্ত ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, ভদন্ত সুমন স্থবির, ভদন্ত বঙ্গিস ভিক্ষু ও অন্যান্য অনূদিত, *অঙ্গুত্তর নিকায়*, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় প্রকাশ (রাঙ্গামাটি : বনভান্তে প্রকাশনী, ২০১৫), পৃ. ২৭, ৪০,৮৪

১২. রণব্রত পদ সম্পাদিত, *ধম্মপদ*, দ্বিতীয় মুদ্রণ (কলিকাতা : হরফ প্রকাশনী, ১৯৮৮), পৃ. ৩৭

১৩. শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ, *জাতক*, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম সংস্কণ (কলিকাতা : করুণা প্রকাশনী, ১৩৯১), পৃ. ৬৩-৬৪

১৪. শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ, *জাতক*, পঞ্চম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ (কলিকাতা : করুণা প্রকাশনী, ১৩৯৮), পৃ. ২৮৮

১৫. রণব্রত পদ সম্পাদিত, *ধম্মপদ*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৩১

১৬. প্রাগুক্ত, ২১৩

১৭. রাজগুরু শ্রীমৎ ধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির অনূদিত, *মহাপরিনিব্বাণং সুত্তং* (তাইওয়ান : করপর‍্যাট বডি অব দি বুদ্ধ এডুকেশনাল ফাউন্ডেশন সন অনুল্লেখিত), পৃ. ৪-৮

১৮. অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া অনূদিত, *অঙ্গুত্তর নিকায়*, প্রথম খণ্ড (এক, দুক, তিক নিপাত), দ্বিতীয় সংস্করণ (রাঙ্গামাটি : বনভান্তে প্রকাশনী, ২০০৪), পৃ. ১৫০

১৯. *ধম্মপদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

২১. ভদন্ত ইন্দ্রগুপ্ত, ভিক্ষু, ভদন্ত ভিক্ষু ও অন্যান্য অনূদিত, *অঙ্গুত্তর নিকায়*, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় প্রকাশ (রাঙ্গামাটি : বনভন্তে প্রকাশনী, ২০১৫), পৃ. ১৪১

২২. শ্রী সাধনানন্দ মহাস্থাবর অনূদিত, *সুত্তনিপাত* (বান্দরবান : ২০০৭), পৃ. ১১৬

২৩. *ধম্মপদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

২৪. ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, *দীর্ঘনিকায়*, দ্বিতীয় খণ্ড (কলিকাতা : মহাবোধি সোসাইটি, ১৯৫৪), পৃ. ২৭৫

২৫. শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া, *মধ্যম নিকায়*, প্রথম খণ্ড (কলিকাতা : যোগেন্দ্র রূপসীবাংলা ত্রিপিটক বোর্ড, ১৯৪০), পৃ, ১৯৬

২৬. *ধম্মপদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩-১৪

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

২৮. *জাতক*, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

২৯. ধম্মপদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯

৩০. *সুত্তনিপাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

৩১. *অঙ্গুত্তর নিকায়*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৯০

৩২. *মহাপরিনিব্বানং সুত্তং*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৪২

অথ খো অগবা আযস্মন্তং আনন্দং আমন্তেসি; সিযা খো পনানন্দ তুম্হাকং এবমস্স, অতীতসত্থুকং পাবচনং, নত্থি নো সত্থাতি। ন খো পনেতং আনন্দ এবং দট্ঠব্বং। যো খো, আনন্দ ময়া ধম্মো চ বিনযো চ দেসিতো পঞ্ঞত্তো সো বো মমচ্চযেন সত্থাতি।

৩৩. *মহাপরিনিব্বানং সুত্তং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২

৩৪. *ধম্মপদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪

৩৫. প্রাগুক্ত, ১০৮

৩৬. বেলু রানী বড়ুয়া অনুদিত, *থেরী গাথা* (ঢাকা : বাংলাদেশ রিচার্স সেন্টার ফর বুড্ডিস্ট স্টাডিজ, ২০০৪), পৃ. ২৫

৩৭. *অঙ্গুত্তর নিকায়*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, ২৪০-২৪৩

৩৮. *ধম্মপদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

৩৯. শ্রীঈশান চন্দ্র ঘোষ অনূদিত, *জাতক*, দ্বিতীয় খণ্ড (কলিকাতা : করুণা প্রকাশনী, ১৩৯৮), পৃ. ১

৪০. পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত, *মধ্যম নিকায়*, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৯৪ বাংলা), পৃ. ২২

৪১. শ্রী বেণীমাধব বড়ুয়া, *মধ্যম নিকায়*, প্রথম খণ্ড, (কলিকাতা : যোগেন্দ্র রূপসীবাংলা ত্রিপিটক বোর্ড, ১৯৪০), পৃ, ৩৭

৪২. জ্যোতিপাল মহাস্থাবির অনূদিত, *বোধিচর্যাবতার*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪) পৃ. ৫০

৪৩. তাঁরা হলেন : অশ্বজিৎ, মহানাম, বপ্প, ভদ্রিয় এবং কৌণ্ডিন্য।

৪৪. *মহাবর্গ*, প্রাগুক্ত, পৃ-৭২

৪৫. চতুরার্য সত্য: দুঃখ, দুঃখ সমুদয়, দুঃখ নিরোধ, দুঃখ নিরোধের উপায়।

৪৬. অষ্টবিধ মার্গ: সৎ দৃষ্টি, সৎ সংকল্প, সৎ বাক্য, সৎ কর্ম, সৎ আজীব, সৎ ব্যায়াম (প্রচেষ্টা) সৎ স্মৃতি ও সৎ সমাধি।

৪৭. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বৌদ্ধধর্ম (কলিকাতা : ১৯৯৫, করুণা প্রকাশনী)*, পৃ. ২

৪৮. পঞ্চশীল : প্রাণি হত্যা না করা, চুরি না করা, কামাচার না করা, মিথ্যা না বলা, সুরা মাদক দ্রব্য সেবন না করা ।

৪৯. সৌম্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাকা : বৌদ্ধ ছাত্র সংসদের মুখপত্র, ২০০০), পৃ. ৭

৫০. স্বামী বিদ্যারণ্য, *বৌদ্ধদর্শন ও ধর্ম* (কলিকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ ১৯৮৪), পৃ-৮৩

৫১. *ধম্মপদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩

৫২. শ্রীমৎ বঙ্গীস ভিক্ষু, শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু, শ্রমিৎ প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষ্ অনূদিত, *সংযুক্ত নিকায়*, *মহাবর্গ*, (খাগড়াছড়ি : ২০১১), পৃ. ৭-৮

৫৩. *মহাবর্গ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬২

৫৫. *মহাপরিনিব্বাণং সুত্তং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪-৮

৫৬. *ধম্মপদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪-৫

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪-৫

৫৮. জ্যোতিপাল ভিক্ষু অনূদিত, *উদানং* (খাগড়াছড়ি : ২০১৩), পৃ.১৪০

৫৯. রাজগুরু ধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির অনূদিত, *দীর্ঘ নিকায়*, প্রথম খণ্ড (রাজানগর : রাঙ্গুনীয়া, ১৯৬২), পৃ. ১০৬

৬০. T.W Rhys Davids and Willium Stede, *Pali English Dictionary* (New Delhi : Oriental Books Reprint Cooperation), p. 95

৬১. সুকোমল চৌধুরী অনূদিত, *মনুস্য বিকাশে ধর্ম* (ঢাকা : ১৯৮৮), পৃ. ৪৬-৪৭

৬২. প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু অনূদিত, *অঙ্গুত্তর নিকায়*, পঞ্চম নিপাত (রাঙ্গামাটি : ২০০৮), পৃ. ২৯৭

৬৩. *অঙ্গুত্তর নিকায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮-১৩০

৬৪. *ধম্মপদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

৬৫. *ধম্মপদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

৬৬. *অঙ্গুত্তর নিকায়*, চতুর্থ খণ্ড, প্রাগুপ্ত, পৃ. ২৭৫,

৬৭. ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, *দীর্ঘ নিকায়*, তৃতীয় খণ্ড (রাঙ্গামাটি : ২০০৭), পৃ. ২০২

৬৮. শ্রী ধর্ম্মজ্যোতি স্থবির, *খুদ্দকপাঠো* (কলিকাতা : ১৯৫৫), পৃ. ১৯

৬৯. *ধর্মপদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১-২১২; *সুত্তনিপাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০, ৩৪

৭০. *দীর্ঘনিকায়*, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৭০-৮৬

৭১. *মধ্যম নিকায়*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

৭২. *থেরী গাথা*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ২৫

৭৩. বিনয়াচার্য ভদন্ত সত্যপ্রিয় মহাথের, *চূল্লবর্গ* (রাঙ্গামটি : বনভান্তে প্রকাশনী, ২০০৩), পৃ. ৩৭৮-৩৮১

৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮০-৩৮৩

৭৫. *চূল্লবর্গ*, *প্রাগুক্ত* পৃ. ৩৭৯-৩৮০

৭৬. *মহাবর্গ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯-১৮০

৭৭. *মহাপরিনিব্বাণং সুত্তং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমাজ বিনির্মাণে বুদ্ধের শিক্ষা-দর্শন : প্রায়োগিক ব্যবহারের স্বরূপ অন্বেষণ

ভূমিকা

মহাকালের মহিমান্বিত ইতিহাসে যাঁরা জ্ঞানের দীপ্তিময় পথ দেখিয়ে সমগ্র মানবজাতিকে আলোকিত করেছেন, তাঁদের মধ্যে চিরভাস্বর এক নাম মহামতি গৌতম বুদ্ধ যিনি অমৃতসত্যের পথিকৃৎ হয়ে মানবতাকে দিয়েছেন শান্তি, প্রজ্ঞা ও মুক্তির অমোঘ দিশা। জীবনের গহীন অন্ধকারে যিনি জ্বেলেছেন প্রজ্ঞার দীপশিখা, বিশ্বমানবতাকে দিয়েছেন শান্তি ও মুক্তির মহামন্ত্র কালের মহাসাগরে তিনি চিরঅম্লান। বলা বাহুল্য, মহাকালের পাতায় তিনি আজও চিরস্মরণীয় এবং বরণীয় হয়ে আছেন তন্মধ্যে মহামতি গৌতম বুদ্ধ অন্যতম। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে মানুষ ভোগবাদে জড়িয়ে পড়ছে ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হচ্ছে নানাসমস্যা আর নীতি বর্জিত হচ্ছে মানুষ। এ থেকে মুক্তি পেতে বুদ্ধের আদর্শ সকলের মাঝে তুলে ধরে ন্যায়ের বিপ্লব তৈরি করা সম্ভব। বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণীসমূহ সর্বজনীন ও মানবতার বাণী। একবিংশ শতকে এসেও প্রতিনিয়তই যেন বুদ্ধবাণীর প্রয়োজনীয়তা দিনদিন বেড়ে চলেছে বর্তমান বিশ্বের ক্ষয়িষ্ণু মানবীয় মূল্যবোধ সুপ্রতিষ্ঠার জন্য।

সমাজগঠনে বুদ্ধের শিক্ষা-দর্শনের প্রায়োগিক দিক

বুদ্ধের অমূল্য বাণী তথা শিক্ষায় ভিক্ষু-গৃহীদের বিনয়, আচার, ব্রত, অনুশাসন, আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক জীবনের মহামূল্যবান দিক নির্দেশনাসমূহে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় নীতি-আদর্শের বিষয় হয়ে উঠে এসেছে। এর মাধ্যমে উত্তম, আদর্শিক ও মহৎ জীবন গঠন করার ক্ষেত্রে বুদ্ধ অনুশাসনসমূহ অত্যন্ত গুরুত্ব ও তাৎপর্য বহন করে। শুধু তাই নয়, এই অনুশাসন বা উপদেশসমূহ ব্যক্তিজীবনের পাশাপাশি সমাজ ও রাষ্ট্রীয়জীবনের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করে, বিশ্বকে উন্নত-সমৃদ্ধ করে, একই সাথে সামগ্রিক মানবকল্যাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বুদ্ধের শিক্ষায় বিদ্যমান পার্থিব জীবনে সুস্থ, সুন্দর, নিরাপদভাবে বসবাসের সব ধরনের বিধি-বিধান অনুশীলনের মাধ্যমে একটি সুন্দর সমাজ ও নিরাপদ বিশ্ব প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বুদ্ধের প্রায়োগিক শিক্ষাদর্শনসমূহ যে কেউ চাইলে গ্রহণ করতে পারে এতে কোনো আচার, আনুষ্ঠনিকতা বা ধরা বাধার নিয়ম নেই। বুদ্ধের শিক্ষা মনোজাগতিক ও শারীরিক সুস্থতায় বেশ ভূমিকা পালন করে। এ বিষয়ে Satyarth Prakash -এর অভিমত[১] উপস্থাপন করছি। তিনি বলেন :

> 'Applied Buddhism is deeply related with the mental and physical well-being of our life. Applied Buddhism can be applied in our life without getting engaged in any rituals or leaving any identity and actions.[১]

এখানে তিনি ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্মকে যাপিতজীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অনুশীলন করার কথা ব্যক্ত করেন।

জীবনে রয়েছে দুঃখ, দুর্দশা বহুমুখী সমস্যা তথা সংকট। সমাজের প্রতিটি মানুষকে নানাবিধ সমস্যাবলীর সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে বাঁচতে হচ্ছে। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে বসবাস করা মানুষের সহজাত প্রবণতা। বৃহত্তর সমাজের প্রথম সোপান পরিবার। পরিবারে বসবাস করতে গিয়ে জীবনের নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অনেক সময় এই পারিবারিক সমস্যা সামাজিক সমস্যায় তারপর আবার রাষ্ট্রীয় সমস্যায়ও পরিণত হয়। ট্রান ডিউক নেম বলেন :

> 'Conflict is commonplace wherever and whenever. It happens in every person, every family, or in a large area - between races or between nations; And whenever it does, it leads to suffering or even to the end of the world! So, conflict is a big problem for mankind and a solution to it is one that must be addressed.' [২]

এই সমস্যা নিরসনে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার পাশাপাশি ধর্মীয় ব্যাখ্যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে মানবগোষ্ঠী বিভিন্নভাবে জাতি, দল ও শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে ধর্ম পালন করে আসছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানবের যত সমস্যা বা সংকট আছে সেগুলো সমাধানের জন্য প্রত্যেক ধর্ম দর্শনে বিভিন্নভাবে পথ প্রদর্শিত হয়েছে দেখতে পাওয়া যায়। মানবজীবনের বিভিন্ন সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় বিষয়ক নানা মতবাদ বুদ্ধের শিক্ষা-দর্শনে উল্লেখ রয়েছে। যেগুলো খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। নানাবিধ দুঃখের সমাধানকল্পে গৌতমবুদ্ধ পরিবার পরিজন ও রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে দীর্ঘদিন গভীর সাধনায় নিয়োজিত হয়েছিলেন এবং অবশেষে তিনি দুঃখমুক্তির পথ বোধিজ্ঞান লাভ করেছিলেন। অতঃপর মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্য অর্জিত জ্ঞান পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের মাধ্যমে সারনাথে অবস্থান করে বিতরণ করেছেন। তিনি বলেছেন: "চরথ ভিকখবে চারিকং বহুজন হিতায, বহুজন সুখায, লোকানুকম্পায, অত্থায হিতায, সুখায দেব মনুস্সানং। মা একেন দ্বে অগমিত্থ। দেসেথ ভিক্খবে ধম্মং আদি কল্ল্যাণং, মজঝে কল্ল্যাণং, পরিযোসান কল্ল্যাণং, সাত্থং সব্যঞ্জনং, কেবল পরিপুন্নং পরিসুদ্ধং ব্রহ্মচরিযং পকাসেথ।"[৩] অর্থাৎ, হে ভিক্ষুগণ বহুজনের হিতের জন্য এবং বহুজনের সুখের জন্য তোমরা দিকে দিকে বেড়িয়ে পড়। জগতের প্রতি অনুকম্পা পরবশ হয়ে দেব মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য তোমরা বিচরণ কর। কিন্তু দু'জন এক পথে যেও না। তোমরা পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রদর্শন করে অর্থযুক্ত ও ব্যঞ্জনযুক্ত ধর্মদেশনা কর যে ধর্মের আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ এবং অন্তে কল্যাণ।

মানুষের দুঃখমুক্তির জন্য বিভিন্ন জনপদে বিচরণ করে তিনি তাঁর অর্জিত জ্ঞান বিতরণ করেছিলেন। এ সাধনা দ্বারা তিনি জীবনের সমস্যার মূলকে অনুসন্ধান করতে পেরেছিলেন। মানুষের বাস্তব জীবনকে সুপরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করার যে বিধান তিনি দিয়ে গেছেন তা হচ্ছে বৌদ্ধ জীবনদর্শন। আর এটিই হচ্ছে প্রায়োগিক

বৌদ্ধধর্মের রূপরেখা। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জীবনে বুদ্ধের শিক্ষা দর্শনের প্রায়োগিক দিকসমূহ করতে পারেন। যে কেউ তাঁর বাণীগুলো অনুশীলন করতে পারে এ বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে :

> 'Applied Buddhism' explains how every person can related Buddhist ideas into his or her daily life and in profession. The main focus of this new concept is to diffuse the teachings of the Buddha is every nook and corner of the society, so that all sentient beings, irrespective of their religion, culture and creed can benefit from it'.[৪]

বুদ্ধের এ বাণীর মধ্যেই মানবতার স্পর্শ রয়েছে। রয়েছে সমাজ বিনির্মাণে দিক নির্দেশনাবলি উপদেশ। অপ্রমেয় বাণী শুধু মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ধারা প্রবর্তন করেনি, অহিংসা ও শান্তির মহাবাণী প্রচার করে তিনি মানবসমাজকে দিয়েছেন সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মনুষ্যত্ব বিকাশের উপকরণ। এ প্রসঙ্গে Walpola Rahula বলেন :

> 'Human beings in fear of the situation they have themselves created, want to find a way out, and seek some kind of solution. But there is none except that held out by the Buddha—his message of non-violence and peace, of love and compassion, of tolerance and understanding, of truth and wisdom, of respect and regard for all life, of freedom from selfishness, hatred and violence'.[৫]

তথ্য নিদের্শিকা ও টীকা

১. Satyarth Prakash, *Application of Applied and Engaged Buddhism in Existing Society*, International Journal of Research in Humanities & Soc. Sciences, Vol. 5, Issue: 5, (May : 2017) ISSN:(P) 2347-5404 ISSN:(O)2320 771X, P. 25.

২. Tran Duc Nam, *The View of the Buddhist about the Cause of Violence*, Conflict, *War and Method of Remedy*, Mindful Leadership for a Sustainable Peace, Editors: Most Ven. Thich Nhat Tu, Most Ven. Thich Duc Thien, Mindful Leadership for a Sustainable Peace, (Viernam: Hong Duc Publishing House, 2019), p. 477.

৩. প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত, *মহাবর্গ*, যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ত্রিপিটক ট্রাষ্ট বোর্ড (রাঙ্গামাটি : ২০১৩), পৃ. ২১

৪. *Application of Applied and Engaged Buddhism in Existing Society*, ibid, p. 25.

৫. Walpola Rahula, *What the Buddha Taught*, printed by thr Gordon Fraser Gallery, Second and enlarged edition, (Gordon Eraser : 1978), p. 86.

দ্বিতীয় অধ্যায় : প্রথম পরিচ্ছেদ

দুর্নীতি, মাদকাসক্ত, নৈতিক অবক্ষয় এবং নিরসন

১. ভূমিকা

দুর্নীতি, মাদকাসক্ত ও নৈতিক অবক্ষয় রোধে বুদ্ধের শিক্ষা-দর্শন বেশ প্রাসঙ্গিক। বুদ্ধ নৈতিক, মানসিক ও সামাজিক পরিবর্তনের উপর জোর দেয়। বুদ্ধের শিক্ষায় পুত-পবিত্রতার সাথে নৈতিকভাবে জীবনযাপনের পাশাপাশি পরিশুদ্ধ জীবিকা, মানসিক শান্তি, শারীরিক সুস্থতা এবং সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্যবোধের উপর নির্দেশনা পাওয়া যায়। দুর্নীতি, মাদকাসক্ত ও নৈতিক অবক্ষয় এককটি সমাজিক ব্যাধি যার ফলে চরম অসন্তোষ, চরম অসন্তোষ থেকে অশান্তি ও অরাজকতা সৃষ্টি হয়। বুদ্ধের দেশিত বিভিন্ন সূত্রে এই বিষয়টি অত্যন্ত চমৎকারভাবে উঠে এসেছে। ন্যায়সঙ্গত, কল্যাণময় এবং মানবিক সমাজগঠনই তাঁর প্রধান লক্ষ্য।

১.১. দুর্নীতি

'দুর্নীতি' হলো সমাজের এক প্রকার ব্যাধি। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি দৃশ্যমান। মানুষ প্রতিনিয়ত তার নীতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ফলে সামাজিকভাবে এটি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে প্রভাবিত করছে। বুদ্ধের দৃষ্টিতে প্রতিটি মানুষেরই সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে যা সমাজের সকলের কল্যাণ বয়ে আনবে। সে সম্পর্কে বুদ্ধ বিভিন্ন নীতিও প্রদান করে গেছেন। '*দীর্ঘ নিকায়*' গ্রন্থের '*কূটদন্ত সূত্রে*' এ প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে। শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত অশান্ত রাজ্যে জেল-জরিমানা, শিরচ্ছেদ, চুরি, ডাকাতি, লুণ্ঠন, হত্যা নির্যাতন, বিশৃঙ্খলা, দুর্নীতি পুরোপুরি বন্ধ করা যাবে না । রাজ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় দুর্নীতি বিদূরিত করে চিরস্থায়ী শান্তি আনার উপায় হিসেবে '*কূটদন্ত সূত্রে*' তিনটি[১] বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে :

- কৃষিকাজ করতে সমর্থ কৃষকদেরকে চাষাবাদের সুবিধার জন্য বীজধান প্রদান;
- ব্যবসা করতে চায় তাদেরকে মূলধন/ঋণ দিয়ে সহযোগিতা করা,
- বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য যারা চাকুরী করতে চায় তাদেরকে উপর্যুক্ত বেতন দিয়ে চাকুরীতে নিযুক্ত করা।

তবে রাজ্যে চুরি ডাকাতি, লুণ্ঠন, হত্যা, নির্যাতন ও বিশৃঙ্খলা যেন না হয় সেই দিকে রাজা/প্রশাসককে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। সমাজের মানবশক্তি নিজেদের কর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকলে বিপথে কেউ যাবেনা। '*দীর্ঘ নিকায়*' গ্রন্থের '*চক্কবত্তিসীহনাদ*' সূত্রে দেখা যায় যে, রাজার উচিত প্রজাদিগকে ন্যায় সমতার সহিত রক্ষা করা, রাজ্যে অন্যায়ের দিকে লোকদের সম্পৃক্ত হতে না দেওয়া। যারা দরিদ্র তাদেরকে অর্থ উপার্জন করার মতো কাজে লাগিয়ে দেওয়া, রাজ্যের সৎ শ্রমণ ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে কী কর্তব্য কী অকর্তব্য বুঝে নেওয়া এবং সেই উপদেশ মোতাবেক রাজাকে নিজ কর্তব্যে সম্পৃক্ত থাকতে হবে।[২] এখানে দেখা যায় কোনো ব্যক্তি সম্পদ সৃষ্টি করতে না

পারলে সে দরিদ্র হয় এবং দারিদ্রতাই দুর্নীতি এবং চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার ইত্যাদি নানাবিধ অপরাধের অন্যতম মূলউৎস হিসেবে বিবেচিত। সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে শাসক দুর্নীতিগ্রস্থ দুর্নীতিবাজ হলে সমাজের বিভিন্ন স্তর দুর্নীতিগ্রস্থ হয়ে পড়ে। ফলে প্রকৃতি প্রভাবিত হয় যার পরিণাম মানুষকে ভোগ করতে হবে। তাই শাসককে দুর্নীতি গ্রস্থ হওয়া থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। নিচে *'অধার্মিক সূত্র'*-এর আলোকে দুর্নীতির কারণ ও প্রভাব সম্পর্কে একট চিত্র[৩] উপস্থাপন করা হলো :

ক্রমধারা	কারণ	প্রভাব
১.	প্রশাসক অধার্মিক	নিম্নস্তরের উপ-প্রশাসকও অধার্মিক
২.	উপ-প্রশাসক অধার্মিক হলে	গৃহপতিরাও অধার্মিক
৩.	গৃহপতিরা অধার্মিক হলে	নিগম-জনপদবাসী অধার্মিক
৪.	নিগম-জনপদবাসী অধার্মিক হলে	চন্দ্র-সূর্য নিজস্ব কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে না
৫.	চন্দ্র-সূর্য নিজস্ব কক্ষপথে পরিভ্রমণ না করলে	নক্ষত্র-তারকাদিও নিজস্ব কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে না
৬.	নক্ষত্র-তারকাদি নিজস্ব কক্ষপথে পরিভ্রমণ না করলে	সঠিক সময়ে দিন-রাত হয় না
৭.	সঠিক সময়ে দিন-রাত না হলে	সঠিক সময়ে পক্ষ মাস হয় না
৮.	সঠিক সময়ে পক্ষ মাস না হলে	সঠিক সময়ে ঋতু-বছর হয় না
৯.	সঠিক সময়ে ঋতু-বছর না হবার কারণে	অসময়ে-অনিয়মিতভাবে বায়ু প্রবাহিত হয় না
১০.	অসময়ে-অনিয়মিতভাবে বায়ু প্রবাহিত হলে	দেবতারা কুপিত হয়
১১.	দেবতারা কুপিত হলে	যথাসময়ে বৃষ্টি হয় না
১২.	যথাসময়ে বৃষ্টি না হলে	অল্প সময়ে শস্য পরিপক্ব হয়
১৩.	অল্প সময়ে পরিপক্ব শস্য পরিভোগ করলে	মানুষ অল্পায়ু ও বহু রোগে আক্রান্ত হয়

সারণি : ১

উপরি-উক্ত সারণীতে সমাজের দুর্নীতি কীভাবে সমাজে বিস্তার লাভ করে সে সম্পর্কে একটি ধারণা অবগত হওয়া যায়। তাছাড়াও *'দীর্ঘনিকায়'* গ্রন্থের *'চক্কবত্তিসীহনাদ'* সূত্রে বলা হয়েছে, রাজা দরিদ্রদের অর্থ প্রদান না করলে রাজ্যে দরিদ্রতা বাড়ে, দরিদ্রতা বাড়লে রাজ্যে চুরি বেড়ে যায়, চুরি সাথে সাথে লুট, দস্যুবৃত্তি অবলম্বন বাড়ে, প্রাণিহত্যা বাড়ে। চুরিতে ধরা পড়ে রাজাকে সবসময় মিথ্যা কথা বলে। এইভাবে রাজ্যে ক্রমাগত ভাবে মিথ্যা কথা বলার

প্রবণতা বাড়ে।[৪] এ থেকে দেখা যায় দরিদ্রতা থেকে অন্যায়, দুর্নীতি, অবিচার ও সকল প্রকার অনাচারসহ বহুমুখি সংকট উৎপন্ন হয়। আর সমাজে যদি ব্যক্তি নিজেদের কাজে নিষ্ঠার সাথে ব্যস্ত থাকে এবং সততার সাথে দায়িত্ব পালন করে, তাহলে অবৈধ ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড ও দুর্নীতিসহ নানাবিধ অনিয়ম অসৎ কর্মকাণ্ড ধীরে ধীরে বিদূরিত হয়ে যাবে। কর্মনিষ্ঠা ও নৈতিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা নিজেদের কাজে আত্মনিয়োগ করে এবং নৈতিক মূল্যবোধকে প্রাধান্য দেয়, তখন অসৎ উপায় লাভের চিন্তা-চেতনা মনে আসবে না। এতে সকলের স্ব-স্ব পেশাগত দায়িত্ব ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি দুর্নীতি হ্রাস পায়। একই সাথে সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে সমাজে যদি সঠিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রচার হয়, তাহলে মানুষ সৎভাবে জীবনযাপনে আত্মনিয়োগ করবে। নাগরিকদের মধ্যে দায়িত্ববোধ তৈরি হলে তারা শুধু নিজেরাই দুর্নীতিমুক্ত থাকবে না, বরং অন্যকেও উৎসাহিত করবে। শাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণে আইন দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। যখন মানুষ ন্যায্য বেতন ও সুযোগ-সুবিধা পাবে, তখন অসৎ উপায়ে বা অবৈধ ভাবে আয় করার প্রবণতা কমবে। কর্মসংস্থান ও ন্যায়সঙ্গত বণ্টন ব্যবস্থা দুর্নীতি হ্রাসে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। রাষ্ট্র যদি নাগরিকদের সুরক্ষা ও সুবিধা নিশ্চিত করে, তাহলে মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম ও সততা বাড়বে। সম্প্রীতি ও সদ্ভাব বাড়বে সৎভাবে নিজের কাজে মনোযোগ দেওয়াই সমাজ থেকে দুর্নীতি দূর করার মূল চাবিকাঠি। এটি একটি আদর্শ সমাজবিনির্মাণে জন্য অত্যন্ত অপরিহার্য। তবে এজন্য ব্যক্তিগত সচেতনতার পাশাপাশি সামষ্টিক প্রচেষ্টা, সুশাসন ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করাও জরুরি যা অনুসরণে সমাজ ও রাষ্ট্রের ঐক্য এবং ঐতিহ্য সজীব রাখবে দুর্নীতি হ্রাস পাবে সমাজে শৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।

১.২. দুর্নীতি বিদূরিকরণে বুদ্ধের নৈতিক শিক্ষার ধারণা

সমাজের নৈতিক মূল্যবোধের বড় অভাব দৃশ্যমান বর্তমানে। যার ফলে মানুষ নানারকম অপরাধ ও অনিয়মে জড়িয়ে পড়ে। হারাচ্ছে বিবেক ও মনুষ্যত্ববোধ। নৈতিকতা একটি সমাজের শক্তিস্বরূপ। কেননা, যে সব গুণ মানুষকে সত্যিকার অর্থে মহৎ করে তোলে, নৈতিকতা তাদের মধ্যে অন্যতম। নৈতিকতা মানবজীবনের অপরিহার্য অঙ্গ স্বরূপ। সুষ্ঠু সামাজিক পরিস্থিতি, সুসংগঠিত জীবন, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও সমৃদ্ধ জীবনের জন্য নৈতিক শিক্ষার পরিচর্যা অনুশীলন ও প্রয়োগের কোনো বিকল্প নেই, বরং পরিপূর্ণ জীবন নিশ্চিত করতে প্রথম ও সর্বশেষ অপরিহার্য শর্ত হলো নৈতিক শিক্ষা। নৈতিক শিক্ষা মানুষের চেতনাকে জাগ্রত ও বোধকে শাণিত করে, জ্ঞানকে করে স্বচ্ছ ও সমৃদ্ধ। সত্য ও সুন্দরের পূজারী হতে শেখায় নৈতিক শিক্ষা। ধর্মের কল্যাণধর্মী মর্মবাণী অনুসারণ করা, মিথ্যাকে কায়-মনো-বাক্যে পরিহার করা, সত্য ও ন্যায়ের আদর্শে পরিচালিত হওয়া, জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে অন্যের ক্ষতি না করা, পরহিতব্রতে যথাসম্ভব নিজেকে সমর্পণ করা। এসবের মাধ্যমেই মানুষের জীবনের নৈতিক মূল্যবোধের উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটে। বুদ্ধের ধর্ম শিক্ষার সর্বত্রই নিয়ম নীতি নৈতিকতা ও শৃঙ্খলার কথা বলা হয়েছে। নিচের নীতিগুলো সমাজগঠনে বিশেষ গুরুত্ব রাখতে পারবে বলে বিশ্বাস। যথা :

- মানবিকতা ও সহানুভূতিশীলতা প্রকাশ,

- ক্ষমাশীল ও স্বার্থপরহীন হওয়া,
- নৈতিক চিন্তাভাবনা ও চারিত্রিক গুণসম্পন্ন হওয়া,
- জনগণের হিত-সুখ-মঙ্গলার্থে আত্ম সুখ ত্যাগ,
- ন্যায়সঙ্গত সকল মত ও সংস্কৃতিকে সম্মান করা,
- সত্যবাদী ও নীতিবান, ন্যাযতা বজায় রাখা,
- প্রতারণা থেকে দূরে থাকা,
- সকলের মঙ্গলার্থে পক্ষপাতহীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ,
- অহিংসা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করা,
- মানবসেবায় ব্রতী হওয়া,
- সহিষ্ণুতা ও সহনশীলতার অনুশীলন করা এবং
- শান্তি ও ঐক্যকে সুসংহত করার লক্ষ্যে জনমতকে শ্রদ্ধা করা।

উপরি-উক্ত নীতিগুলোর প্রত্যেকটি আচরণ ব্যক্তিকে আদর্শবান ও নীতিবান করে তুলে। এগুলোর প্রভাবে সমাজে লক্ষণীয়ভাবে পরিবর্তন আসে। পরিবর্তনের এই ক্রমধারা সমাজ সংস্কারে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা সুশৃঙ্খল সমাজ বিনির্মাণে খুবই অপরিহার্য। *'ধর্মপদ'* গ্রন্থে বুদ্ধ নীতি আদর্শবানদের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন:

সীলদস্সন সম্পন্নং ধম্মট্ঠং সচ্চবেদিনং

অত্তনো কম্মকুব্বানং তং জনো কুরুতে পিযং।[৫]

অর্থাৎ, যিনি শীলবান, বহুবিষয়ে অভিজ্ঞ, ধার্মিক, সত্যবাদী, এবং নিজ দায়িত্ব-কর্তব্যে নিয়োজিত তিনি সর্বত্রে সকলের প্রিয় হন। একই সাথে আদর্শ ও শৃঙ্খলা সমাজ প্রতিষ্ঠায় বুদ্ধের উপদেশ বেশ কার্যকর। *'মজ্ঝিম নিকায়'* গ্রন্থের *'কৌসাম্বী সূত্র'-এর* নীতিসমূহ[৬] রাষ্ট্র পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই নীতিসমূহ হলো :

পরস্পরের মধ্যে মৈত্রীসূচক আচরণ করা
পরস্পরের মধ্যে মৈত্রীসূলভ বাক্যালাপ করা
সকলের প্রতি সমভাবে আন্তরিকতা পোষণ করা
সমবণ্টন নীতি অনুসরণ করা
সৎ বুদ্ধি ও পরামর্শ প্রদান করা
একে অন্যকে নির্দোষ ও গৌরবকর জীবনাচারে উদ্বুদ্ধ করা

সারণি : ২

দুর্নীতি হ্রাস করার জন্য সমাজের স্বার্থে বহু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। সকল সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে হবে তা নয় কেননা অনেক ক্ষেত্রে কাজের সুফলতার জন্য জনগণের কল্যাণে তা গোপনীয় ভাবে করা হয়। এর মূল লক্ষ্যই হলো

সমাজের শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত করা। ফলে এই নীতি গুরুত্ব অপরিসীম। *'চক্কবত্তি সিংহনাদ সূত্রে'* বুদ্ধ আদর্শ শাসকের বেশ কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য[৭] সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেছেন। এগুলো হলো :

- শাসকদের উচিত প্রজাদের ন্যায় ও সমতার সাথে রক্ষা করা,
- রাজ্যে অন্যায়ের দিকে লোকদের ধাপিত হতে না দেওয়া,
- দরিদ্রদের অর্থ উপার্জনকারী কাজে নিয়োগ করা,
- রাজ্যের জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় করণীয় কাজ বুঝে নেওয়া,
- পশুপাখিসহ রাজ্যের সকলের নিরাপত্তা ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা,
- সকল প্রকার দুর্নীতি দূর করা,
- অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব ও উন্নয়ন সাধন করা এবং
- মানব উন্নয়ন।

উপরি-উক্ত গুণাবলীগুলো শাসননীতি ধর্ম, নৈতিকতা ও সুশাসনের সমন্বয় করে। এটি শুধু সামাজিক স্থিতিশীলতাই আনে না বরং একটি সুখী, দুর্নীতিমুক্ত, ন্যায়ভিত্তিক ও সংঘাতমুক্ত সমাজ গড়ে তোলে। আজকের বিশ্বেও এই নীতিগুলো একইভাবে সুশাসন, টেকসই উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় খুবই প্রাসঙ্গিক।

১.৩. মাদকাসক্ত

সমাজে রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিষাধর সাপের মত জড়িয়ে পড়েছে জীবন বিনাশী নীল নেশা মাদকদ্রব্য। এ যেন এক তীব্র মোহ বা আকর্ষণ। হাজার হাজার তরুণ-তরুণী মাদকাসক্তির ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক নেশায় আসক্ত। দাবানলের মত তা ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে, শহরতলীতে, গ্রাম, গ্রামান্তরে। ফলে যুবসমাজ শারীরিক, মানসিক ও আর্থিকভাবে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কে তৈরি হচ্ছে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা। বুদ্ধ তাঁর গৃহী বিনয়ের পঞ্চশীলের পঞ্চমশীলে উল্লেখ করেছেন : "সুরামেরয-মজ্জ-পমাদট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামী।"[৮] অর্থাৎ, সুরা-মদ-জাতীয় (নেশাজাতীয়) দ্রব্য সেবন ও প্রমাদ হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি। এখানে মাদক জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকার ফল উল্লেখ রয়েছে। *'খুদ্দক নিকায়'* -এর সুত্ত নিপাত গ্রন্থের *'পরাভব সূত্রে'* বুদ্ধ মাদকাসক্তকে জীবনের পরাজয়ের কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন। যথা :

"ইত্থীধুত্তো সুরাধুত্তো, অক্খধুত্তো চ যো নরো,
লদ্ধং লদ্ধং বিনাসেতি, তং পরাভবতো মুখং।"[৯]

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রী ছাড়া পরস্ত্রীতে আসক্ত, নেশাদ্রব্যসেবনকারী, জুয়াখোর ও পাশাখেলায় অভ্যস্ত, সে লব্ধ সম্পত্তি হতে চ্যুত হয়, তাতে সে পরাজিত হয়।

মাদক সেবনে ব্যক্তির পরাজয়তো হবেই। পরাজয়ের পাশাপাশি ব্যক্তি সমাজে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়। অনেক সময় মাদকাসক্ত ব্যক্তি অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'মাদকাসক্তব্যক্তি নির্ধন ও

বিত্তহীন ও ঋণগ্রস্থ হয়'[১০]। আবার এই সম্পর্কে বুদ্ধ '*ধর্মপদ*' গ্রন্থের '*মলবর্গে*' মাদক সেবনের মানবের ধ্বংসের কারণ উল্লেখ করে বলেছেন:

"সুরামেরেয পানঞ্চ যো নরো অনুযুঞ্জতি,
ইধেবমেসো লোকস্মিং মূলং খনতি অত্তনো।"[১১]

অর্থাৎ, যে মদ, সুরা প্রভৃতি মাদকদ্রব্য সেবন করে সে ইহ জগতে নিজেই নিজের ধ্বংস সাধন করে।

বুদ্ধ মাদক থেকে নিজেকে দূরে থাকার পরামর্শ প্রদান করেছিলেন। তিনি '*ধম্মিক সূত্রে*' এ বিষয়ে আরও উক্ত রয়েছে:

মজ্জঞ্চ পানং ন সমাচরেয্য, ধম্মং ইমং রোচযে যো গহট্ঠো
ন পাযযে পিবতং নানুজঞ্ঞা, উম্মাদনন্তং ইতি নং বিদিত্ব।[১২]

অর্থাৎ, মাদক হতে বিরত হবে, মাদক গ্রহণে কাউকে উৎসাহিত করবে না, মাদক গ্রহণের অনুমোদন করবে না কারণ মাদকে আসক্ত ব্যক্তি উন্মাদগ্রস্থ হয়ে থাকে। এটাই ধর্মীয় নীতির শিক্ষা।

সুস্থ সুন্দর জীবন ও সমাজগঠনে বুদ্ধ বিশেষ করে পাঁচ ধরনের ব্যবসা বাণিজ্য[১৩] সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেছে তার মধ্যে একটি বাণিজ্য হলো মাদক জাতীয় ব্যবসা। দেখা যাচ্ছে যে, বুদ্ধ তৎকালীন সময়ে মাদক জাতীয় দ্রব্যের ব্যবসা নিষেধ করে গেছেন। যা কিনা বর্তমান বাজারে অহরহ কেনা বেচা হচ্ছে যার মরণ ফাঁদে জড়িয়ে যাচ্ছে যুব সমাজ। ধ্বংস হচ্ছে সমাজের দাঁড়িয়ে থাকার ভিত্তি। বুদ্ধ '*সিংগালোবাদ সূত্রে*' সম্পত্তি নাশ ছয় প্রকার কু-অভ্যাসের মধ্যে ভোগহানিকর নেশাদ্রব্য সেবন হিসেবে দেখিয়েছেন।[১৪] মাদকদ্রব্য গ্রহণের ছয়টি কুফল বর্ণিত আছে। সেগুলো হলো: ১. মাদকদ্রব্য সেবনের ফলে প্রত্যক্ষ ধন-সম্পদ নাশ হয়, ২. কলহ-বিবাদ সৃষ্টি হয়, ৩. নানারকম রোগের উৎপত্তি হয়, ৪. সর্বত্রে দুর্নাম রটে, ৫. লজ্জাহীন হয় ও ৬. হিতাহিত জ্ঞান একেবারে কমে যায়।[১৫]

১.৩.১. মাদকাসক্তি রোধে সামাজিক প্রভাব

মাদকাসক্তি রোধে সামাজিক প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি ব্যক্তির আচরণ, মনোভাব এবং জীবনযাত্রাকে সরাসরি প্রভাবিত করে। সামাজিক উদ্যোগ, সচেতনতা ও সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের মাধ্যমে মাদকাসক্তির বিস্তার রোধ করা সম্ভব। নিচে মাদকাসক্তি প্রতিরোধে সামাজিক প্রভাবের কিছু মূলদিক তুলে ধরা হলো:

১.৩.১.১. সচেতনতা বৃদ্ধি ও নৈতিকশিক্ষা

মাদকের কুফল সম্পর্কে সামাজিকভাবে সচেতনতা তৈরি করতে হবে। পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষা অনুশীলন করতে হবে। নৈতিকতা ব্যক্তিকে সকল প্রকার অকুশল কর্ম হতে বিরত রাখে। বর্তমান সময়ে শুদ্ধাচার অনুশীলনের উপর সামাজিকভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যা সকল ধরণের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মশালার মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে মাদকমুক্ত থাকতে উদ্বুদ্ধ করা। বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে মাদকবিরোধী বার্তা প্রচারে সম্পৃক্ত করা।

১.৩.১.২. পারিবারিক ভূমিকা

পরিবার হলো নৈতিক শিক্ষা লাভের প্রথম ধাপ। মাদকাসক্তি রোধে পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ব্যক্তির মূল্যবোধ তৈরীর মাধ্যমে। পরিবারে শান্তি শৃঙ্খলা বিরাজ করলে পরিবারের সদস্যদের মানসিক প্রশান্তি আসে ফলে অনৈতিক বা অনিয়ম কার্যক্রম হতে দূরে থাকে। তাই সন্তানদের সাথে ইতিবাচক বন্ধন তৈরি করা একান্ত প্রয়োজন। পরিবারের অভিভাবকদের উচিত বন্ধুসুলভ আচরণের দ্বারা পারিবারিক সমস্যা সমাধান করা। মানসিক প্রশান্তির জায়গায় আঘাত আসলে ব্যক্তি বিপথে পরিচালিত হয়।

১.৩.১.৩. সামাজিক কার্যক্রমে সম্পৃক্ততা

সামাজিক বিভিন্ন কার্যক্রমে যুবসমাজকে সম্পৃক্ত করে মেধার মূল্যায়ণ করলে তাদের প্রতিভা বিকাশ হবে। নানারকম অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে রাখবে। বাজে নেশা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবে। এ ক্ষেত্রে সুস্থ জীবনযাপনের জন্য খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক চর্চার উপর গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে।

১.৩.১.৪. সৎ সঙ্গ

সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ এই প্রবাদটি অত্যন্ত গভীর অর্থ বহন করে, বিশেষ করে মাদকাসক্তিরোধের প্রেক্ষাপটে। এটি বুঝিয়ে দেয় যে সঠিক বন্ধু কীভাবে একজন মানুষের জীবনকে উন্নত করতে পারে, আবার খারাপ সঙ্গ কীভাবে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে। খারাপ সঙ্গীর চাপে বা কৌতূহলে মাদক সেবনে জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি বাড়ে। অপকর্মে জড়িয়ে পড়ে। মাদকসেবী বন্ধুদের সাথে থাকলে চুরি, ছিনতাই বা অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। যারা ইতিবাচক চিন্তা করে এবং মাদকসেবন থেকে দূরে থাকে এমন সঙ্গী নির্বাচন করতে হবে।

১.৩.১.৫. শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তি

শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তির জন্য ধ্যান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আসক্তি, লোভ থেকে মাদকের মতো নেশায় ব্যক্তি জড়িয়ে যায়। ধ্যান-সাধনা ব্যক্তির মানসিক জগতকে বিশুদ্ধ করে লোভ, দ্বেষ, মোহ মুক্ত রাখে। মাদকাসক্তি রোধে সামাজিক সচেতনতা, পরিবারের দায়িত্ব, সমাজের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা এবং রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা একান্ত প্রয়োাজন। একটি মাদকমুক্ত সমাজগঠনে প্রতিটি ব্যক্তি, পরিবার ও প্রতিষ্ঠানের ইতিবাচক ভূমিকা অপরিহার্য।

১.৪. নৈতিক অবক্ষয়

মানুষ সমাজের বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী। বুদ্ধি বিবেচনাকে কাজে লাগিয়ে মানুষ নৈতিক গুণের প্রকাশ করে। যার সাথে প্রকাশ পায় ব্যক্তির অভ্যন্তরীন সৌন্দর্য যা ব্যক্তিকে মানবীয় মানুষে রূপান্তর করে। বিকশিত হয় মনুষ্যত্ববোধ। যখন এই সত্যটি ছাপিয়ে ব্যক্তি সততা, ন্যায়পরায়ণতা, দয়া, সম্মান এর থেকে দূরে চলে যায় তখন সমাজের নৈতিক মূল্যবোধ এর পতন হয়।

১.৪.১. ব্যভিচার

ব্যভিচার সামাজিক সমস্যা। প্রতিদিন পত্রিকার পাতায় আর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নৈতিকতা বিবর্জিত এই সংবাদ যেন সমাজের আর চার পাঁচটা খবরের মতো নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে যা কলুষিত করছে পুরো সমাজব্যবস্থা। সৃষ্টি হচ্ছে সামাজিক অবক্ষয়। মানুষকে ধ্বংসের মুখে পতিত করছে। এই অবক্ষয়ের স্রোতে বাদ পড়ছেনা অবুঝ শিশুটিও। মনুষ্যত্ব নৈতিক মূল্যবোধ মানব বিবেকবোধ যেন শূণ্যের কোঠায় নিয়ে যাচ্ছে যার প্রভাব পড়ছে পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে। বুদ্ধ খ্রিষ্ট পূ. ষষ্ট শতকে এই সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করে গেছেন। বুদ্ধ পঞ্চশীলের তৃতীয় শীলে বলেছেন: "কামেসু মিচ্ছাচারা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।"[১৬] অর্থাৎ, অবৈধ কামাচার বা ব্যভিচার হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি। এখানে সবধরণের অবৈধ মিথ্যা কামাচার থেকে বিরত থাকাকে বোঝানো হয়েছে।

বুদ্ধ *'বিনয় পিটক'* গ্রন্থের পারাজিকায় বলেছেন, যো পন ভিক্ষু ভিক্ষুনং সিক্খাসাজীব সমাপন্নো, সিক্খং অপচ্চক্খায দুব্বল্যং অনাবিকত্বা মেথুনং ধম্মং পতিসেবেয্য অন্তমসো তিরচ্ছানগতাযপি, পারাজিকো হোতি অসংবাসো।[১৭] অর্থাৎ, যদি কোন ভিক্ষু শিক্ষাপদ সমূহে স্থিত থেকে শীল পালনে তার দুর্বলতা প্রকাশ না করে মনুষ্য-অমনুষ্য বা তির্যক জাতের সঙ্গে অবৈধ বা ব্যভিচারে লিপ্ত হয় সেই ভিক্ষুর পারাজিকা আপত্তি হয়। এটি ভিক্ষুদের অপরাধ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর তথা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। এর কোন প্রায়শ্চিত হয় না। উক্ত অপরাধীকে সংঘ থেকে বহিঃষ্কার করা হয়। এ বিষয় সম্পর্কে বুদ্ধ ভিক্ষু সংঘকে উপলক্ষ্য করে বললেও তার প্রকাশ সর্বজনে। সমাজ জীবনেও এই অপরাধীরা সমাজের নিকট ঘৃনীত নিকৃষ্ট। ধন-সম্পদ নষ্ট হলে তা পাওয়া যায় কিন্তু মানব চরিত্র একবার কলঙ্কিত হলে তা আর মুছে ফেলা যায় না। বুদ্ধ দুই প্রকার কাম-এর[১৮] কথা বলেন। তা হলো :

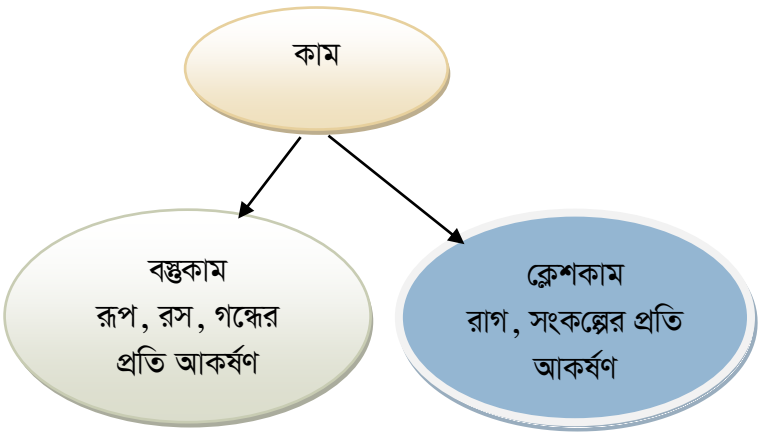

চিত্র : ১, কাম-এর রূপ

এখানে বস্তুকামে রূপ, রস, গন্ধের প্রতি আকর্ষিত এবং ক্লেশকামে রস ও সংকল্পের প্রতি আকর্ষিত হতে দেখা যায়।

বুদ্ধের শিক্ষায় ব্যক্তিজীবনকে এবং সমাজজীবনকে সুন্দর, নিষ্কলুষ ও পবিত্র রাখার জন্য অত্যাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। *'মধ্যম নিকায়'* গ্রন্থের *'সত্যবিভঙ্গ সূত্রে'* বুদ্ধ কামকে দুঃখদায়ক বস্তু হিসেবে তুলে ধরেছেন।[১৯] তাইতো মানবজীবনের পরাজয়ের কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে *'পরাভব সূত্রে'* বুদ্ধ বলেছেন :

"সেহি দারেহি সন্তুট্ঠো, বেসিযাসু পদিস্সতি,

দুস্সতি পরদারেসু, তং পরাভবতো মুখং।"[২০]

অর্থাৎ, যে পুরুষ নিজের স্ত্রীতে অসন্তুষ্ট হয়ে গণিকা স্ত্রীলোকের সাথে জড়িত হয়, পরস্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করে, তা হলে তার পরাজয় হয়।

ব্যক্তি মাত্রই ইহজগতে নিজেই নিজের ধ্বংস করেন। এই সম্পর্কে বুদ্ধ ধ্বংসের কারণ উল্লেখ করে বলেন এভাবে:

"যো পানোমতিপাতেতি মুসাবাদঞ্চ ভাসতি,

লোকে অদিন্নং আদিয়তি পরদারঞ্চ গচ্ছতি।"[২১]

অর্থাৎ, যে প্রাণিহত্যা করে, পরের দ্রব্য অপহরণ করে, পরদার গমন করে, মিথ্যা কথা বলে।

আবার *'ধর্মপদ'* গ্রন্থের *'নিরয় বর্গে'* বলা হয়েছে :

"চত্তারি ঠানানি নরো পমত্তো আপজ্জতি পরদারূপসেবী,

অপুঞ্ঞঞ লাভং ন নিকাম সেয্য নিন্দং ততিযং নিরযং চতুত্থং।"[২২]

অর্থাৎ, পরদার গমনকারী ব্যক্তির প্রথমত অমঙ্গল, দ্বিতীয়ত অনিদ্রা, তৃতীয়ত অনিদ্রা এবং চতুর্থত নরক গমন হয়। সকলের ব্যভিচারের মত জঘন্যতম কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত এ ক্ষেত্রে বুদ্ধের উপদেশ অতুলনীয়।

সমাজে অবক্ষয়ে ব্যভিচার বা দুশ্চরিত্র আচরণের ভূমিকা গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারে। এটি শুধু ব্যক্তিগত স্তরে নয়, বরং সামাজিক কাঠামো এবং সম্পর্কগুলোর উপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বৌদ্ধধর্মে যেমন বলা হয়, ব্যভিচার মানবিক সম্পর্কের মধ্যে অবিশ্বাস এবং অবমাননা সৃষ্টি করে, তেমনি এটি সমাজে আরও বড় অবক্ষয়ের সূচনা করতে পারে।

১.৪.১.১ নৈতিক অবক্ষয় রোধে সামাজিক প্রভাব

নৈতিক অবক্ষয় রোধে সামাজিক প্রভাব বেশ কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। বহুমুখি সামাজিক উদ্যোগ নৈতিক অবক্ষয়রোধে প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড গ্রহণ করে সবাইকে সচেতন করে তুলতে পারে। এবিষয়ে কিছু সুপারিশ নিম্নরূপ:

বিশ্বাস এর সাথে সম্পর্কের দৃঢ় বন্ধন

ব্যভিচার তথা অনৈতিক সম্পর্ক মুক্ত হলে মানুষের মধ্যেকার বিশ্বাস দৃঢ় হয়। বিশ্বাস ব্যক্তি সম্পর্ক তৈরীর সেতু হিসেবে কাজ করবে যা পারিবারিক সম্পর্ক, বন্ধুত্বেও সম্পর্ক, সামাজিক সম্পর্ক তথা সমাজের সকল সম্পর্কেও ভিত্তি অঁল হয়ে উঠবে। ফলে মানুষের মধ্যে একে অপরের প্রতি সন্দেহ এবং অসন্তুষ্টি থাকবেনা, যা সামাজিক শান্তি, শৃঙ্খলা তৈরিতে ভূমিকা পালন করবে। ফলশ্রুতিতে সমাজ অবক্ষয়ের হাত থেকে মুক্ত হবে। টেশসই সমাজ বিনির্মাণে এর গুরুত্ব অপরিসীম যা বুদ্ধের শিক্ষা দর্শন থেকে গ্রহণ করে আদর্শ সমাজের রূপ প্রতিষ্ঠায় প্রয়োগ করা যেতে পারে।

মানসিক প্রশান্তি

ব্যভিচারের কুফল অবগত হয়ে তা থেকে শিক্ষা গস্থহণ করলে মানুষের মধ্যে মানসিক শান্তি আসবে সাথে অভ্যন্তরীণ দ্বন্ধ বিদূরিত হয়। যখন কেউ অন্যকে প্রতারণা কওে বা খারাপ আচরণ করে, সে নিজেও কখনও শান্তি পায় না। তাই ব্যক্তি সমাজের শৃঙ্খলা ও নৈতিকতার জন্য এই বিষয়ে সমাজে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে যা সমাজের সার্বিক উন্নতি এবং সুস্থ পরিবেশের জন্য প্রয়োজন।

সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির উন্নতি

ব্যভিচার যেন সমাজের একটি সাধারণ প্রবৃত্তি না হয়ে ওঠে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। সমাজকে নৈতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করতে হবে। সমাজের সদস্যদের সৎদৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে। এমন আচরণকে গ্রহণযোগ্য বা সাধারণ হিসেবে দেখতে হবে যা সমাজের মূল মূল্যবোধ ও আদর্শেও সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এতে সমাজের নিয়ম-নীতি, ঐতিহ্য এবং নৈতিক স্তরের উন্নতি ঘটে।

পারিবারিক কাঠামোর মজবুত

পরিবারে ব্যক্তির আচরণ, ব্যবহার এর উপর ভিত্তি করে পারিবারিক কাঠামো মজবুত হয়। পারিবারিক বন্ধন এমন ভাবে দৃঢ় রাখতে হবে যেন একে অপরের প্রতি সহানুভূতি, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, সমর্থন সর্বদা বিরাজ করে। পারিবারিক সম্পর্কেও অবনতি সমাজের অন্যান্য অংশের সম্পর্কেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ঠিক তেমনি পারিবারিক সম্পর্কেও উন্নতির মাধ্যমে ইতিবাচক দিক সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। পারিবারিক শৃঙ্খলা দৃঢ় থাকলে, এটি সমাজের ভবিষ্যত প্রজন্মকে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি দিতে সমর্থ হয়, যার প্রভাব দীর্ঘমেয়াদী হয়ে থাকে।

শৃঙ্খলা ও আইন প্রতিষ্ঠা

সমাজে নিয়ম কানুন সর্বদা মেনে চললে, শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলে আইন এবং শৃঙ্খলা বজায় থাকবে। যা সমাজের অভ্যন্তরীণ শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে ভূমিকা পালন করে।

সারণি : ৩

সবশেষে বলা যায় সমাজে নৈতিকতা এবং মানবিক সম্পর্কের উন্নতির জন্য, ন্যায়বিচার, সদ্ভাব এবং ধর্মীয় শিক্ষা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বুদ্ধের শিক্ষাগুলোর মধ্যে শুদ্ধ আচার-ব্যবহার এবং সৎ পথ অনুসরণ করা সমাজে শান্তি এবং স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। ব্যভিচার শুধুমাত্র ব্যক্তি জীবনে নয়, সমগ্র সমাজের জন্য একটি বড় সমস্যা হিসেবে প্রতীয়মান হয়, যার ফলস্বরূপ আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক অবক্ষয় ঘটে। ব্যক্তির মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। যেটি নিজেদের মধ্যে বিশ্বাসের ভিতকে নড়বড়ে করে দেয়।

শান্তি, সম্প্রীতি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠায় নিচের উক্তিটি[২৩] বেশ প্রনিধানযোগ্য:

> 'Buddhism approaches the problem from a different perspective and analyses the potential dangers inherent in those 'crimes'. Discussing their social implications in detail, Buddhism shows their contribution to an individual's downfall. The Buddhist stand is therefore to prevent people from committing these crimes by educating them before they become hardened criminals.

তথ্য নির্দেশিকা ও টীকা

১. রাজগুরু শ্রীমৎ ধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির অনূদিত, *দীর্ঘ নিকায়*, প্রথম খণ্ড (কলিকাতা : ১৯৬২), পৃ.৯৯-১১৬

২. ভিক্ষু শীলভদ্র প্রণীত, *দীর্ঘ নিকায়*, তৃতীয় খণ্ড (রাঙ্গামাটি : ২০০৭), পৃ. ৫১-৬৯

৩. ভদন্ত ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, ভদন্ত সুমন স্থবির, ভদন্ত বঙ্গিস ভিক্ষু, ভদন্ত অজিত ভিক্ষু, ভদন্ত সীবক ভিক্ষু অনূদিত, *অঙ্গুত্তর নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড চতুর্থ নিপাত*, তৃতীয় প্রকাশ (রাঙ্গামাটি : ২০১৫) পৃ. ৭৪-৭৫

৪. *দীর্ঘ নিকায়*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৫১-৬৯

৫. গিরিশচন্দ্র বড়ুয়া অনূদিত, *ধম্মপদ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী ১৯৭৭), পৃ. ১৩০

৬. শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া অনূদিত, *মধ্যম নিকায়*, ১ম খণ্ড (কলিকাতা : যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ত্রিপিটক বোর্ড, ১৯৪০), পৃ. ৩৪৪

৭. ভিক্ষু শীলভদ্র প্রণীত, *দীর্ঘ নিকায়*, তৃতীয় খণ্ড, তৃতীয় প্রকাশ (রাঙ্গামাটি : সদ্ধর্মপ্রাণ দায়ক-দায়িকা, ২০০৭) পৃ. ৪১-৪৪

৮. ভদন্ত প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু, *সূত্র পিটকে অঙ্গুত্তর নিকায় পঞ্চম নিপাত*, (রাঙামাটি : রাজবন বিহার ২০০৮), পৃ. ২০১

৯. সাধনানন্দ মহাস্থবীর, *সুত্ত নিপাত* (রাঙামাটি : ১৯৮৭) পৃ. ২৭

১০. ভিক্ষু শীলভদ্র, *দীর্ঘ নিকায়*, তৃতীয় খণ্ড (কলিকাতা : মহাবোধি সোসাইটি, ১৩৬১), পৃ. ১৬২

১১. *ধম্মপদ*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৪১

১২. *সুত্ত নিপাত*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১০২

১৩. *অঙ্গুত্তর নিকায়, পঞ্চম নিপাত*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৯৭

১৪. *দীর্ঘ নিকায়*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৬০

১৫. প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৬০

১৬. *অঙ্গুত্তর নিকায়, পঞ্চম নিপাত*, প্রাগুপ্ত পৃ. ২০১

১৭. ভদন্ত বুদ্ধবংশ ভিক্ষু অনূদিত, *পারাজিকা*, প্রথম প্রকাশ, (চট্টগ্রাম : প্রজ্ঞাবংশ সদ্ধর্মগ্রন্থ প্রকাশনী, ২০০৭), পৃ, ২৬

১৮. ভদন্ত ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, ভদন্ত বঙ্গিস ভিক্ষু, ভদন্ত অজিত ভিক্ষু, ভদন্ত সীবক ভিক্ষু অনূদিত, *মহানির্দেশ*, প্রথম প্রকাশ (বাংলাদেশ : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, ২০১৪), পৃ. ২৯

১৯. ডক্টর বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী অনূদিত, *মজ্ঝিম নিকায়*, তৃতীয় খণ্ড (কলিকাতা : ধর্মধার বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশনী, ১৯৯৩), পৃ. ১৪১

২০. *সুত্ত নিপাত*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ২৭

২১. *ধম্মপদ*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৪১

২২. প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৬৬

২৩. Ven. Pategarna Gnanarama, *An Approach to Buddhist Social Philosophy*, First published (Singapore : Ti-Sarana Buddhist Association, 1996), P.70

দ্বিতীয় অধ্যায় : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সমতা নিশ্চিতকরণ

১. ভূমিকা

বুদ্ধের শিক্ষায় সমতা অন্যতম একটি মূলনীতি। তাঁর দৃষ্টিতে সকলেই সমান। বুদ্ধের শিক্ষা সাম্য, মৈত্রী ও ন্যায় ভিত্তিক সমাজগঠনের উপর গুরুত্ব দেয়। তিনি ধর্মবর্ণগোত্র, লিঙ্গ, জাতি, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের মৌলিক অধিকার ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর দর্শনে 'সব্বে সত্তা সুখীতা ভবন্তু'[১] অর্থাৎ, সকল প্রাণী সুখী হোক এই চিরন্তন নীতি বাক্যের উল্লেখ রয়েছে। মহান বাণীটি বুদ্ধের সমতাভিত্তিক দর্শনের মূলমন্ত্র। সমতা শুধু আইন বা নিয়মে নয়, বরং মানসিকতা ও আচরণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। নিম্নে বুদ্ধের শিক্ষায় সমতার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করা হলো।

১.১. সমতা বিধান ও সমাজজীবনে-এর প্রভাব

বুদ্ধ জাতি, বর্ণ, গোত্র, সম্প্রদায়ের উর্দ্ধে গিয়ে সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখেছেন। তিনি সকল প্রকার বর্ণপ্রথার বিরোধিতা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে *'অম্বট্ঠ সুত্তে'* উল্লেখ রয়েছে, 'জাতি বা গোত্রে নয়, কর্মেই মানুষ শ্রেষ্ঠ'[২] বুদ্ধ বলেন জন্মের মাধ্যমে কেউ মহান বা শ্রেষ্ঠ হয় না। কর্মের দ্বারা মহান বা শ্রেষ্ঠ হয়।[৩] বুদ্ধ সবাইকে এক এবং অভিন্নভাবে দেখেছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি সেই সময় প্রচলিত বর্ণব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করতে গিয়ে Ven. Pategarna Gnanarama বলেন:

> 'Buddhism, totally rejecting the theory of social stratification based on caste, speaks of the unity, the oneness of humankind. While numerous arguments have been adduced to disprove the conceptual basis of caste propounded by Brahmins, an example has been set by the Buddha himself by opening up the doors of monkhood to all, despite the caste or ethnic differences of the persons concerned'[৪].

বুদ্ধ ন্যায়পরায়ণতার প্রতীক ও সমতাবাদী ছিলেন। তাঁর প্রদর্শিত এই গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ সকলের নিকট গ্রহণীয় হয়ে উঠে। যা 'বোধিসূত্রে' উল্লেখ রয়েছে এখানে বলা হয়েছে :

> 'গঙ্গা যমুনা অচিরবতী সরভূ মহী, তা মহাসমুদ্দং পত্বা জহন্তি পুরিমানি নামগোত্তানি; 'মহাসমুদ্দোত্বেবসঙ্ঘং গচ্ছন্তি। যা কচি মহানদিযো সেয্যথিদং-গঙ্গা যমুনা অচিরবতী সরভূ মহী তা মহাসমুদ্দং পত্বা জহন্তি পুরিমানি নামগোত্তানি, মহাসমুদ্দোত্বেব সঙ্ঘং গচ্ছন্তি'।[৫]

অর্থাৎ, 'হে ভিক্ষুগণ! গঙ্গা, যমুনা, অচিরাবতী, সরভূ, মহী, আদি মহানদী মহাসমুদ্রে এসে নিজেদের পূর্বের নাম গোত্র পরিত্যাগ করে মহাসমুদ্রে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, এবং শূদ্র এ চারি গোত্রীয় লোক বুদ্ধের শাসনে এসে পূর্বের নাম, গোত্র এবং বংশ ত্যাগ করে শাক্যপুত্র নামে পরিচিতি লাভ করে।

এখানে নীতি পরিপালনের ক্ষেত্রে তিনি জাতি-গোত্র দেখেননি। সকলকে সম মর্যদা দিয়েছেন। বুদ্ধ দেখিয়েছেন চার বর্ণই সমান শুদ্ধ পবিত্র অর্থাৎ, জন্মের কারণ দেখিয়ে কারও শ্রেষ্ঠত্ব-হীনত্ব বিচার করা যুক্তহীন ভিত্তিহীন বিষয়। তিনি শূদ্র, নারী ও সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণিকেও সংঘে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে ছিলেন। বুদ্ধের সংঘে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকলে সমান মর্যাদা যেমন পেতেন তেমন সকল প্রকার অধিকারও পেতেন।। ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নিম্ন বংশ সবাইকে সমদৃষ্টিতে দেখা। *'শুদ্ধিক সূত্রে'* বর্ণিত আছে, 'আরদ্ধবীর্য নিত্যপরাক্রমশালী ব্যক্তি ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল আর পুষ্প নিক্ষেপক ঝাড়ুদার হোক সেব্যক্তিই পরম বিশুদ্ধিতা লাভ করতে পারে।'[৬] বুদ্ধের শিক্ষায় সকল শ্রেণী, পেশা, বর্ণ ও জাতির মানুষের সমতার কথা লক্ষ্য করা যায়। তিনি সর্বদা সকল প্রকার বর্ণপ্রথা ও বর্ণবৈষম্যের বিপরীতে অবস্থান করেছেন। বুদ্ধ মানবসমাজে সমতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সকল প্রকার বর্ণ-বৈষম্য ও জাতিভেদ প্রথার বিরূদ্ধে গিয়ে সবাইকে সমানভাবে গুরুত্ব দিয়ে মুক্তির উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। তিনি তাঁর প্রবর্তিত সংঘে সকলকে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করেছিলেন। শুধু তাই নয় সংঘে জাতিভেদ না থাকার জন্য তিনি প্রথমে ক্ষৌরকার অর্থাৎ, নাপিতের ছেলে উপালিকে দীক্ষা দান করেন।[৭] সুনীত ছিল অত্যন্ত নিচুঁ ও দরিদ্র ঘরের একজন সন্তান। প্রত্যেহ রাস্তা-ঘাট ঝাড়ু দেওয়া এবং ময়লা-আবর্জনা পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন করাই হলো তার প্রধান এবং অন্যতম কাজ। একসময় বুদ্ধের সাথে সুনীতের সাক্ষাৎ হয়। পরবর্তী সময়ে বুদ্ধের শাসনে সুনীত দীক্ষা গ্রহণ করে ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যে তিনি অর্হৎ ফল লাভ করেন। সুনীত-এর অধ্যাত্ম সাধনায় সিদ্ধিলাভের বিষয় উল্লেখ করতে গিয়ে বুদ্ধ বলেন:

তপেন ব্রহ্মচরিযেন সংযমেন দমেন চ
এতেন ব্রাহ্মণো হোতি এতং ব্রাহ্মণমুত্তমন্তি।[৮]

অর্থাৎ, ইন্দিয় সংযমে, শীল পরিপালনে, শীলরক্ষণে, প্রজ্ঞা সাধনে ও বিবিধ শ্রেষ্ঠ আচরণের দ্বারা যিনি ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করতে পেরেছেন তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ।

১.২. নারী-পুরুষের সমতা বিধান ও সমাজজীবনে-এর প্রভাব

নারী-পুরুষের সমতা বিধানের ক্ষেত্রে বুদ্ধের উন্নত চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। বুদ্ধ পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের সংঘে প্রবেশে অনুমতি প্রদান করেন। তিনি ভিক্ষুণী সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন এবং নারীরাও পুরুষের মতোই জ্ঞানলাভ ও অর্হত্ব প্রাপ্ত হলেন।[৯] সেই সময় নারীদের জন্য ভিক্ষুণী সংঘ প্রতিষ্ঠা করা ছিল বুদ্ধের একটি বিপ্লবী পদক্ষেপ। ভিক্ষুণী সংঘ প্রতিষ্ঠা নারীদের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক স্বাধীনতা দেয়। এই ক্ষেত্রে থেরী গাথা[১০] গ্রন্থটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নারীরা জন্ম-জন্মান্তরের অক্ষয় পূণ্য সঞ্চয় করে মুক্তির পথে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বুদ্ধের সময়ে পটাচারার অসংখ্য শিষ্যা তাঁর নিকট নিজেদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন: 'তেবজ্জিম্হা অনাসবা' অর্থাৎ, আমরা ত্রিবিদ্যালব্ধ এবং আসবমুক্ত।[১১] *'থেরীগাথা'* গ্রন্থে থেরী 'রোহিনী' বলেন, তিনি পূর্বে নামে মাত্র ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে তিনি সত্যই ব্রাহ্মণ হয়েছেন। ত্রিবিদ্যায় পারদর্শী হয়েছেন।[১২] বুদ্ধের সমকালীন নারীদের অবস্থানের

একটি সম্যক ধারণা পাওয়া যায় যা তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার নারী মর্যাদার গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশ করে। নারীদের অবস্থানের এই চিত্র সমৃদ্ধ সমাজের প্রতিছবি। বুদ্ধ নারীদের মেধা ও সক্ষমতাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। নারীদের মূল্যায়নের চিত্র[১৩] নিম্নরূপ:

পরিচয়	গুণের মূল্যায়ন
মহাপ্রজাপতি গৌতমী	অভিজ্ঞতায় অগ্রগণ্যা
ক্ষেমা	মহাপ্রজ্ঞাবতীদের মধ্যে অগ্রগণ্যা
উৎপলবর্ণা	ঋদ্ধিমতীদের মধ্যে অগ্রগণ্যা
পটাচারা	বিনয়ধারিণীদের মধ্যে অগ্রগণ্যা
ধর্মদিন্না	ধর্মকথিকাদের মধ্যে অগ্রগণ্যা
নন্দা	ধ্যানীদের মধ্যে অগ্রগণ্যা
সোনা	আরব্ধবীর্যাদের মধ্যে অগ্রগণ্যা
সকুলা	দিব্য চক্ষু সম্পন্নাদের মধ্যে অগ্রগণ্যা
ভদ্রা কুণ্ডলকেশা	ক্ষিপ্র অভিজ্ঞান (অতি প্রাকৃত বিষয়ে জ্ঞান) মধ্যে অগ্রগণ্যা
ভদ্রা কপিলানী	পূর্বনিবাস অনুস্মরণকারীদের মধ্যে অগ্রগণ্যা
ভদ্রা কচ্চায়না	মহাভিজ্ঞা লাভীদের মধ্যে অগ্রগণ্যা
সিগালমাতা	শ্রদ্ধাধিমুক্তাদের মধ্যে অগ্রগণ্যা

সারণি : ১

নারীরা বুদ্ধের শাসনে প্রবেশ করে সম অধিকার নিশ্চিত করেছেন। বর্তমান সময়ে নারীরা তাদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মেধা, মনন নিয়ে পুরুষের সাথে সাথে যুক্তি, বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে নানা একসঙ্গে লড়ছে। একই সাথে শিল্প-সাহিত্য, গবেষণা, বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কারে, ধর্ম ও সমাজ সংস্কার ও সৃজনশীলতায় নারীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে প্রতিনিয়ত। নভোচারী হিসেবে চন্দ্র-মঙ্গল গ্রহের অভিযানে নানা সাহসিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছে নারীরা। সমানভাবে সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন যা বিশ্বকে ছাপিয়ে মহাকাশকে জয় করেছেন। জয়ের হাতছানী দিতে অন্যদের অনুপ্রেরণা ও শক্তিরূপে কাজ করছে মহাকাশ বিজ্ঞানী সুনীতি উইলিয়াম।[১৪] নারী শক্তির অপর নাম। জয়ের এই ধারাবাহিক জীবনের পাশাপাশি সংসার জীবনের শান্তি সুখের জন্য প্রতিনিয়ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। নারীদের সংসার জয়ের চারটি[১৫] বিষয় সহায়ক শক্তি রূপে কাজ করে তা হলো:

- পারিবারিক কর্মে সুদক্ষ, পরিশ্রমী, ন্যায়-অন্যায় কর্মে বিচারনিপুণা

- ভৃত্য, কর্মচারীদের কাজের দেখাশানা করা, যথাসময়ে তাদের যথার্থ পারিশ্রমিক প্রদান করা, কর্ম ক্ষমতা অনুসারে কাজ প্রদান করা, অসুস্থ হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, প্রাপ্যতা অনুসারে খাদ্য প্রদান করা।
- স্বামীর কষ্টার্জিত সম্পদ রক্ষা করা, চোরস্বভাব ও বিলাসিনী না হওয়া।
- স্বামীর অপ্রিয় কাজ না করা।

এতে একটি পরিবার সুচারুরূপে পরিচালিত হবে। পরিবারের সদস্যরা ন্যায়, অন্যায়, ভালো, মন্দ ভেদের পাশাপাশি পারিবারিক সুশিক্ষায় বেড়ে উঠবে নিঃসন্দেহে। এর প্রভাব সমাজজীবনে প্রতিফলিত হবে। সমাজের একটি প্রধান অংশ জুড়ে রয়েছে নারী আর তাই সমাজের উন্নয়নে নারীদের উন্নয়ন, শিক্ষা, অধিকার, সমতা, প্রাপ্তি সকল বিষয়ে রাষ্ট্রের ভূমিকা রাখা অতি প্রয়োজন। কেননা আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে সমাজের সকল বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে যা আজ থেকে আড়াই হাজার বছরেরও অনেক আগে বুদ্ধ প্রজ্ঞাময় জ্ঞানে সম্পন্ন করেছিলেন।

১.৩. অর্থনৈতিক সমতা বিধান ও সমাজজীবনে-এর প্রভাব

ব্যক্তির সামাজিক জীবনের সমতার মধ্যে অর্থনৈতিক সমতা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। অর্থনৈতিক সমতার বিষয়টি মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজন সমাজের আর্থিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করার জন্য। একক কেন্দ্রীভূত না হয়ে সমাজের সকল সদস্য যেন আর্থিক সুযোগ পায় সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে তা না সমাজে বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে। বুদ্ধ মধ্যম পন্থা অনুসরণের পরামর্শ দিয়েছেন, যেখানে সম্পদের সুষম বণ্টন গুরুত্বপূর্ণ। দান ও সম্পদ বণ্টন করে অর্থনৈতিক সমতা রক্ষা করা। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার জন্য বুদ্ধ *'অঙ্গুত্তর নিকায়'* গ্রন্থের *'দীঘজানু'* সূত্রে গৃহীদের উপলক্ষ্য করে চার ধরনের সম্পদ ইহজগতে সুখ ও হিত আনয়ন করতে সক্ষম বলে একটি সুন্দর সর্বজনীন ও গ্রহণযোগ্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এগুলো[১৬] হলো:

চার ধরনের সম্পদ	বর্ণনা
উত্থান বা উৎসাহ সম্পদ	যে কর্ম দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করুক না কেন ব্যক্তিকে দক্ষ, নিরলস, প্রতিভাদীপ্ত, অনুসন্ধিৎসুমনা এবং তা উৎসাহের সাথে সম্পাদন করাকে বলা হয় 'উত্থান বা উৎসাহ সম্পদ' ।
সংরক্ষণ সম্পদ	বহু কষ্ট ও পরিশ্রম দ্বারা সততার সাথে অর্জিত ধন-সম্পদকে সচেতনার সাথে রক্ষা করাই হলো সংরক্ষণ।
কল্যাণমিত্রতা বা সৎলোকের সংশ্রব সম্পদ	প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ করাকে কল্যাণমিত্রতা বলা হয়।
সমজীবিকা সম্পদ বা শৃঙ্খলাবদ্ধ সম্পদ	আয় বুঝে ব্যয় অর্থ্যৎ, মিতব্যয়ী হওয়াকে সমজীবিকা সম্পদ বলা হয়।

সারণি : ২

উপরি-উক্ত বিষয় বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য চারটি সম্পদ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এটি বৈষম্য কমাতে এবং সংযমী জীবনযাপনে গুরুত্ব বহন করে। অর্থনৈতিক সমতার ক্ষেত্রে দান একটি বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে সমাজের জনকল্যাণে মঙ্গলার্থে। এক্ষেত্রে *'মঙ্গল সূত্রে'* বর্ণিত আছে:

দানঞ্চ ধম্মচরিযা চ, ঞাতকানঞ্চ সঙ্গহো

অনবজ্জানি কম্মানি, এতং মঙ্গলমুত্তমং।[১৭]

অর্থাৎ, দান দেওয়া ও কায়-বাক্য-মনে ধর্মাচরণ করা, জ্ঞাতিগণের কল্যাণ সাধন করা, নিষ্পাপ কর্ম সম্পাদন করা এবং সদ্ধর্মে অবিচল থাকাই উত্তম মঙ্গল।

বুদ্ধের দৃষ্টিতে দানকে মহান গুণ এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির অন্যতম সোপান হিসেবে বিবেচিত। বুদ্ধ দানকে পুণ্য লাভের অংশ হিসেকে দেখেননি বরঞ্চ দেখেছেন আত্ম অহঙ্কার লাঘব মৈত্রী বিকাশের একটি পথ বা মাধ্যম।

১.৪. শিক্ষায় সমতা বিধান ও সমাজজীবনে-এর প্রভাব

বুদ্ধ জ্ঞানকে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করেছিলেন। বৌদ্ধযুগে শিক্ষার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল, যেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও লিঙ্গভেদে সকলের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছিল। বুদ্ধের সংঘভিত্তিক শিক্ষাপদ্ধতি প্রাচীন ভারতের সামাজিক কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন এসেছিল যার মাধ্যমে গড়ে উঠেছিল একটি সমতাভিত্তিক ও মানবিক শিক্ষাব্যবস্থা। বৌদ্ধযুগের শিক্ষার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল এর সর্বজনীনতা। প্রাচীন বৈদিক যুগে শিক্ষা প্রধানত ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের জন্য সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা এই বৈষম্য দূর করে সকলকে সমান সুযোগ প্রদান করে। জ্ঞান অর্জনের অধিকার সবার রয়েছে। তাই বুদ্ধ নারী-পুরুষ, উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকে শিক্ষা গ্রহণের অধিকার দিয়েছিলেন। বৌদ্ধ শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু ছিল সংঘ। সংঘ হলো বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের সংঘবদ্ধ জীবনযাপনের পদ্ধতি, যা শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক বিকাশের একটি আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। বুদ্ধের শিক্ষা-দর্শনকে ধারণ করে পরবর্তীসময়ে বৌদ্ধ বিহারগুলো বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে উঠেছিল। এখানে ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সবাইকে বিদ্যাচর্চার নানাবিষয়ে পাঠদান করা হতো। সেগুলোর একটি তালিকা[১৮] নিম্ন উপস্থাপন করা হলো:

- নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়
- তেলহারা বিশ্ববিদ্যালয়
- বল্লভী বিশ্ববিদ্যালয়
- পুষ্পগিরি বিশ্ববিদ্যালয়
- বিক্রমপুরী বিশ্ববিদ্যালয়
- ওদন্তপুরী বিশ্ববিদ্যালয়
- পণ্ডিতবিহার বিশ্ববিদ্যালয়
- জগদ্দল বিশ্ববিদ্যালয়

উপরি-উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে জ্ঞানসাধনার সর্বশেষ্ঠ পীঠস্থান বলা হয়। বিদ্যা শিক্ষার এই পীঠস্থান অসাম্প্রদায়িক, উদারতা, মানবিকতা, সংস্কৃতিমনা ও বিনয়ী করে তোলে। বিশ্বজনীন শিক্ষাকেন্দ্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তের ছাত্ররা পড়তে আসত যা আন্তর্জাতিক শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শ তৈরি করেছিল। শিক্ষার কাঠামো ছিলো গুরু শিষ্য পরম্পরা। বৌদ্ধ শিক্ষায় গুরু ও শিষ্যের সম্পর্ক ছিল পিতা-পুত্রের মতো। গুরু শিষ্যকে নৈতিকতা, ধ্যান, দর্শন ও ব্যবহারিক জ্ঞান প্রদান করতেন। বিহারভিত্তিক শিক্ষা অর্থাৎ, বিহারগুলো ছিল জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র। এখানে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি যুক্তিবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ও শিল্পকলা শেখানো হতো। *'মিলিন্দ প্রশ্ন'* গ্রন্থে গ্রিকরাজ মিলিন্দ-এর পরিচয় প্রসঙ্গে সেখানে ১৯ প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের উল্লেখ রয়েছে।[১৯] এগুলো হলো: ১. শ্রুতি, ২. স্মৃতি, ৩. সাংখ্য, ৪. যোগ, ৫ ন্যায়, ৬. বৈশেষিক, ৭. গণিত ৮. সঙ্গীত, ৯. চিকিৎসা, ১০. চর্তুবেদ (মতান্তরে ধনুর্বিদ্যা) ১১. পুরাণ, ১২. ইতিহাস, ১৩. জ্যোতিষ, ১৪. যাদুবিদ্যা, ১৫. হেতু বা তর্ক বিদ্যা, ১৬. মন্ত্রণা, ১৭. যুদ্ধবিদ্যা, ১৮. ছন্দ বিদ্যা, ১৯. সামুদ্রিক বিদ্যা। বর্তমান সময়ে এসেও এই সমস্ত বিষয়ের পঠন-পাঠনের প্রচলন দেখা যায় যা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ একটি ধারা হিসেবে বিবেচিত। পাশাপাশি এটি সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। বুদ্ধ প্রবর্তিত শিক্ষা শুধু ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের জন্য নয়, সাধারণ জনগণের জন্যও শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিল। বুদ্ধের শিষ্যরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা প্রচার করতেন। প্রগতিশীল ও উদার শিক্ষাদর্শন এর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে বুদ্ধের শিক্ষায় যা সমতা ও যুক্তিনির্ভরতা। *'সুত্তপিটক'* -এর অন্তর্গত *'অঙ্গুত্তর নিকায়'* -এর *'কেসমুত্তি সুত্তং'* বর্ণিত[২০] আছে এভাবে : 'জনশ্রুতিবশত কোনো মতবাদ গ্রহণ করবেন না, পরম্পরা বলে বিশ্বাস করবেন না, অন্ধ বিশ্বাসে বিভ্রান্ত হবেন না, শাস্ত্রে আছে বলে মেনে নেবেন না, তর্ক প্রসুত মতে আস্থা স্থাপন করবে না, অনুমান বশত কোন কিছু গ্রহণ করবে না, নিজের মতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে সত্য বলে গ্রহণ করবে না, ধর্মগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাবশত কোন মতবাদ করবে না। কিন্তু যখন জানবে যে, এই শিক্ষা নির্দোষ, বিজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক প্রশংসিত, এইগুলো অনুসরণ করলে মঙ্গল সাধিত হবে এবং সুখ উৎপন্ন হবে তখন গ্রহণ করবে।' এই ধরণের সর্বজনীন উক্তি মহাকালের সর্বত্রে সবাইকে প্রগতি, সংস্কৃতি ও প্রজ্ঞাবান হতে উদ্বুদ্ধ করবে। বুদ্ধের শিক্ষা প্রাচীন ভারতের সমাজে গভীর প্রভাব ফেলেছিল জাতিভেদের অবসান এর কারণে। পুরুষদের পাশাপাশি নারীশিক্ষার প্রসার হয়েছিল। বুদ্ধ ভিক্ষুণী সংঘ প্রতিষ্ঠা করে নারীশিক্ষাকে উৎসাহিত করেছিলেন। এখানে শিক্ষার ক্ষেত্রে সমতা রক্ষিত হয়েছে। মোটকথা বৌদ্ধযুগের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল সর্বজনীন, যুক্তিনির্ভর ও মানবিক। এটি শুধু ধর্মীয় শিক্ষাই নয়, বরং একটি সামগ্রিক জ্ঞানভিত্তিক সমাজগঠনে ভূমিকা রেখেছিল। বুদ্ধের শিক্ষাদর্শন আজও বিশ্বে সমতা ও শান্তির বার্তা বহন করে।

১.৫. গণতান্ত্রিক চর্চা

ইংরেজি 'Democracy'-এর বাংলারূপ 'গণতন্ত্র'। বলা যায় আধুনিক গণতন্ত্রের প্রথম সূচনা হয় গ্রিসের এথেন্সে।[২১] গণতন্ত্রকে নৈতিক দর্শনের ফসল নামেও অভিহিত করা হয়। ইংরেজি 'Democracy' শব্দটি গ্রিক 'demokratia'

শব্দ থেকে উদ্ভূত। এখানে 'demokratia' শব্দটি 'demos' এবং 'kratia' নামের দুটি গভীর অর্থবোধক শব্দযোগে গঠিত। 'demos' এবং 'kratia' শব্দ দুটির শব্দগত অর্থ হলো 'people' এবং 'power'। অর্থাৎ, জনসাধারণ এবং ক্ষমতাকে বোঝায়। বর্তমানে গণতন্ত্র বেশ প্রশংসিত ও নন্দিত যা সর্বজন বিদিত। পুরোবিশ্ব গণতন্ত্র চর্চায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করে চলেছে। 'গণতন্ত্র' শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে আছে সকলের মতামত, সিদ্ধান্ত, সকল নাগরিকের অংশগ্রহণের সুযোগ। বুদ্ধ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংঘ পরিচালনা করতেন। বুদ্ধের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত *'ত্রিপিটক'* গ্রন্থের অন্তর্গত *'সূত্রপিটক'* এর *'দীঘনিকায়'* নামক গ্রন্থের *'মহাপরিনিব্বাণ সুত্ত'*-এ বুদ্ধ কর্তৃক উপদেশিত সপ্ত অপরিহানীয় নীতির মধ্যে পাওয়া যায়। সপ্ত অপরিহানীয় নীতিসমূহ[২২] হলো :

চিত্র ১ : সপ্ত অপরিহানীয় নীতি

উপরি-উক্ত সপ্ত অপরিহানীয় ধর্মকে আধুনিক গণতন্ত্রের ভিত্তি বলা হয়। সহমত ভিত্তিক শাসনে জনগনকে সমান গুরুত্ব দেওয়া। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় অহিংসা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে উপরি-উক্ত সপ্তঅপরিহানয়ি নীতি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। *'পাচিত্তিয়া'* গ্রন্থে বর্ণিত অধিকরণ সমথ বিচার বা বিবাদ মীমাংসার গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হয়। অধিকরণ সমথ ন্যায়ভিত্তিক প্রক্রিয়া হিসেবেও স্বীকৃত। এটি বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘের মধ্যে উদ্ভূত বিরোধ বা অপরাধের নিষ্পত্তির জন্য প্রণীত নিয়মকানুনের সমষ্টি, যা সমষ্টিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ন্যায়বিচারের আদর্শ প্রতিফলিত করে। সেগুলো[২৩] হলো:

- **সম্মুখ বিনয় (সম্মুখ বিনয় দেওয়া কর্তব্য)** - সংঘের সকল সদস্য গণের উপস্থিতি, তাঁদের মতামত যাচাই, বাদী-বিবাদীর উপস্থিতি তাদের সাক্ষী-জেরাদি গ্রহণ এবং ধর্ম-বিনয়ানুসারে বিচার সিদ্ধান্ত করা সম্মুখ বিনয়। এটি স্বচ্ছতা ও ন্যায়বিচারের প্রতীক, যেখানে সকলের মতামত ও প্রমাণ বিবেচনা করা হয়।
- **সতি বিনয় (স্মৃতি বিনয় দেওয়া কর্তব্য)** - এক্ষেত্রে অপরাধীকে সংঘের সামনে হাজির হয়ে সতি বিনয় প্রার্থনা করতে হয়। এটি আত্মসমালোচনা ও সংশোধনের পদ্ধতি, যা ব্যক্তির আন্তরিকতাকে গুরুত্ব দেয়।
- **অমূঢ় বিনয় (অমূঢ় বিনয় দেওয়া কর্তব্য)**- কোনো ভিক্ষু উন্মাদ অবস্থায় শিক্ষাপদ লঙ্ঘনজনিত যে সকল অপরাধ করে থাকেন, সে সকল অপরাধে যদি কেউ তাকে অভিযুক্ত করে থাকে, সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় সংঘকর্তৃক তাকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জেনে নিতে হবে যে, তার সে সকল অপরাধ স্মরণ আছে কি না। যদি স্মরণ না থাকে, তখন তাকে সেই অভিযোগের দায় আনুষ্ঠানিক নির্দোষ ঘোষণাকে 'অমূঢ় বিনয়' বলা হয়। এটি মানসিক অবস্থার প্রতি সংবেদনশীলতা দেখায় এবং অজ্ঞানে অপরাধ শাস্তিযোগ্য নয় এই নীতিকে সমর্থন করে।
- **পটিঞ্ঞায বিনয় (প্রতিজ্ঞা করানো কর্তব্য)**- অভিযুক্ত ভিক্ষুকে সংঘের সামনে একটি আনুষ্ঠানিক প্রতিজ্ঞা বা স্বীকারোক্তি করতে বলা হয়। তিনি যদি অপরাধের পুনরাবৃত্তি না করার প্রতিশ্রুতি দেন, তবে সংঘ তাকে ক্ষমা করে। এটি ভবিষ্যতে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য একটি চুক্তিভিত্তিক পদ্ধতি।
- **যেভূয্যেসিকা বিনয় (সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত গ্রহণ করা কর্তব্য)**- জটিল বা মতবিভেদপূর্ণ ক্ষেত্রে সংঘের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এটি সর্বসম্মতির বিকল্প হিসেবে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়, যা আধুনিক গণতন্ত্রের অনুরূপ।
- **তস্সপাপীযসিকা বিনয় (দণ্ডদান কর্তব্য)**-গুরুতর অপরাধের জন্য সংঘ শারীরিক বা আচরণগত দণ্ড প্রদান করতে পারে। এটি শাস্তি ও সংশোধনের মধ্যে ভারসাম্য রাখে।
- **তিণবিত্থারকো বিনয় (তৃণাচ্ছাদন বিধি দেওয়া কর্তব্য)**-দু'পক্ষের মধ্যে বিরোধের সমাধান না হলে, সংঘ একটি অস্থায়ী সিদ্ধান্ত নেয়, যেখানে উভয় পক্ষকে তৃণের মতো নম্র হয়ে সব বিরোধ ভুলে যেতে বলা হয়। এটি ক্ষমা ও সমঝোতার উপর জোর দেয়, যাতে সংঘের মধ্যে ঐক্য বজায় থাকে।

উপরি-উক্ত বর্ণনায় গণতান্ত্রিক চর্চার রূপটি ফুটে উঠে। এই সাতটি পদ্ধতি বৌদ্ধ সংঘের মধ্যে ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা, সংশোধন ও সামষ্টিক শাসনের একটি অনন্য মডেল উপস্থাপন করে। এটি শুধু ধর্মীয় বিধানই নয় বরং প্রাচীন গণতন্ত্র ও আইনের আদর্শ হিসেবেও বিবেচিত হয়। বুদ্ধের সময়ে এই পদ্ধতিগুলো সংঘের শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি ব্যক্তির মর্যাদা ও সামষ্টিক ঐক্য নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।

১.৬. নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সমতা বিধান ও সমাজজীবনে-এর প্রভাব

আত্মোন্নয়নের ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সবাই ধর্মচর্চা করতে পারে। অহিংসা ও করুণা প্রতিষ্ঠায় সকল প্রাণীর প্রতি সমদৃষ্টি রাখা। বুদ্ধের শিক্ষা-দর্শন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার অংশ। এই শিক্ষা যে কেউ চাইলেই গ্রহণ করতে পারে এর জন্য কোনো আলাদা বিধি নিষেধ নেই।

সবশেষে বলা যায়, সমতা বুদ্ধের শিক্ষা-দর্শনে একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ। এটি চিত্তের এমন এক গুণ বা অবস্থা যেখানে মানুষের মর্যাদা সর্বাগ্রে প্রদান করা হয়। এখানে বুদ্ধ গভীর সহানুভূতির মাধ্যমে বিবেকবোধকে জাগ্রত করে সমাজকে সুন্দরভাবে বিনির্মাণ করার কথা বলেন। এটির মাধ্যমে মনে প্রশান্তি আসে; ন্যায়বিচার ও সহনশীলতা বৃদ্ধি পায়। যা সকলের জন্য প্রয়োজন।

তথ্য নির্দেশিকা ও টীকা

১. শ্রীধর্ম্মজ্যোতিঃ স্থবির, শ্রীনীলাম্বর বড়ুয়া অনূদিত, *খুদ্দক পাঠো* (কলিকাতা : ১৯৫৫), পৃ. ৪৫

২. রাজগুরু শ্রীমৎ ধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির অনূদিত, *দীর্ঘ নিকায়*, প্রথম খণ্ড (রাজানগর : রাজবিহার, ১৯৬২), পৃ. ৬৯

৩. গিরিশচন্দ্র বড়ুয়া অনূদিত, *ধম্মপদ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী ১৯৭৭), পৃ. ২০৮

৪. Ven. Pategarna Gnanarama, An Approuch to Buddhist Social Philosophy, Ti-Sarana Buddhist Association, First published in (Singapore : 1996), P.70

৫. শ্রী জ্যোতিপাল ভিক্ষু অনূদিত, *উদানং* (খাগড়াছড়ি : ২০১৩), পৃ. ১৩৫

৬. শীলানন্দ ব্রহ্মচারী অনূদিত, *সংযুক্ত নিকায়*, প্রথম খণ্ড (কলকাতা : ১৪০০ বাংলা), পৃ. ১১৪

৭. ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত, *মধ্যম নিকায়*, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ (কলিকাতা : ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, ১৩৯৪ বাংলা), পৃ. ৪৬

৮. স্থবির, *থেরগাথা*, প্রথম সংস্করণ (রেঙ্গুন বৌদ্ধ মিশন প্রেসে মুদ্রিত : ১৯৩৫), পৃ. ৩৬৬

৯. ভিক্ষু শীলভদ্র, *থেরীগাথা* (কলিকাতা : মহাবোধি সোসাইটি), পৃ. ১৪

১০. থেরী গাথা: ত্রিপিটকের অর্ন্তগত সুত্ত পিটকস্থত খুদ্দক নিকায়ের নবম গ্রন্থ হলো থেরীগাথা। এতে ৭৩ জন থেরীর মোট ৫২২টি গাথা ১৬টি নিপাতে বিভক্ত আছে। এখানে থেরীদের ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ ও তৎকালীন ভারতের সমাজব্যবস্থা, নারীদের অবস্থা ও অধিকারের সামগ্রিক একটি চিত্র পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে ২৩ জন সম্ভ্রান্ত বংশীয় রাজ পরিবারভূক্ত বধু ও কন্যা, ১৩ জন শ্রেষ্ঠী বা ধনী সম্প্রদায়ভূক্ত, ব্রাহ্মণ ও পূজারীর সংখ্যা ৭ জন, বারবণিতা ছিলেন ১৫ জন।

১১. *থেরীগাথা*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৭০

১২. প্রাগুপ্ত, পৃ. ১২১

১৩. অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া, *অঙ্গুত্তর নিকায়*, প্রথম খণ্ড (এক, দুক, তিক নিপাত), দ্বিতীয় সংস্করণ (রাঙ্গামাটি : বনভান্তে প্রকাশনী, ২০০৪), পৃ. ৩২

14. https://www.nasa.gov/people/sunita-l-williams/

১৫. সুভূতিরঞ্জন বড়ুয়া, *বৌদ্ধ মহিয়সী নারী* (কলিকাতা : ১৪০০), পৃ. ৭৪

১৬. অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া অনূদিত, *অঙ্গুত্তর নিকায়*, চতুর্থ খণ্ড, প্রথম প্রকাশ (রাঙ্গামাটি : ২০০৫), পৃ.২৩৭

১৭. সাধনানন্দ মহাস্থবির অনূদিত, *সুত্ত নিপাত* (রাঙ্গামাটি : ১৯৮৭) পৃ. ৭১

১৮. ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া, *প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়* (ঢাকা : জাগৃতি প্রকাশনী, ২০২৪০, পৃ. ১৭

১৯. শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত, *মিলিন্দ প্রশ্ন* (কোলকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০১৩), পৃ. ৩

২০. *অঙ্গুত্তর নিকায়*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুপ্ত, পৃ. ২৪২

২১. *The Rise of Democracy Revolution, War and Transformations in International Politics since 1776*, by Christopher Hobson, Edinburgh University Press Ltd, 2015, p. 8

22. রাজগুরু ধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির অনূদিত, *মহাপরিনিব্বানং সূত্তং* (তাইওয়ান : করপর‍্যাট বডি অব দি বুদ্ধ এডুকেশনাল ফাউন্ডেশন সন অনুল্লেখিত), পৃ. ১-৮

২৩. ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু, *বিনয় পিটকে পাচিত্তিয* (চট্টগ্রাম : বনভন্তে-প্রজ্ঞাবংশ একাডেমী, ২০০৭), পৃ. ৩৯৮)

দ্বিতীয় অধ্যায়: তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মৃতুদণ্ড, গর্ভপাত, আত্মহত্যা, মানসিক হত্যা এবং প্রতিকার

ভূমিকা

বুদ্ধের শিক্ষা-দর্শন অহিংসা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি চারি ব্রহ্মবিহার, চারি আর্যসত্য, অষ্টবিধ মার্গ, পঞ্চনীতিসহ অপরাপর নৈতিক আচার-আচরণ পালন ও চর্চার মাধ্যমে শৃঙ্খলিত জীবনযাপনের কথা বলেছেন। সকল প্রকার অকুশল কর্ম সম্পাদন থেকে বিরত থেকে কুশল কর্ম সম্পাদন করে সুন্দর, সুখী এবং সমৃদ্ধ জীবনযাপনের কথা বলেছেন।

১. নানাবিধ হত্যা

হত্যা হলো ইচ্ছাকৃতভাবে কারও প্রাণ কেড়ে নেওয়া। শুধু তাই নয় এটি অশালীন আচরণ ও গর্হিত কাজ যা অহিংসার সম্পূর্ণ বিপরীত। এটি গুরুতর জগণ্য অপরাধ। হত্যা কোনো ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে মৃত্যু দিকে নিয়ে যাওয়া, হত্যার উপায় বলা, হত্যার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণ হওয়া, জীবন শেষ করে দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করা। সমাজে হত্যার শিকার ব্যক্তি ও তার পরিবারের উপর এর প্রভাব অত্যন্ত গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। এখানে উল্লেখ আছে যে, হত্যার শিকার একজন ব্যক্তি পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের অংশ ফলে এর প্রভাব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে যা অনেকাংশে প্রতিহিংসা তৈরী করে। সমাজে ব্যক্তি ক্রোধ, প্রতিশোধ পরায়ণতা, কোনো কিছুর প্রতি লোভ, দ্বেষ, মোহ, মানসিক ভারসাম্যহীনতা, সামাজিক সংঘাত, প্রতিহিংসায় জর্জরিত হয়ে, কলহের কারণে, যুদ্ধের কারণসহ বহুবিধ কারণে হত্যাযজ্ঞে লিপ্ত হয়। সকল ধর্ম, সমাজ ও আইনে হত্যাকে মহাপাপ হিসেবে দেখা হয়। প্রত্যেক ধর্মে প্রাণীহত্যা থেকে দূরে থাকার কথা বলা হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম দর্শনেও এর ব্যতয় হয়নি। হত্যা গুরুতর পাপ, তাই এর ফল হত্যাকারীকে ভোগ করতে হয়। হত্যা সমাজে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নানা রূপে প্রকাশ পায়। হত্যার বহু রূপ রয়েছে নিম্নে তা উপস্থাপন করা হলো:

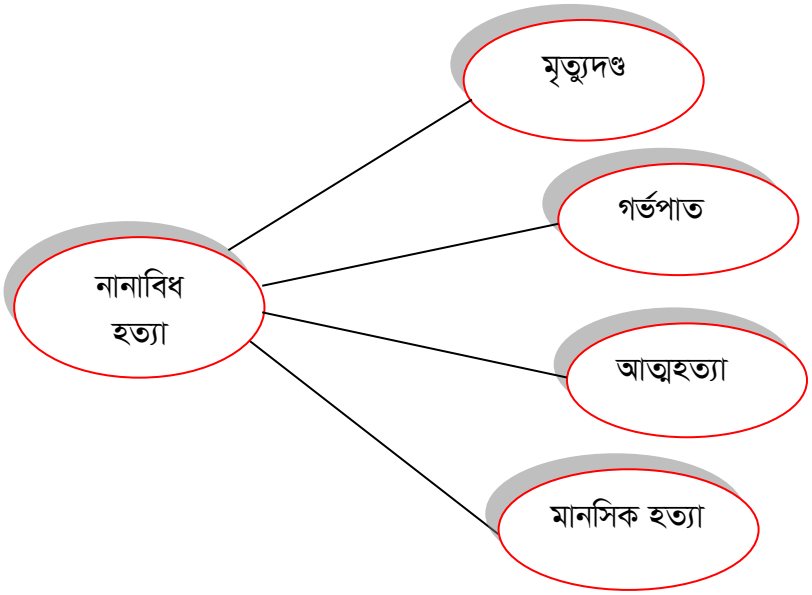

চিত্র ১ : নানাবিধ হত্যা

হত্যা মানবজীবনের একটি নিকৃষ্টতম কাজ। প্রাণীর জীবন নাশকরাই প্রাণীহত্যা। মানুষ জন্ম থেকেই সুখ চায় মৃত্যু কারও কাম্য হতে পারে না। মানুষ বা প্রাণী সকলেই বাঁচতে চায়। সকলেরই রয়েছে বাঁচার অধিকার। হত্যা বলতে বোঝায় প্রাণহানি করা। বর্তমান যুগে হত্যা যেন বেড়ে যাচ্ছে। বৌদ্ধধর্মে এই হত্যাযজ্ঞ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বুদ্ধের গৃহী সূত্রের পঞ্চনীতি বা পঞ্চশীলের প্রথমটি হলো, "পানাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামী।"[১] অর্থাৎ, প্রাণীহত্যা হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি। বুদ্ধ প্রাণিহত্যার পাঁচটি কারণ বলে অভিহিত করেছেন:

পাণোভবে পানসঞ্ঞী বধকচিত্তমুপক্কমো
তেন জীবিত নাসো চ অঙ্গা পঞ্চ বধস্সিমে।[২]

অর্থাৎ, পাঁচটি কারণ হলো যথাক্রমে : ক. প্রাণী, খ. প্রাণী বলে ধারণা, গ. হত্যা করার ইচ্ছা বা চেতনা গ্রহণ করা, ঘ. হত্যা করার জন্য উপক্রম বা প্রচেষ্টা, এবং ঙ. নিজ কিংবা আদেশ প্রাপ্ত হয়ে হত্যা করা।

এ প্রসঙ্গে *'অঙ্গুত্তর নিকায়'* গ্রন্থেও অনুরূপ একটি নির্দেশনা পাওয়া যায়। এখানে আছে: 'পাণাতিপাতে অত্তনা সম্পযুত্তো হোতি, পরং সমাদাপেতি, সমনুঞ্ঞো হোতি, বণ্ণং ভাসতি।[৩] অর্থাৎ, প্রাণীহত্যায় স্বয়ং নিযুক্ত হয়, পরকে নিয়োগ করে, হত্যা সমর্থন করে এবং এর প্রশংসা করে।'

হত্যা সম্পর্কে *'বিনয়পিটক'* -এর অন্তর্গত *'পারাজিকা'* গ্রন্থে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি শিক্ষা রয়েছে। শিক্ষাপদটি নিম্নরূপ:

'যো পন ভিক্খু সঞ্চিচ্চ মনুস্সবিগ্গহং জীবিতা বোরোপেয্য সত্থহারকং বাস্স পরিযেসেয্য মরণবণ্ণং বা সংবণ্ণেয্য মরণায বা সমাদপেয- 'অম্ভো পুরিস, কিং তুয্হিমিনা পাপকেন দুজ্জীবিতেন, মতং তে জীবিত সেয্যো'তি, ইতি চিত্তমনো চিত্তসম্কপ্পো অনেকপরিযাযেন মরণবণ্ণং বা সংবণ্ণেয্য, মরণায বা সমাদপেয্য, অযম্পি পারাজিকো হোতি অসংবাসো"তি।'[৪]

অর্থাৎ, যদি কোন ভিক্ষু স্বজ্ঞানে নরহত্যা করেন, অথবা হত্যার উদ্দেশ্যে কাউকে নানা প্রকার উপায় জ্ঞাপনপূর্বক পরামর্শ দান করেন কিংবা কাউকে মরণার্থে উত্তেজিত করার জন্য এরূপ বলেন : "তোমার পাপময়, দুঃখময় জীবনে বেঁচে থাকা কী প্রয়োজন? বরং মরণই ভালো" কিংবা কাউকে মরার জন্য সংকল্পবদ্ধ করান তবে সেই ভিক্ষুর পারাজিকা আপত্তি হবে।

আর আপত্তিটি হত্যার সাথে সম্পর্কযুক্ত। উল্লেখ আছে নরহত্যা ছয়[৫] প্রকার। সেগুলো নিচে উপস্থাপিত হলো :

১. সাহত্থিকো–স্বীয় অঙ্গ-প্রতঙ্গ অথবা অঙ্গ প্রতিবদ্ধ কোন বস্তু দ্বারা নর হত্যা করা।

২. নিস্সগগিকো– অস্ত্র-শস্ত্র, পাষাণ প্রভৃতি নিক্ষেপ করে দূরে অবস্থিত মানুষকে হত্যা করা।

৩. আণত্তিকো– মারার জন্য আদেশ করা।

৪. থাবরো– মারার জন্য নানারূপ উদ্যোগ আয়োজন করা যেমন, গর্ত খনন, অসি নিক্ষেপ, জলে বিষ প্রদান, বিরূপ মূর্তি দর্শন প্রভৃতি।

৫. বিজ্জামযো– হত্যা করার জন্য মন্ত্র জপ করা, বাণ-টোনা ইত্যাদি।

৬. ইদ্ধিমযো– হত্যা করার জন্য অলৌকিক ঋদ্ধি প্রদর্শন করা।

এগুলো অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। *'ধর্মপদ'* গ্রন্থের *'দণ্ড বর্গে'* প্রাণিহত্যা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি অর্থের বশে বা কোনো লোভের প্রলুব্ধ হয়ে নিরস্ত্র, নিরপরাধ ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করলে তার হীনমন্যতা এবং কাপুরুষতাই বহিঃপ্রকাশ পায়। শুধু তাই নয়, দশ প্রকার দুর্ভোগের মধ্যে যে কোন একটি দুর্ভোগ তিনি ভোগ করে বলে বুদ্ধ জানান। সেগুলো[৬]:

- তীব্র বেদনাদায়ক পীড়ায় আক্রান্ত হওয়া
- সম্পদহানী ও অর্থের অপচয়
- দুর্ঘটনা জনিত কারণে অঙ্গহানি ঘটা
- জটিল ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া
- উন্মাদ হওয়া
- রাষ্ট্রদ্রোহিতায় অভিযুক্ত হয়ে রাজদণ্ড ভোগ করা
- অভূতপূর্ব, অকৃত পূর্ব ও অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে জড়িত হয়ে কলঙ্কের ভাগী হওয়া
- প্রিয় বিয়োগ ঘটা
- সম্পদ হানি হওয়া এবং
- গৃহদাহ হওয়া।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো যথাযথভাবে শিক্ষা লাভ করলে ব্যক্তি নিজেকে হত্যার মতো জঘণ্য অপরাধ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার চেষ্ঠা করবেন। এর প্রভাবে সমাজে শান্তি ও সুখ বিরাজ করবে। হিতোপদেশ ও নৈতিক শিক্ষার অমূল্য ভান্ডার জাতক।[৭] জাতক সাহিত্যের *'অয়কূট জাতক'* পাঠে প্রাণীহত্যা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় যেখানে বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব অবস্থায় ভেরীবাদ দ্বারা ঘোষণা করেছিলেন যে, কেউ প্রাণিহত্যা করতে পারবে না।[৮] বুদ্ধের ধর্ম দর্শন তথা শিক্ষায় হত্যা অস্বীকৃতির সাথে দেখা হয় এই নৈতিক শিক্ষা অনুগামীদের উদারতা প্রকাশ করতে উৎসাহিত করে, এমনকি কেউ অন্যায় বা অপরাধমূলক আচরণ জড়িত হলেও। বৌদ্ধধর্মের মূল মর্মবাণী এটি। এই চর্চার মাধ্যমে অহিংসা প্রকাশ পায়। অহিংসা মানে কায়বাক্যমনে সকল ধরণের পর পীড়া বর্জন। এই প্রসঙ্গে *'সূত্র পিটক'* গ্রন্থেও অন্তর্ভূক্ত *'সংযুত্ত নিকায়'* এর *'অহিংসক সূত্রে'*-এ বুদ্ধের উপদেশ ; 'যে কায়-বাক্য-মনে হিংসা করে না, পরের অশুভ চিন্তা করে না, অমঙ্গল কামনা করে না সেব্যক্তিই অহিংসা পরায়ণ হয়'।[৯] মানবতাবাদের বিকাশে তিনি অহিংসা নীতিকে সর্বোচ্চে স্থান দিয়েছেন। অহিংসা নীতির মাধ্যমে তিনি পারস্পরিক সদ্ভাব ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এবং সৌহার্দ

সম্প্রীতির মাধ্যমে বন্ধনকে সুদৃঢ় করার কথা বলেন। তিনি হত্যা এবং হত্যার কারণ না হওয়ার এবং অনুমোদন না করার জন্য নিষেধ করেন। সবল দুর্বল ও ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের প্রতি অহিংসাভাব প্রদর্শন করে কথা বলেন। লোভ-দ্বেষ-মোহের মাধ্যমে হিংসার উন্মেষ হয়। ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি রিপুগুলো আর্বজনার মত মানুষের মনকে প্রকাশিত হতে দেয় না যা কিনা হিংসারই একটি রূপ। এ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে হবে। হিংসার মাধ্যমে সম্পাদিত কর্মই মহাপাপ। সমাজে অন্যায়ের প্রতিকার স্বরূপ শাস্তির বিধান আবহকাল থেকে প্রচলিত আছে। অন্যায় প্রতিরোধ করার জন্য যত নিয়ম করা হোক না কেন মানুষ তার অন্তর্নিহিত পাশবিক শক্তিকে যত দিন বশীভূত করতে না পারবে, ততদিন এই অন্যায় চলতে থাকবে। একমাত্র মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত হলে মানুষ অন্যায় থেকে বিরত থাকবে। অন্যথায় মনুষ্যত্বের অভাবে মানুষ অন্যায়ের সাথে জড়িয়ে যাবে। মনুষ্যত্ব নিজেকে ভালোবাসতে শিখাবে এবং অন্যকেও নিজের মত ভালোবাসতে শিখায়। তাছাড়া বৌদ্ধরা কর্মে বিশ্বাস করে, এই কর্মের ফল ব্যক্তি তা ইহজীবনে বা ভবিষ্যতের পুনর্জন্মে ভোগ করে। যার অন্তরে প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা রয়েছে তার পক্ষে প্রাণিহত্যা তো দূরের কথা অপরের অমঙ্গল চিন্তা বা অপরের ক্ষতি সাধন করা কখনো আসবে না। তাইতো বুদ্ধ জগতের সকল প্রাণীর কথা চিন্তা করে *'করণীয় মৈত্রী সূত্রে'* উপদেশ করেছেন এভাবে :

মেত্তঞ্চ সব লোকস্মিং, মানসং ভাবযে অপরিমাণং।
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ, অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।[১০]

অর্থাৎ, জগতের সকল দিকে উপরে-নীচে, পার্শ্বে চারিদিকে যে সকল প্রাণীসমূহ আছে, তারা বাঁধাহীন ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অর্থাৎ শত্রুতা বর্জিত হোক।

বর্তমান বিশ্বে মানুষ মানুষের দ্বারা যেভাবে হত্যার শিকার হচ্ছে, পশু পশুর দ্বারা ততটুকু হত্যার শিকার হয় না। এ যেন সমাজের একটি নির্মম কলঙ্কিত অধ্যায় যা শুধু সমাজের অশুভ দিককে দিনদিন বৃদ্ধি করছে। বুদ্ধ কাউকে প্রতিহিংসা এবং প্রতিঘাত না করার কথা বলেছেন। *'ধর্মপদ'* গ্রন্থের -এর *'যমক বর্গে'* এ বিষয়ে বুদ্ধ বলেছেন :

নহি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো।[১১]

অর্থাৎ, পৃথিবীতে শত্রুতার দ্বারা কখনই শত্রুতা দমন করা যায় না, মিত্রতার দ্বারা শত্রুতার উপশম করা যায়। ইহাই সনাতন ধর্ম।

পারিবার, সামাজ এবং রাষ্ট্রের প্রতিটি মানুষ জীবনের নিরাপত্তা আশা করে। আশা করে নিরাপত্তার সাথে জীবনধারণ করতে যাতে ব্যক্তি জীবন সুন্দর ও আলোকিত হয়। আলোকিত জীবন দিয়েই মানবতা, মনুষ্যত্ব ও মানবপ্রেম জাগ্রত হয়।

১.১. মৃত্যুদণ্ড

দেশে প্রচলিত শাসনব্যবস্থায় মৃত্যুদণ্ড হলো নানাভাবে আইন অমান্যতার অপরাধে ব্যক্তিকে জীবননাশের শাস্তি। এটি বিচারব্যবস্থায় সর্বোচ্চ দণ্ড বলে স্বীকৃত। কিন্তু বৌদ্ধধর্মে কোনোভাবেই মৃত্যুদণ্ড সমর্থনযোগ্য নয় বা সমর্থন করে না। প্রাণহানি নয় করুণা শিক্ষার মাধ্যমে ন্যায়বিচার হোক -এটি বুদ্ধেও শিক্ষা। 'জন্মগ্রহণ' ও 'মৃত্যুবরণ' মানবজীবন চক্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। জন্মগ্রহণ করলে প্রত্যেককেই মৃত্যুবরণ করতে হয়। পৃথিবীতে কেউ অমর নয়, মানুষ মরণশীল যা চিরন্তন যা চিরশ্বাশত সত্য। '*ধর্মপদ*' গ্রন্থে মৃত্যু সম্পর্কিত বহু উপদেশ আছে যা সর্বকালীন, ধ্রুব সত্য। মৃত্যুতে জীবনাবসান প্রসঙ্গে বুদ্ধ বলেছেন :

পরজিন্নমিদং রূপং রোগনিড্ঢ পভঙ্গুরং
ভিজ্জতি পূতিসন্দেহো মরণন্তং হি জীবিতং।[১২]

অর্থাৎ, এ রূপকায় জীর্ণতাধর্মী ব্যাধির আগার এবং ক্ষণভঙ্গুর। পুঞ্জিতপূতি সমন্বিত এ দেহ সহজে বিখন্ডিত বা ভেঙে যায়, মৃত্যুতে জীবনের বিনাশ হয়।

মানবজীবনের চরম সত্য মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে *'মিলিন্দপ্রশ্ন'* গ্রন্থে রাজা মিলিন্দের প্রশ্নোত্তর এর এক পর্যায়ে ভন্তে নাগসেন উল্লেখ করে বলেন, "উপরে আকাশ নয়, নিচে সমুদ্রমধ্যেও নয় পর্বতরাজির বিবরে প্রবেশ করেও নয়, জগতে এমন গুপ্তস্থান কোথাও বিদ্যমান নেই, যেখানে থেকে মৃত্যুপাশ হতে মুক্ত হওয়া যায়"।[১৩]

সুন্দর ধরায় সবাই সুন্দও ও সুষ্ঠভাবে বেঁচে থাকার অধিকার চায়। বুদ্ধ মানবজীবনের বিভিন্ন অধিকার সম্বন্ধে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপদেশ প্রদান করেছেন। তন্মোধ্যে স্ব-স্ব স্থানে বেঁচে থাকার অধিকার একটি। যেখানে বুদ্ধ ব্যক্তিকে হত্যা বা মৃত্যুদণ্ড থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ প্রদান করেছেন। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে:

নিব্বায দণ্ডং ভূতেসু তমেসু থাবরেসু চ,
যো ন হন্তি ন ঘাতেতি তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।[১৪]

অর্থাৎ, মৃত্যুভীত কিংবা মৃত্যুভয়াতীত সর্ববিধ প্রাণীর প্রতি দণ্ড পরিহারপূর্বক যিনি কোনো প্রাণীহত্যা করেন না কিংবা হত্যার কারণও হন না, তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

সকলের প্রতি অহিংসা পরায়ণ বলে তিনি পুত-পবিত্রতার অধিকারী হোন। এ বিষয়ে '*জনসন্ধ- জাতক*' এ পাওয়া যায়। কাহিনিটি নিম্নরূপ : 'বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁর পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেছেলেন। তাঁর নাম রাখা হয়েছিল জনসন্ধ। জনসন্ধ বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তক্ষশিলায় গমন করে সর্ব্বশিল্পে বিদ্যা অর্জন করেছিলেন। তিনি যখন তক্ষশিলা থেকে ফিরে আসলেন, তখন রাজা সমস্ত কারাগার উন্মোচন করে বন্দীদের মুক্তি দিয়েছিলেন। কাল সহকারে পিতার মৃত্যুর পর তিরি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি ছয়টি দানশালা স্থাপনপূর্বক প্রতিদিন ছয় লক্ষ মুদ্রা দান করতেন। তাঁর শাসনগুণে কারাদ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকত। অপরাধীর প্রাণদণ্ডের জন্য ধর্ম্মগণ্ডিকা প্রভৃতি যে সকল যন্ত্রের প্রয়োজন, তিনি সে সকল নষ্ট করেছিলেন'।[১৫]

'ধর্মপদ' গ্রন্থের *'দণ্ডবর্গে'* বুদ্ধ প্রাণী হত্যা নিষেধ করে উল্লেখ করেছেন:

সব্বে তসন্তি দণ্ডস্স, সব্বে ভয়ন্তি মচ্চুনো;
অত্তানং উপনং কত্বা, নহনেয্য ন ঘাতযে।[১৬]

অর্থাৎ, সবাই দণ্ডকে ভয় করে, সবাই মৃত্যুকে ভয় করে তাই অপরকে নিজের সাথে তুলনা করে হত্যা কিংবা আঘাত করবে না কখনো।

বুদ্ধের শিক্ষা-দর্শনে মৃতুদণ্ড না দেওয়ার বিষয়টি পরিষ্কারভাবে উঠে আসে তাঁর অহিংসা নীতির মাধ্যমে। বুদ্ধের মতে সকলের প্রতি মৈত্রী ও সহানুভূতি রাখা আবশ্যক। অন্যের ক্ষতি করে বা অন্যেও প্রাণ হরণ করে কখনো নিজের মুক্তি কামনা করা অসম্ভব।

১.২. গর্ভপাত

গর্ভপাত বলতে ইচ্ছাকৃত ভাবে গর্ভস্থ ভ্রুণের প্রাণহানিকে বোঝায়। গর্ভকাল পূর্ণ হবার পূর্বেই ভ্রুণের মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবেও হয় যা গর্হিত বলে বিবেচিত হয় না। হত্যার আরেকটি রূপ হলো গর্ভপাত যা বর্তমান বিশ্বে প্রকট আকার ধারণ করেছে। ভ্রুণ হত্যাকে বোঝানো হয় গর্ভপাত। এটি একটি নৃসংশ ঘটনা বলে বিবেচিত। এটা মানবতাবিরোধী ধর্মবিরোধী কাজ। কেননা ভ্রুণ হত্যা মানে একটি জীবন্ত প্রাণের নাশ করা বোঝায়। গর্ভপাত সাধারণ হত্যার অর্ন্তভুক্ত হিসেবে বিবেচিত যা নিন্দনীয়। বৌদ্ধধর্ম মতে যে মুর্হূতে চেতনা গর্ভে প্রবেশ করে সেইদিন থেকে সেই ভ্রুণ জীবন্ত প্রাণী। *'সূত্র পিটক'* -এর *'সংযুক্ত নিকায়'* এ বুদ্ধ বলেছেন:

পঠমং কললং হোতি, কললা হোতি অব্বুদং,
অব্বুদা জাযতে পেসি, পেসি নিব্বত্ততী ঘনো।
ঘনা পসাখা জাযন্তি, কেসা লোমা নখাপিচ
যঞ্চস্স ভুঞ্জতী মাতা, অন্ন পানঞ্চ ভোজনং।[১৭]

অর্থাৎ, প্রথমে কলল বা তৈলবিন্দুর মতো হয়। কলল হতে অর্বুদ বা মাংসধৌত জলের মতো হয়। অর্বুদ থেকে পেশী জন্মে। পেশী হতে উৎপন্ন হয় ঘন নামক মাংসপিণ্ড। ঘন হতে প্রশাখা বা হাত পা প্রভৃতি অঙ্গ প্রতঙ্গ এবং কেশ, লোম, নখ ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। মা অন্নপান ভোজন যা পরিভোগ করে, তার মাধ্যমেই মাতৃগর্ভে সত্ত্ব জীবন ধারণ করে।

বুদ্ধ তাঁর প্রদর্শিত পঞ্চশীলের প্রথম শীলে প্রাণিহত্যা থেকে বিরত থাকার কথা বলেন।[১৮] এখানে প্রাণী বলতে জন্মের পরের জীব বা সত্ত্বা মাত্র নয় বরঞ্চ সব সচেতন জীব বা সত্ত্বাকে অভিহিত করা হয়েছে যার মধ্যে গর্ভভ্রুণও অর্ন্তভূক্ত রয়েছে। বুদ্ধের মতে, গর্ভধারণের সময়কাল থেকে চেতন শুরু হয়। *'মধ্যম নিকায়'* গ্রন্থের *'মহাতৃষ্ণাসংক্ষয় সূত্র'*-এ উক্ত রয়েছে মাতা-পিতা যদি মিলনের সময় গর্ভধারণ হয় এবং পূর্বচেতনা (গন্ধব্ব) উপস্থিত থাকে তবে নতুন জীবনের শুরু হয়।[১৯] প্রাণী এই ভ্রুণ নষ্ট করা মানে পূর্ণ বয়স্ক কাউকে হত্যা করার মত জঘন্য অপরাধ। এই অপরাধ

অনেক সময় অজ্ঞতার কারণে, আবার অনৈতিক সম্পর্কের জন্য যা ব্যভিচার হিসেবে গণ্য। এই ভ্রূণ হত্যা মহাপাপ। কখনো বা মেয়ে শিশু হওয়ার কারণেও ভ্রূণ হত্যা করা হয়। *'করনীযা মেত্তা'* সুত্তে বুদ্ধ বলেছেন:

" দিট্ঠা বা যেব অদি্টঠা, যে ব দূরে বসন্তি অবিদূরে
ভূতা ব সম্ভবেসী ব সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা।"[২০]

অর্থাৎ, যে সকল প্রাণী দৃশ্য ও অদৃশ্য, যারা দূরবাসী বা সমীপবাসী আর যারা জন্মেছে বা জন্মাবে, সেই সকল প্রাণী সুখী হউক।

এখানে বুদ্ধের দৃষ্টিতে জীব বা প্রাণিহত্যা গুরুতর অপরাধ। যার ফলে ভবিষ্যতে গুরুতর ফল ভোগ করা হতে পারে। গর্ভপাতের মাধ্যমে জীবনকে নষ্ট করলে ও তারফল ভোগ করা হতে পারে। সুতরাং যারা জন্মাবে তারাও যেন সুখী হয় সকলেরই মঙ্গল কামনা করা হয়েছে।

১.৩. আত্মহত্যা

বুদ্ধ জীবনকে মহামূল্যবান মনে করতেন। কেননা, মানবজন্ম লাভের মাধ্যমেই একমাত্র দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ করা সম্ভব। আত্মহত্যা বা আত্মহনন নিন্দিত এবং পাপকর্ম হিসেবে বিবেচিত। এটি স্বেচ্ছায় নিজের জীবনের অবসান ঘটিয়ে ভবিষ্যত-এর দুঃখকে আরও বৃদ্ধি করে যার ফলশ্রুতিতে পুর্নজন্মচক্র চলমান থাকে। আত্মহত্যা কখনো সমাধান হতে পারে না। সকল পরিস্থিতিতে নিজেকে মোকাবেলা করার মতো গড়ে তুলতে হবে। আর নিজেকে ভালোবাসার মাধ্যমে সকল প্রাণের প্রতি ভালোবাসা জাগিয়ে তুলতে হবে। বিশেষ করে মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। বৌদ্ধধর্মে আত্মহত্যা গর্হিত কাজ হিসেবে দেখা হয়। বৌদ্ধশাস্ত্র এবং দর্শনে আত্মহত্যার পক্ষে কোন সমর্থন নেই। এ প্রসঙ্গে এই উক্তিটি যথার্থ :

> 'Suicide is becoming a common phenomenon of the present century. Persons suffering from many difficulties like tension, anxiety, failures, psychological imbalances, hazards, separations, etc. might kill himself or herself in the hope of something less intolerable after death; yet there is no guarantee that matters may not be made worse by his act.[২১]

অবসাদ থেকে মানুষ নিজেকে বিপথে পরিচালিত করে। নিজের জীবনের প্রতি ভালোবাসা শূণ্যেও কোটায় চলে যায়। *'সুত্তনিপাত'* গ্রন্থের *'পরাভব সূত্রে'* বুদ্ধ বলেছেন:

নিদ্দাসিলী সভাসীলি, অনুটঠাতা চ যো নরো,
অলসো কোধমঞ্ঞানো, তং পরাভবতো মুখং।[২২]

অর্থাৎ, ঘুমপ্রিয়, আড্ডাবাজ, অলস, উদ্যেমহীন, ক্রোধীদের পরাজয় ঘটে।

'সংযুক্তনিকায়' গ্রন্থের *'প্রিয়সূত্র'* ও *'মল্লিকা সূত্রে'* 'নিজেকে ভালোবাসতে এবং নিজেকে গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে। নিজেকে ভালোবাসলে ব্যক্তি কখনো আত্মহত্যা করতে পারে না।[২৩] *'ধর্মপদ'* গ্রন্থের *'আত্মবর্গে'* বুদ্ধ বলেছেন :

'অত্তাহি অত্তনা নাথো'।[২৪] অর্থাৎ, নিজেই নিজের আশ্রয়। এখানে বুদ্ধ নিজেকে রক্ষা করতে বলেছেন অন্য কেউ রক্ষা করবে না। নিজেকে ধ্বংস করতে বলেননি। *'মধ্যম নিকায়'* গ্রন্থের *'মাগন্ধিয় সূত্রে'* এ বিষয়ে উক্ত রয়েছে যে ব্যক্তি দুঃখে আত্মহত্যা বা আত্মহনন করে প্রকৃতপক্ষে সে দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে না। কারণ দুঃখের মূল লোভ-দ্বেষ-মোহ, আসক্তি এবং অজ্ঞতা অবশিষ্ট থাকে। তাই নতুন জন্ম ও কর্মফল ভোগ করতে থাকবে।[২৫] এখানে বুদ্ধ বোঝাতে চেয়েছেন যদি কেউ আসক্তিমুক্ত এবং নির্বাণের দ্বারপ্রান্তে থাকে তবে তার মৃত্যুকে সাধারণ আত্মহত্যার মতো ধরা হয় না। বুদ্ধের উক্ত শিক্ষাপদগুলো একজন ব্যক্তি অনুসরণ করে চললে সে কখনো হতাশাগ্রস্থ হবে না এবং নিজেকে ভালোবাসার ফলে কখনো প্রাণনাশের চেষ্টা করবে না।

১.৪. মানসিক হত্যা

মানসিক হত্যা হলো কথার মাধ্যমে ব্যক্তিকে মানসিক আঘাত বা নির্যাতন করা। অর্থাৎ, যার মাধ্যমে মানুষের আত্মবিশ্বাসকে হত্যা করা হয়। নিজে সুখী হতে চাইলে বুদ্ধ কাউকে কথা দিয়ে মানসিক আঘাত দেওয়া থেকে বিরত থাকতে বলেন।[২৬] মানসকি আঘাত বা নির্যাতন করা থেকে বিরত থাকার জন্য বুদ্ধ চার প্রকার[২৭] শুদ্ধ জীবন অবলম্বনের কথা বলেন। যথা: ক. মিথ্যা কথা, খ. পরনিন্দা, গ. আঘাত বা নির্যাতনমূলক কথা, এবং সম্প্রলাপ বা অনর্থক বাক্য। মানসিক হত্যা ব্যক্তির বেঁচে থেকেও যেন মৃত্যে ন্যায় জীবন অতিবাহিত করা। বুদ্ধ বলেছেন:

মনসা চে পদুট্ঠেন ভাসতি বা করোতি বা
ততো নং দুক্খমন্বেতি চক্কংব বহতো পদং।[২৮]

অর্থাৎ, পাপকর্মকারীকে শকটবাহী বৃষের পদানুগামী চক্রের মতো দুঃখ অনুসরণ করে।

মন পাপকর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তিকে সর্বদা মানসিক পীড়া দেয়। এমতাবস্থায় কায়-বাক্য-মনের সংযত হওয়া আব্যশক।[২৯] তাই দৃষ্টিভঙ্গি চিন্তাশক্তি সঠিক হওয়া উচিত যা মানসিক শান্তির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক বাক্য ও কর্মের ভূমিকা এই ক্ষেত্রে খুব প্রয়োজন। কেবল হাত দিয়ে মারলে হত্যা হয় না। মন দিয়েও কারও প্রতি আঘাত করলে পাপকর্ম সম্পাদিত হয়। যে ব্যক্তি অপরের প্রতি দ্বেষ বা হিংসা পোষণ করে নিজে কষ্ট পায় এবং অপরকেও দুঃখ-কষ্ট দেয়। *'ধর্মপদ'* গ্রন্থের *'অপ্রমাদ বর্গে'* বর্ণিত রয়েছে:

অপ্পমাদো অমতং পদং, পমাদো মচ্চুনো পদং,
অপ্পমত্তা ন মীযন্তি যে পমত্তা যথা মতা।[৩০]

অর্থাৎ, অপ্রমাদ নির্বাণ লাভের উপায়, প্রমাদ মৃত্যুর পথ; অপ্রমত্ত ব্যক্তিগণ অমর আর যারা প্রমত্ত তারা মৃতসদৃশ।

বুদ্ধের উপদেশের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো অহিংসা ভাব তথা প্রাণীর প্রতি সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা। যে ব্যক্তি প্রেম, সহানুভূতি ও ভালোবাসা ধারণ করে, তার অন্তরে প্রাণী প্রতি সহিংসতা বা অমঙ্গল চিন্তা বা কোনো ক্ষতি করার চিন্তা কখনো আসতে পারে না। শুধু মানুষ বা প্রাণীদের জন্য নয়, বরং প্রকৃতির প্রতিটি উপাদান, যেমন গাছপালা বা নদী-নালাও তার সহানুভূতির অন্তর্ভুক্ত। বুদ্ধের শিক্ষা অনুযায়ী, সহানুভূতি এবং ভালোবাসা দিয়ে এই পৃথিবীকে

একটি শান্তিপূর্ণ ও সুখী স্থানে পরিণত করা যায়। আজকের অশান্ত বিশ্বে, যেখানে যুদ্ধ, সহিংসতা, পরিবেশগত সংকট প্রতিনিয়ত ব্যক্তি তথা দেশ রাষ্ট্রের জন্য ব্যাধির আকার ধারণ করছে সেখানে বুদ্ধের শিক্ষার প্রয়োগিক দিক অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক নয় শুধু, অপরিহার্য।

২. নানাবিধ হত্যা প্রতিরোধে করণীয় দিকসমূহ

বুদ্ধের শিক্ষা অনুযায়ী প্রাণিহত্যা একটি মারাত্মক অপরাধ। প্রাণিহত্যার থেকে শুধু নিজেকে বিরত রাখা নয় বরং বুদ্ধের শিক্ষার মূল হলো প্রাণীর প্রতি গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি করা। তবেই সমাজ হয়ে উঠবে সকলের বসবাসের শান্তি ভূমি। বুদ্ধ শিক্ষা ধারার প্রতিফলিত রূপে নিচে তুলে ধরা হলো-

২.১. সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা

বুদ্ধ প্রাণীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। সমস্ত প্রাণীই দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি চায় শুধু তাই নয়, তাদেরও অনুভূতির অধিকার রয়েছে। যখন মানুষ একে-অপরের ভিন্নতা, বিশ্বাস, অপরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে এবং মূল্যবোধকে মেনে নেয়, তখন তাদের মধ্যে সহনশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বিষয়ে নিচের উক্তিটি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য :

অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে,
জিনে কদরিয দানেন সচ্চেনালিকবাদিনং।[৩১]

অর্থাৎ, ক্রোধকে অক্রোধ (ক্ষমা) দ্বারা জয় করবে, অসাধুকে সাধুতা দ্বারা জয় করবে, কৃপণকে দান দ্বারা জয় করবে, মিথ্যাবাদীকে সত্যবাক্য দ্বারা জয় করবে।

গাথাটি অপরের প্রতি সহানুভূতি, সদ্ভাব ও সম্প্রীতি বৃদ্ধির শিক্ষা দেয় একই সাথে ক্ষমার মাধ্যমে ব্যক্তির মহত্যের পরিচয় প্রদান করে। এ সম্পর্কে বুদ্ধের দেশনায় আরও বর্ণিত রয়েছে:

ন পরোপরং নিকুব্বেথ, নাতিমঞ্ঞেথ কত্থচি ন কিঞ্চি।
ব্যারোসনা পটিঘঞ্ঞা, নাঞ্ঞমঞ্ঞস্স দুক্খমিচ্ছেয্য।[৩২]

অর্থাৎ, পরস্পর পরস্পরকে বঞ্চনা করো না। কাউকে কায়-বাক্য দ্বারা ঘৃণা করো না এবং ক্রোধ ও হিংসার অধীন হয়ে কারো অনিষ্ট করো না।

বুদ্ধ প্রাণিহত্যা থেকে বিরত হওয়ার কথা বলেছেন। তিনি বলেন, কায়-বাক্য এবং মনে কারও মনে দুঃখ না দেওয়াই হলো বুদ্ধগণের উপদেশ।[৩৩] যার ফলে সহনশীলতার এই পর্যায়ে মানসিক স্থিরতা আসে এবং ক্রোধ থেকে মুক্তি দেয় যা সামাজিক শান্তি এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে। প্রাণিহত্যা শুধু জীবনের প্রতি অবিচার নয়, এটি আত্মার শান্তিকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে।

২.২. অহিংসা চেতনার বিকাশ

বুদ্ধের শিক্ষা অনুযায়ী, প্রকৃত শান্তি এবং আত্মিক মুক্তি আসবে তখনই, যখন সহিংসতা পরিহার পূর্বক সকল জীবনের প্রতি সহানুভূতি ও ভালোবাসা তৈরি হবে। প্রাণীহত্যা, এমনকি অন্য প্রাণিদের ক্ষতি বা কষ্ট দেওয়া যাবে না এতে সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হয়। কেননা, এই ধর্মের মূলশিক্ষা হলো অহিংসা। এ প্রসঙ্গে *'সুত্তনিপাত'* গ্রন্থের নিচের উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :

পাণং ন হনে ন চ ঘাতযেয্য, ন চানুজঞ্ঞা হনতং পরেসং;
সব্বেসু ভূতেসু নিধায দণ্ডং, যে থাবরা যে চ তসা সন্তি লোকে।[৩৪]

অর্থাৎ, প্রাণী হত্যা করবে না, প্রাণীহত্যার কারণও হবে না, অন্যকেউ হত্যা করলে অনুমোদন করবে না, ভীত ও নির্ভীক প্রাণীর প্রতি সমানভাবে করুণা করে হিংসা হতে বিরত হবে।

ত্রিপিটকের অন্তর্গত সূত্র পিটকের *'সংযুক্ত নিকায়'* গ্রন্থের *'অহিংসক সূত্রে'*-এর মাধ্যমে যে কায়-বাক্য-মনে হিংসা করে না, পরের অশুভ চিন্তা করে না, অমঙ্গল কামনা করে না সেব্যক্তিই অহিংসা পরায়ণ হয় বলে জানা যায়।[৩৫]

অহিংসা চর্চা ব্যক্তির সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধের অমৃত বাণীর মধ্যে রয়েছে:

ন তেন অরিযো হোতি যেন পানানি হিংসতি,
অহিংস সব্বপাণানং অরিযো'তি পবুচ্চতি।[৩৬]

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি প্রাণী হিংসা করে, সে কখনো মহৎ হতে পারে না। যিনি সর্বজীবের প্রতি হিংসা ত্যাগ করে মৈত্রীভাবাপন্ন হয়েছেন তিনিই মহৎ শ্রেষ্ঠ নামে অভিহিত হন।

অহিংসক ব্যক্তিজীবনে সুকৃতি অর্জনের মাধ্যমে উর্দ্ধস্থানে গমন করে। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধ বলেছেন, ' যে ব্যক্তি অহিংসাত্মক হয়, অপরকেও অহিংসাত্মক চিত্তসম্পন্ন হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে, অহিংসাপরায়ণের প্রতি সম্মতি প্রদানকারী হয় ও অহিংসাপরায়ণের গুণ ভাষণ করে সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করে।'[৩৭]

২.৩. মৈত্রী, করুণা, মুদিতা প্রদর্শন

প্রাণিহত্যা কিংবা তাদের প্রতি অশুভ চিন্তা মুক্ত হয়ে সকল প্রাণীর কষ্ট এবং দুঃখে দুঃখিত হওয়া। *'করণীয় মেত্তা* সূত্রে' বুদ্ধ বলেছেন:

" মাতা যথা নিযং পুত্তং, আযুসা একপুত্তমনুরক্খে;
এবম্পি সব্বভূতেসু, মানসং ভাবযে অপরিমানং।"[৩৮]

অর্থাৎ, মাতা যেমন নিজের গর্ভজাত একমাত্র পুত্রকে নিজের জীবন দিয়ে সকল প্রকার বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেন, তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমেয় মৈত্রীভাব পোষণ করতে বলেছেন।

মৈত্রী দ্বারা ভালোবাসা নিঃস্বার্থ পরোপকার, করুণা যখন অন্যের দুঃখ দেখে মনে দুঃখ উৎপন্ন হয় এবং তা দূর করার অভিপ্রায়, মুদিতা সহানুভূতি প্রশংসাসূচক আনন্দ বলা হয়। মুদিতা সকলের কল্যাণ কামনায় নিয়োজিত। সর্বদা

পরকে এবং নিজকে সমান বা এক বলে মনে করা। এ প্রসঙ্গে *'বোধিচর্য্যাবতার'* গ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি :

পরাত্মসমতামাদৌ ভাবয়েদেবমাদরাৎ
সমদুঃখসুখাঃসর্বে পালনীয়া ময়াত্মবৎ।[৩৯]

অর্থাৎ, পরকে নিজ এবং নিজকে পর বলে ভাবনা করা। অন্যপ্রাণীদের সুখ ও দুঃখ নিজের মতো করে তাদের প্রতিপালন করা। এখানে কোনো আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ধনী-দরিদ্র, শত্রু-মিত্র ভেদাভেদ নেই। এ বিষয়ে বুদ্ধের সর্বজনীন উপদেশ। যথা :

মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং, মানসং ভাবযে অপরিমাণং
উদ্ধং অধো তিরিযঞ্চ, অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।[৪০]

অর্থাৎ, জগতের সকল দিকে উপরে-নীচে, পার্শ্বে চারিদিকে যে সকল প্রাণীসমূহ আছে, তারা বাঁধাহীন ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অর্থাৎ শত্রুতা বর্জিত হোক। এ প্রসঙ্গে পালি বহির্ভূত *'পালি কাব্যে তেলকটাই গাথা'* গ্রন্থে বর্ণিত আছে:

লোকযেসু সকলেসু চ সব্ব সত্তা, মিত্তা চ মজ্ঝারিপুবন্ধজনা চ সব্বে
তে সব্বদা বিগতরোগভযা বিসোকা, সব্বং সুখং অধিগতা মুদিতা ভবন্তু।[৪১]

অর্থাৎ, সমগ্র ত্রিলোকে মিত্র, বন্ধু-বান্ধব, মধ্যস্থ অন্যান্য সকল প্রকার প্রাণী রোগহীন, ভয়হীন এবং শোকহীন হয়ে মুদিতা পরায়ণ হয়ে সকল সুখে সমৃদ্ধময় এবং পরলোকে সুখি হোক।

ফলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে, ঐক্যের বন্ধন রচিত হয় এবং সূচিত হয় পরস্পর সমৃদ্ধময় জীবনযাপন প্রণালী। মুদিতায় পরের সুখে সুখ ও দুঃখে দুঃখ অনুরণিত হয়।

২.৪. প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা

বুদ্ধের শিক্ষায় শুধু মানুষের প্রতি সহানুভূতি নয়, প্রকৃতি ও অন্যান্য প্রাণীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার গুরুত্ব রয়েছে। প্রতিটি জীবের একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে এবং তাদের হত্যা প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে। *'দীর্ঘ নিকায়'* গ্রন্থের *'চক্রবর্তী সিংহনাদ সূত্রে'* রাজার অনেকগুলো গুণাবলির কথা তুলে ধরা হয়, যেখানে একটি গুণ হলো পশু-পাখিদের হত্যা না করে তাদের যথাসম্ভব রক্ষা করা।[৪২]

পরিশেষে বলা যায়, অহিংস নীতি মেনে শৃঙ্খলিতভাবে জীবনযাপন করলে কখনো কোনোরকমে অপরাধ কাজ সম্ভব না। সুতরাং সুন্দর ও নির্মল আগামীর কথা চিন্তা করে পুত-পবিত্র কর্মকাণ্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখে জীবিকা নির্বাহ করলে জীবন সুখের হয়।

তথ্য নির্দেশিকা ও টীকা

১. ভদন্ত প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু, *সূত্র পিটকে অঙ্গুত্তর নিকায়*, পঞ্চম নিপাত (রাঙামাটি : রাজবন বিহার, ২০০৮), পৃ. ২০১

২. শ্রীধর্ম্মতিলক স্থবির, *সদ্ধর্ম রত্নাকর* (রেঙ্গুন বৌদ্ধ-মিশন প্রেসে মুদ্রিত, ১৯৩৬), পৃ. ৮৯

৩. ভদন্ত ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, ভদন্ত সুমন স্থবির, ভদন্ত বঙ্গিস ভিক্ষু, ভদন্ত অজিত ভিক্ষু, ভদন্ত সীবক ভিক্ষু, *অঙ্গুত্তর নিকায়*, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় প্রকাশ (রাঙ্গামাটি : বনভান্তে প্রকাশনী, ২০১৫), পৃ. ২৭১

৪. ভদন্ত বুদ্ধবংশ ভিক্ষু, *বিনয়পিটকে পারাজিকা*, প্রথম প্রকাশ (প্রজ্ঞাবংশ সর্দ্ধম গ্রন্থ প্রকাশনী) পৃ. ১০৩

৫. উদ্ধৃত, রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, *পালি সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড (ঢাকা : বংলা একাডেমী, ১৯৮০), পৃ. ৩১

৬. গিরিশচন্দ্র বরুয়া অনূদিত, *ধম্মপদ*, দ্বিতীয় প্রকাশ (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৭৭), পৃ. ৯৭

৭. জাতক : 'জাতক' বৌদ্ধদর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক ও নৈতিক উপাদান। এটি ত্রিপিটকের অন্তর্গত খুদ্দক নিকায়-এর একটি গ্রন্থ। যেখানে গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্মের কাহিনী বর্ণনা করা আছে।

৮. শ্রী ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত, *জাতক*, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ (করুণা প্রকাশনী, ১৩৯১ বাংলা) পৃ. ৮৭

৯. শীলানন্দ ব্রহ্মচারী অনূদিত, *সংযুক্ত নিকায়*, প্রথম খণ্ড (কলকাতা : ১৪০০ বাংলা), পৃ. ১১৩

১০. সাধনানন্দ মহাস্থবীর অনূদিত, *সুত্ত নিপাত* (রাঙ্গামাটি : ১৯৮৭), পৃ. ৩৭

১১. গিরিশচন্দ্র বরুয়া, *ধম্মপদ*, দ্বিতীয় প্রকাশ (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭) পৃ. ৪১

১২. প্রাগুপ্ত, পৃ. ১০২

১৩. পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির, শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, *মিলিন্দপ্রশ্ন* (কলকাতা : ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, ১৯৯৫), পৃ. ১৩৩

১৪. *ধম্মপদ*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ২১৩

১৫. শ্রী ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত, *জাতক*, চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ (করুণা প্রকাশনী, ১৩৯১ বাংলা), পৃ. ১২২

১৬. *ধম্মপদ*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৯৪

১৭. শীলানন্দ ব্রহ্মচারী অনূদিত, *সংযুক্ত নিকায়*, ১ম ও ২য় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ (রাঙ্গামাটি: সদ্ধর্মপ্রাণ দায়ক-দায়িকা, ২০০৯), পৃ. ১৩৮

১৮. ১ নং তথ্য নির্দেশিকা দ্রষ্টব্য

১৯. শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া অনূদিত, *মধ্যম নিকায়* (কলিকাতা : যোগেন্দ্র রূপসী বালা ত্রিপিটক বোর্ড, ১৯৪০), পৃ. ২৮৭-২৮৮

২০. *সুত্ত নিপাত*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৩৭

২১. Binodini Das and Amrita Das, Most Ven. Thich Nhat Tu, Most Ven. Thich Duc Thien, editer, *Mindful Leadership for a Sustainable Peace* (Vietnam : Hong Duc Publisher, 2019), p. 118-119

২২. *সুত্তনিপাত*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ২৫

২৩. *সংযুক্ত নিকায়*, ১ম ও ২য় খণ্ড, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৪৪-৪৬

২৪. *ধম্মপদ*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১০৭

২৫. ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত, *মধ্যম নিকায়*, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ (কলিকাতা : ১৩৯৪ বাংলা), প. ১৩১-১৪১

২৬. রণব্রত সেন অনূদিত, *ধম্মপদ*, দ্বিতীয় মুদ্রণ (কলকাতা : হরফ প্রকাশনী), পৃ. ৯১

২৭. ডক্টর বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী অনূদিত, *মজ্ঝিম নিকায়*, তৃতীয় খণ্ড (কলিকাতা : ধর্মধার বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশনী, ১৯৯৩), পৃ, ৮২

২৮. গিরিশচন্দ্র বরুয়া, *ধম্মপদ*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৩৯

২৯. *সংযুক্ত নিকায়*, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৪৫

৩০. গিরিশচন্দ্র বরুয়া, *ধম্মপদ*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৪৯

৩১. প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৩২

৩২. *সুত্ত নিপাত*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৩৭

৩৩. জ্যোতিপাল ভিক্ষু অনূদিত, *উদানং* (খাগড়াছড়ি : ২০১৩), পৃ. ৮-৯

৩৪. *সুত্ত নিপাত*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১০১

৩৫. *সংযুক্ত নিকায়*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১১৩

৩৬. গিরিশচন্দ্র বরুয়া, *ধম্মপদ*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৫০

৩৭. *অঙ্গুত্তর নিকায়*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুপ্ত, পৃ. ২৭৪

৩৮. *সুত্ত নিপাত*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৩৭

৩৯. শ্রীমৎ স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য ও শ্রীমৎ জ্যোতিঃপাল মহাস্থবির, *বোধিচর্য্যাবতার* (কোলকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০০৫), পৃ. ১১৭

৪০. *সুত্ত নিপাত*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৩৭

৪১. নীরু বড়ুয়া অনূদিত, *পালি কাব্যে তেলকটাহ গাথা*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা : মিজান পাবলিশার্স, ২০০৮), পৃ. ৩২

৪২. ভিক্ষু শীলভদ্র, *দীর্ঘ নিকায়*, তৃতীয় খণ্ড, তৃতীয় প্রকাশ (রাঙ্গামাটি : ২০০৭, সদ্ধর্মপ্রাণ দায়ক-দায়িকা), পৃ. ৫২

দ্বিতীয় অধ্যায় : চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বুদ্ধের প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতির প্রয়োগ

১. সমাজ বিনির্মাণে বুদ্ধের প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি

প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতিকে বুদ্ধের শিক্ষা-দর্শনের অন্যতম মৌলিক দর্শন বলা হয়। এটি ব্যক্তি, সমাজ, পরিবার সর্বোপরি রাষ্ট্র ব্যবস্থার সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রতীত্যসমুৎপাদ বৌদ্ধ দর্শনের এমন একটি চমৎকার বিষয় যেখানে জগতের প্রত্যেকটি সৃষ্টি কর্ম, সংকট সবকিছুরই যে কারণ রয়েছে তা এখানে বুদ্ধ সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছন। পৃথিবীতে কারণ বিনা কোন কার্য হয় না। প্রাত্যহিক জীবনে মানুষ যা কিছুই করছে প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা কারণ ব্যাখ্যা রয়েছে। তেমনি সমাজের শৃঙ্খলার যেমন কারণ আছে তেমনি শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণ আছে। নীতিটি কেবলমাত্র অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করে না, বরঞ্চ কারণ ও পরিনাম চক্রাকারে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যারও সমাধান করে। বুদ্ধ বলেছেন:

"ইমস্মিং সতি ইদং হোতি, ইমস্ম উপ্পাদা ইদং উপ্পজতি,
ইমস্মিং অসতি ইদং ন হোতি, ইমস্ম নিরোধা ইদং নিরুজ্ঝতি।"[১]

অর্থাৎ, এটা থাকলে ওটা হয়, এটার উৎপত্তিতে ওটার উৎপত্তি, এটা না থাকলে ওটা হয় না, টার নিরোধে ওটার নিরোধ হয়।

ফলে এই কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা থাকলে মানুষ নিজেকে বিপথে পরিচালিত করা থেকে নিজেকে বিরত রাখবে। সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। সমাজের অরাজকতা সৃষ্টির কারণ জেনে সহজে এর মূল উৎপাট করতে পারলে টেকসই সমাজ গঠিত হবে। যেহেতু প্রতীত্যসমুৎপাদের মতো সমাজের বিষয় গুলো চক্রাকারে আবর্তিত হয়ে চলেছে। যা এর এক একটি বিষয় সমাধানের মাধ্যমে সমাজের সংকট নিরশনে ভূমিকা পালন করবে। বৌদ্ধ দর্শনের এই গভীর তত্ত্বটি জগতের সমস্ত ঘটনা, সংকট ও পরিস্থিতির তৈরীর কারণ-কারণের শৃঙ্খলকে বিশ্লেষণ করে। বুদ্ধ প্রদর্শিত ১২টি কারণ[২] শুধু ব্যক্তিগত দুঃখেরই উৎস ব্যাখ্যা করে না, বরং সমাজের অস্থিরতা, অরাজকতা ও সংকটের মূল চিহ্নিত করে। সমাজজীবনের প্রত্যেকটি সংকট একটি অপরটির সাথে পরস্পরনির্ভরশীল যা প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতির মাধ্যমে অনুধাবন করা যায়। ফলে একটি সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের মাধ্যমে অপরটি সমাধান সহজ হয়। কোনো ঘটনা হঠাৎ কওে সংগঠিত হয় না বা ঘটে না। প্রতিটি ঘটনার পেছনে কোনো না কোনো কারণ রয়েছে। এমতাবস্থায় ঘটনার পেছনের কারণ বিশ্লেষণ অপরিহার্য। যাতে কারণ অনুসন্ধানের মাধ্যমে সঠিক কারণ উদঘাটন করে এর মূল বিশ্লেষণের আলোকে সমাধান করা যায়। কেননা, যথার্থ কারণ বিনা সমাধানে সঠিক ফল প্রাপ্ত হবে না।

এ বিষয়ে কারণ ও পরিনামের বাস্তবতা ও দায়িত্ববোধের একটি সারণি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

কোন কারণে সৃষ্ট ঘটনা/ঘটনার পেছনের মূল	কারণ অবলম্বণে সমাধান
অবিদ্যা→লোভ-দ্বেষ-মোহ→শোষণ→ বৈষম্য→সংঘাত, বিশৃঙ্খলা ও শান্তি	অবিদ্যা লোপ→পুত-পবিত্রতা→ মৈত্রী, করুণা ও সহানুভূতি→ ন্যায়বিচার

সারণি : ১

বুদ্ধের শিক্ষণীয় নীতি প্রতীত্যসমুৎপাদের আলোকে সমাজজীবনের সংকটের কারণ নিচে উপস্থাপন করা হলো:

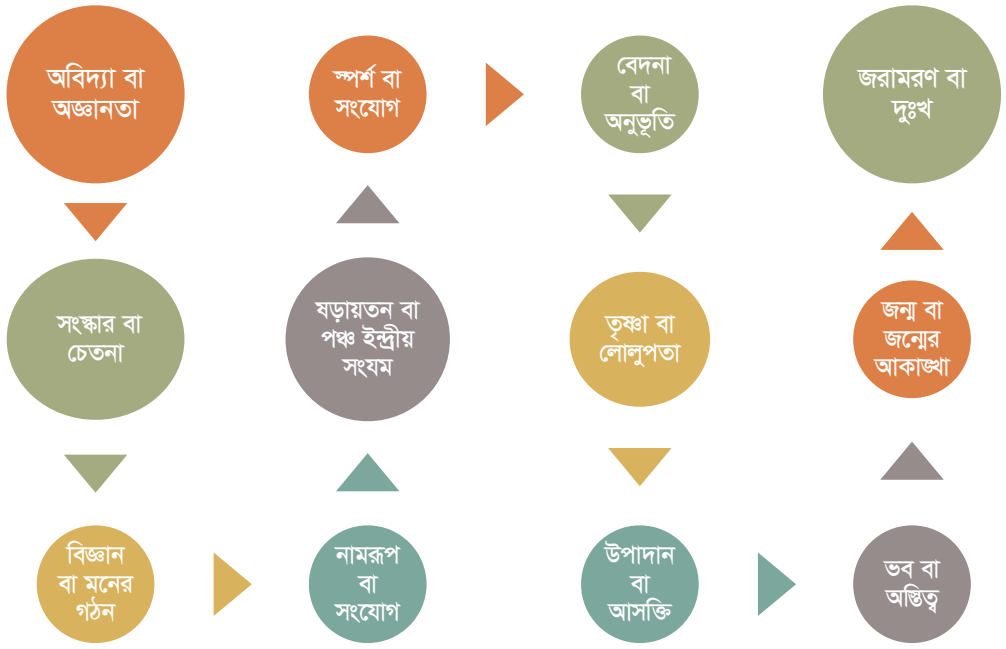

চিত্র ১ : প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি তত্ত্ব

ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন এ নীতির মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। নিচে ব্যক্তি ও সমাজজীবনের সংকটগুলোর প্রতীত্যসমুৎপাদভিত্তিক কারণ বিশ্লেষণ করা হলো:

১.১. অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা

'অবিদ্যা' হলো অজ্ঞানতা যা ভুল ধারণা, ভুল জ্ঞান এবং বিদ্যার বিপরীত। এটা সঠিক জ্ঞান জানতে দেয় না। ভুল শিক্ষায় সহায়তা করে। এটিকে যাপিতজীবনের মূল বিভ্রান্তি বলা হয়। অর্থাৎ, সঠিক জ্ঞানের অভাব। এ সম্পর্কে উল্লেখ আছে:

বিজ্জমানং অবিজ্জাপেতীতি
অবিজ্জামানং বিজ্জাপেতীতি অবিদ্যা।[৩]

অর্থাৎ, যার বিদ্যমানতায় অবিদ্যমানতা জন্মায় ও অবিদ্যমানতায় বিদ্যমানতা জন্মায় তাই অবিদ্যা।

অবিদ্যা কোনো কিছুর সঠিক বা প্রকৃত রূপ বুঝতে দেয়না, বরং বিপরীত ধারণা সৃষ্টি করে। আর এই সঠিক জ্ঞানের অভাব ব্যক্তিজীবনের পাশাপাশি সমাজজীবনেও উন্নতির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। কেননা, সমাজ জীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ধর্ম, জাতি, লিঙ্গ বা শ্রেণীভিত্তিক বিভেদ, বৈজ্ঞানিক চিন্তা, কুসংস্কার প্রভৃতি সম্পর্কে প্রকৃত ধারনার অভাবে সংকট তৈরী হয়। ফলে সমাজে সংঘাত সৃষ্টি হয় যা সমাজের অগ্রগতি পথে বাধা। ব্যক্তির সঠিক জ্ঞান জানার মাধ্যমে এর নিরসন সম্ভব। অবিদ্যার মূল খুজঁতে গিয়ে বুদ্ধ বলেছেন 'অবিদ্যার কারণ হচ্ছে পঞ্চ-নীবরণ'।[৪] নীবরণ হচ্ছে মনের আবরণ বা ঢাকনা যা বিষয়ের কার্য্যের স্বরূপ বুঝতে দেয়না এবং সত্য উদঘাটনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। মনের এই আবরণ দূর না হলে আধ্যাত্মিক অবনতির পাশাপাশি ব্যক্তি থেকে সমাজজীবনে এর প্রভাব পড়ে। সমাজের উন্নয়ন, সংস্কার, আধুনিকতা মেনে নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথে অন্তরায় হবে।

পঞ্চনীবরণ বা ৫ ধরনের বিষয় প্রতিবন্ধক রূপে কাজ করে। সেগুলো[৫] হলো:

পঞ্চনিবারণ	ব্যক্তিজীবনে প্রভাব	সমাজজীবনে প্রভাব
কামচ্ছন্দ (কামনা বাসনা)	ইন্দ্রিয়লালসা রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ-এর প্রতি আসক্তি। এগুলোকে পঞ্চকামগুণ বলা হয়	অর্থ, সুখ, পার্থিব বস্তুর প্রতি মোহ ও লোভ।
ব্যাপাদ (বিদ্বেষ এবং ক্ষতিকর চিন্তা)	ক্রোধ, ঈর্ষা, হিংসা ও ঘৃণার বশবর্তী হয়ে অন্যের ক্ষতি করা	শত্রুতা, সমাজে অস্থিরতা, বিদ্বেষ, জাতি বর্ণ নিয়ে সংঘাত
স্ত্যানমিদ্ধ (আলস্য এবং অবসাদ)	চিত্তের অলসতা, সংকোচতা, অস্পষ্টতা, অকর্মণ্যতা, অনুৎসাহ, অবসাদ	সমাজে অগ্রগতি ব্যাহত, যুবসমাজে উদ্যমহীনতা, অলসতা, দুর্নীতি বৃদ্ধি
ঔদ্ধত্য কৌকৃত্য (উদ্বেগ এবং অনুতাপ)	অস্থিরতা, মনে অশান্তি, মনের অনুশোচনা, আক্ষেপ, অনুতাপ, উৎকণ্ঠা	সমাজে মানসিক অস্থিরতা, হতাশা, হতাশা থেকে আত্মহত্যা প্রবণতা বৃদ্ধি
বিচিকিচ্ছা (সংশয় এবং দ্বিধা)	সংশয়, সন্দেহ, দ্বিমত, ভালো না মন্দ, সত্য না মিথ্যা, এটা না ওটা, মনের দোদুল্যমান অবস্থা	অন্ধবিশ্বাস, ধর্মীয় গোরামি, সংস্কারে বাধাঁ, উন্নয়নে বাধাঁ, প্রশ্চাৎপদগামীতা

সারণি : ২

উপরি-উক্ত আলোচনা পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় যে অজ্ঞানতাই সমাজে হিংসা, বৈষম্য ও ভুল নীতির জন্ম দেয়। এমতাবস্থায় তার জন্য প্রয়োজন সঠিক শিক্ষা ও সচেতনতা বাড়ানো।

১.১.১ সামাজিক জীবনে অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা-এর প্রভাব

অবিদ্যার প্রভাব সামাজিক জীবনে গভীর এবং বহুমুখী। অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা মিথ্যা জ্ঞানের মাধ্যমে বাস্তবতাকে অস্পষ্ট করে তোলে। নিচে এর কিছু প্রায়োগিক দিক উল্লেখ করা হলো :

কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের বিস্তার
অবিদ্যার কারণে ব্যক্তি সমাজের বহু অযৌক্তিক বিশ্বাস, কুসংস্কার এবং ভুল ধারনা পোষন করে। এটি সভ্যতার নতুন ধারনা প্রয়োগ করতে দেয় না এবং সামাজিক উন্নয়নে বাঁধা সৃষ্টি করে।
সাম্প্রদায়িকতা ও বিভেদ
অবিদ্যা মানুষকে ধর্ম, বর্ণ, জাতি বা গোত্রের ভিত্তিতে বিভক্ত করে। অজ্ঞতার কারণে মানুষ অন্যদের সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করে, যা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করে। আপন আভিজাত্যের অহং বোধে।
অসচেতনতা ও স্বাস্থ্যঝুঁকি
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ভুল তথ্য জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি সৃষ্টি করে। লিঙ্গবৈষম্য, শিশুশিক্ষার অবহেলা ইত্যাদি অজ্ঞতাজনিত সমস্যা সমাজে বিদ্যমান।
অপপ্রচার ও জনমত প্রভাবিত করা
অজ্ঞ মানুষ সহজেই মিথ্যা প্রচারণা, গুজব বা ভুল তথ্যের শিকার হয়, যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে দুর্বল করে। সমাজের কিছু ব্যক্তি অনেক সময় জনগণের অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ান।
নৈতিকতার অবক্ষয়
অবিদ্যার কারণে মানুষ সঠিক ও ভুলের পার্থক্য বুঝতে পারে না, ফলে দুর্নীতি, অসততা ও অনৈতিক কাজ বৃদ্ধি পায়। পরিবেশ ধ্বংস, পশুহত্যা বা অন্যায়কে সমর্থন করার পিছনেও অজ্ঞতা কাজ করে।
ব্যক্তিগত সম্পর্কে প্রভাব
অজ্ঞতা বা ভুল বোঝাবুঝির কারণে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কে টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়।

সারণি : ৩

সমাধানের উপায় হিসেবে শিক্ষার বহুল প্রসার বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিবাদী চিন্তার বিকাশ আবশ্যক। সচেতনতা বৃদ্ধি, গণমাধ্যম ও সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে সঠিক তথ্য প্রচার। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মাধ্যমে অবিদ্যা দূরীকরণের চেষ্টা। সামগ্রিকভাবে, অবিদ্যা সমাজের অগ্রগতিকে ব্যাহত করে, তাই এর থেকে মুক্তিলাভ জ্ঞানচর্চা ও সচেতনতাই একমাত্র উপায়।

১.২. সংস্কার বা চেতনা

চেতনাকেই সংস্কার বলা হয়। এখানে চেতনা অস্তিত্ব, চিন্তা, অনুভূতি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা মনের অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতা ও বোধের সমষ্টি। প্রতীত্যমসুৎপাদ এর প্রত্যেকটি অপরটির সাথে পারস্পরিক সংযুক্ত। তেমনি সংস্কার এর পূর্ববর্তী কারণ অবিদ্যা আর অবিদ্যার কারণ সংস্কার। অবিদ্যার কারণ সংস্কার বিষয় হলো[৬]:

- পুণ্যাভিসংস্কার-কামাবচর ও রূপাবচরের দানময় শীলময় ভাবনাময় কুশল চেতনা
- অপুণ্যাভিসংস্কার-কামাবচরের অকুশল চেতনা
- আনেঞ্জাভিসংস্কার-অরূপাবচরের কুশল চেতনা
- কায় সংস্কার-কায় সঞ্চেতনা

- বাক্য সংস্কার-বাক্য সঞ্চেতনা
- চিত্ত সংস্কার-মনো সঞ্চেতনা

সংস্কারের তিনটি লক্ষণ[৭] রয়েছে যেমন: এর উৎপত্তি স্পষ্ট, এর অবসান স্পষ্ট, এর পরিবর্তনশীলতা স্পষ্ট এর ফলে সমাজে লোভ, ক্ষমতার লড়াই, সাম্প্রদায়িক মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে। যার প্রভাব শোষণমূলক ব্যবস্থা যেমন: দুর্নীতি, অর্থনৈতিক বৈষম্য তৈরি করে। তাই নৈতিকতা ও সহমর্মিতার চর্চা প্রয়োজন খুব বেশী।

১.২.১. সামাজিক জীবনে সংস্কার বা চেতনা-এর প্রভাব

সংস্কার যা মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্তরে জমে থাকা প্রবণতা, অভ্যাস বা মানসিক ছাপকে নির্দেশ করে। এই সংস্কারগুলি চিন্তা, আচরণ ও সামাজিক সম্পর্ককে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সামাজিক জীবনে সংস্কারের প্রভাব নিম্নরূপ যথা :

ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচরণ গঠন

সংস্কার ব্যক্তির চিন্তা-ভাবনা, বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক সংস্কার মানুষকে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে প্ররোচিত করে তা হতে পারে বর্ণপ্রথা, জাতিভেদ এর মতো বিষয়।

সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথার স্থায়িত্ব

সংস্কার সমাজের ঐতিহ্য, রীতি-নীতি ও মূল্যবোধকে টিকিয়ে রাখে। অনেক সমাজে অন্ধবিশ্বাস সংস্কার হিসেবে রয়ে গেছে।

মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব: ইতিবাচক ও নেতিবাচক

ইতিবাচক সংস্কার সততা, পরোপকার, শ্রদ্ধা ইত্যাদি গুণাবলী বিকাশে সাহায্য করে। গুরু শিষ্য পরম্পরা বা পরিবারে বড়দের প্রতি সম্মান দেখানো। নেতিবাচক সংস্কার কুসংস্কার, জাতিভেদ, লিঙ্গবৈষম্য ইত্যাদি সামাজিক সমস্যার মূল হতে পারে। কোন বিশেষ ব্যক্তি বর্ণকে অশুভ মনে করা বা নির্দিষ্ট জাতির মানুষকে অস্পৃশ্য ভাবা।

সামাজিক পরিবর্তনে বাঁধা বা প্রেরণা

সংস্কার সমাজকে স্থিতিশীল রাখে কিন্তু অন্ধভাবে মেনে চলা প্রগতিকে বাঁধা দিতে পারে। নারীশিক্ষা, বর্ণ গোত্রের বিবাহের বিরোধিতার পিছনে পুরনো সংস্কার কাজ করে। আবার, পরিবেশ সংরক্ষণ বা প্রাণী অধিকারের মতো নতুন চেতনা ইতিবাচক সংস্কার গঠনে সাহায্য করে।

আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিকাশ

সংস্কার কর্মফল ও পুনর্জন্মের ধারণার সাথে যুক্ত। ভালো কাজ করলে ভালো সংস্কার তৈরি হয়, যা ভবিষ্যৎ জীবনকে প্রভাবিত করে (পুণ্য ও পাপের ধারণা)। ধ্যান, সৎচিন্তা ও সদাচরণের মাধ্যমে নেতিবাচক সংস্কার দূর করা যায়।

সারণি : ৪

সংস্কার নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তনের উপায় শিক্ষা ও যুক্তিবাদী চিন্তা বিজ্ঞানমনস্কতা ও সমালোচনামূলক চিন্তা দ্বারা কুসংস্কার দূরীকরণ। আধ্যাত্মিক চর্চা ধ্যান ও আত্মানুসন্ধানের মাধ্যমে মনের সংস্কার পরিষ্কার করা। সংস্কার ব্যক্তিগত ও

সামাজিক জীবনের একটি শক্তিশালী নিয়ামক। এটি ইতিবাচক হতে পারে আবার নেতিবাচকও। এর প্রভাব বুঝে সচেতনভাবে ভালো সংস্কার লালন করাই হলো সুস্থ সমাজগঠনের মূল চাবিকাঠি।

১.৩. বিজ্ঞান বা মনের গঠন

'বিজ্ঞান' বলতে মন, মনের অবস্থা বা গঠনকে বোঝায়। সাধারণ বিজ্ঞান ও বৌদ্ধধর্মে বর্ণিত বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বৌদ্ধধর্মে সংস্কারের কারণে বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়। এগুলো ছয়টি সংযোগে উৎপন্ন হয়। সেই ছয়টি সংযোগ হলো : চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান। মনের রাশিকৃত সংস্কারের প্রচ্ছন্ন শক্তি প্রভাবে যখন রূপের সাথে চক্ষু, শব্দের সাথে শ্রোত্র, গন্ধের সাথে ঘ্রাণ, রসের সাথে জিহ্বা এবং ভাবের সাথে চিত্ত মিলিত হয়, তখন যে অবস্থা প্রকাশ পায় তাই বিজ্ঞান।[৮] অর্থাৎ, ৬টি ইন্দ্রিয়-বস্তুর সংযোগ দ্বারা সৃষ্টি হয়। সেগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

বিজ্ঞানের লক্ষণ	উৎপন্ন অভিজ্ঞতা
চক্ষু-বিজ্ঞান	দর্শনেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে রূপের উপলব্ধি
শ্রোত্র-বিজ্ঞান	শব্দের শ্রবণ
ঘ্রাণ-বিজ্ঞান	গন্ধের অনুভূতি
জিহ্বা-বিজ্ঞান	রসের স্বাদ
কায়-বিজ্ঞান	স্পর্শের অনুভূতি
মনোবিজ্ঞান	মানসিক উপলব্ধি ও ভাবের ধারণা

সারণি : ৫

যাপিত সমাজজীবনে উপরি-উক্ত ইন্দ্রিয়গুলো সম্পর্কে যথার্থ সজাগ থকলে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যাবে, বদলে যাবে সমাজের সামগ্রিক পরিবেশ। চক্ষু-বিজ্ঞান সমাজে সৌন্দর্যের মানদণ্ড সমাজে শোভন অশোভনের ধারণা তৈরি করে। বিভিন্ন প্রতীকীর মাধ্যমে সমষ্টিগত পরিচয় তৈরি করে। বিজ্ঞাপনে আকর্ষণীয় চিত্র ব্যবহার করে ভোক্তাচেতনা নিয়ন্ত্রণ। সামাজিক মিডিয়া যেখানে দেখা ও দেখানোর সংস্কৃতি প্রাধান্য পায়। শ্রোত্র-বিজ্ঞান (শ্রবণ) সমাজে কথ্য ও লিখিত শব্দের মাধ্যমে জ্ঞান, ইতিহাস ও মতাদর্শ প্রসার। বক্তৃতা, গান, সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে সমাজচেতনা গঠন। নৈতিকতা ঋদ্ধ বাণী শুনে সমষ্টিগত আবেগ তৈরি। ভিন্ন ধরণের বার্তার মাধ্যমে জনমত প্রভাবিত করা। ঘ্রাণ-বিজ্ঞান (গন্ধ) সমাজে নির্দিষ্ট গন্ধের সাথে সম্প্রদায়ের সম্পর্ক (যেমন : ধূপ, পারফিউম, রান্নার ঘ্রাণ)। সুগন্ধি ব্যবহার করে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। যেমনি মন্দিরে ধূপের ঘ্রাণ ধর্মীয় ভাবাবেশ সৃষ্টি করে। জিহ্বা-বিজ্ঞান (স্বাদ) সমাজে খাদ্য সংস্কৃতি আঞ্চলিক খাবারের মাধ্যমে সম্প্রদায়ের পরিচয়। অর্থনৈতিক কাঠামো চা, কফি বা মসলার বাণিজ্য সমাজের শ্রেণিবিন্যাস তৈরি করেছে। উৎসব-অনুষ্ঠানে বিশেষ খাবারের রীতির মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধতা।

খাবারের মাধ্যমে সামাজিক মর্যাদা প্রকাশ। কায়-বিজ্ঞান (স্পর্শ) সমাজে শারীরিক সংযোগ আলিঙ্গন বা দূরত্বের মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্ক নির্ধারণ। সামাজিক নিষেধ, অস্পৃশ্যতা, লিঙ্গভিত্তিক স্পর্শের সীমাবদ্ধতা। হাত মেলানো ব্যবসায়িক বিশ্বাসের প্রতীক। স্পর্শের মাধ্যমে স্নেহ, ভালোবাসার পাশাপাশি অনৈতিক ইঙ্গিত প্রকাশ। মনোবিজ্ঞান (মানসিক ধারণা) সমাজে সামষ্টিক বিশ্বাস, ধর্ম, জাতীয়তাবাদ, রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তি। সংস্কার ও কুসংস্কার অশুভ বা পবিত্র ধারণা সমাজে প্রচলিত। গণতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্র সমাজের রাজনৈতিক চেতনার ফসল। জ্যোতিষশাস্ত্র বা ভাগ্য বিশ্বাসে সমাজের আচরণ প্রভাবিত। উদ্ভিদ যেমন বীজ ও বৃক্ষ, বৃক্ষ ও বীজ আকারে আবর্তিত হয়ে চলে, জীব-জগতও সংস্কার ও বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও সংস্কারে আবর্তিত হয়ে চলেছে। এর মূল শিক্ষা গোষ্ঠীগত ঘৃণা বা সংকীর্ণ চিন্তা, সমাজে সকল প্রকার কোন্দল দূর করতে অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন।

১.৩.১. সামাজিক জীবনে বিজ্ঞান বা মনের গঠন -এর প্রভাব

'বিজ্ঞান' শুধু বাহ্যিক জগতের অধ্যয়ন নয় এটি মানসিক প্রক্রিয়া, সিদ্ধান্তগ্রহণ ও সামাজিক আচরণকেও বিশ্লেষণ করে। মনোবিজ্ঞান, স্নায়ুবিজ্ঞান ও সংজ্ঞানাত্মক বিজ্ঞানের গবেষণা সামাজিক জীবনে নানাভাবে প্রয়োগ করা যায়। প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি অনুসারে, সবকিছুই কারণ-প্রতিক্রিয়ার জালে আবদ্ধ মনের গঠনও এই জালের অংশ। সমাজ জীবনে বিজ্ঞানের প্রভাব নিম্নরূপ। যেমন :

ব্যক্তিত্ব গঠন ও সামাজিক আচরণ

প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতির প্রধান বিষয় প্রতিটি বিষয় পূর্বের কারণ দ্বারা প্রভাবিত। ব্যক্তির আচরণ বিকাশে ইতিবাচক পরিবেশ নিশ্চিত করা। অপরাধপ্রবণতা কমানোর জন্য সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক হস্তক্ষেপ।

সামাজিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ

বৌদ্ধদর্শনে এটি অনাত্মবাদ-এর সাথে সম্পর্কিত পরস্পর নির্ভরশীল। দ্বন্দ্ব নিরসনে সক্রিয় শোনার কৌশল। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বিভ্রান্তি কমাতে প্রশিক্ষণ।

শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতি

বৌদ্ধধর্মে এটি শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা (নৈতিকতা, ধ্যান, প্রজ্ঞা) চর্চার মাধ্যমে বিকশিত হয়।

মানসিক স্বাস্থ্য ও সামাজিক কল্যাণ

প্রতীত্যসমুৎপাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সমস্ত দুঃখের মূলে আছে অজ্ঞানতা (অবিদ্যা)। সমাজে মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়ানো।

নৈতিকতা ও আইনের প্রয়োগ

বৌদ্ধদর্শন -এ পঞ্চশীলের মাধ্যমে নৈতিকতার মূলভিত্তি প্রদান করে। মনেরগঠন বোঝার মাধ্যমে ব্যক্তিগত উন্নয়ন ও শিক্ষাকে কার্যকর করা যায়। সামাজিক সমস্যা (অপরাধ, কুসংস্কার) কমাতে পারি। প্রযুক্তি ও নীতিনির্ধারণকে মানব-বান্ধব করতে পারি।

সারণি : ৬

১.৪. নামরূপ বা সংযোগ

'নামরূপ' শব্দটির সাথে দুইটি বিষয় পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। 'নাম' এবং 'রূপ' এখানে নাম বলতে ব্যক্তির মানসিক অবস্থা ও রূপ বলতে শারীরিক অস্তিত বোঝায়। উল্লেখ আছে, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, স্পর্শ ও মনস্কারকে নাম বলে আর চার মহাভূত (পৃথিবী ধাতু, আপধাতু, তেজ ধাতু ও বায়ু ধাতু) ও এর থেকে উৎপন্ন রূপকে রূপ বলে।[৯] নামরূপ বা সংযোগের কারণে জাতিগত বা ধর্মীয় পরিচয়ের অতিমাত্রায় গুরুত্ব ফলে সহিংসতা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি হতে পারে।

১.৪.১. সামাজিক জীবনে নামরূপ বা সংযোগ-এর প্রভাব

'নামরূপ' বৌদ্ধ দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা, যা পঞ্চস্কন্ধের (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান) মাধ্যমে ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক অস্তিত্বকে বোঝায়। এটি মানুষের স্বরূপ, আচরণ এবং সামাজিক সম্পর্ককে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সামাজিক জীবনে নামরূপের প্রায়োগিক দিকগুলো হলো :

আত্ম-সচেতনতা ও ব্যক্তিত্ব গঠন

নামরূপের বিশ্লেষণ ব্যক্তিকে তার শারীরিক (রূপ) ও মানসিক (নাম) উপাদানগুলি বুঝতে সাহায্য করে। এটি আত্ম-সচেতনতা বাড়ায়, যা ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন ও আত্মবিশ্বাস তৈরিতে সহায়ক।

সামাজিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ

নামরূপের ধারণা মানুষকে অন্যের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা বুঝতে সহায়তা করে, যা সহানুভূতি ও কার্যকর যোগাযোগের ভিত্তি।

দায়িত্ববোধ ও নৈতিক আচরণ

নামরূপের পরিবর্তনশীলতা (অনিত্য) বোঝার মাধ্যমে মানুষ সামাজিক দায়িত্ব ও নৈতিকতা সম্পর্কে সচেতন হয়।।

সামাজিক দ্বন্দ্ব নিরসন

নামরূপের বিশ্লেষণ দ্বন্দ্বের মূল কারণ চিহ্নিত করতে সাহায্য করে।

সমাজে অবদান ও সহযোগিতা

নামরূপের অন্তর্নিহিত নির্ভরশীলতা মানুষকে সমাজের সাথে যুক্ত হতে উদ্বুদ্ধ করে।

সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট

অনেক সমাজে নামরূপের ধারণা আধ্যাত্মিক চর্চা বা ঐতিহ্যের মাধ্যমে প্রভাব ফেলে। নামরূপের বোঝাপড়া ব্যক্তিগত বিকাশ থেকে শুরু করে সামষ্টিক সামাজিক সুস্থতায় গুরুত্বপূর্ণ। এটি মানুষের আচরণ, সম্পর্ক ও সমাজের গতিশীলতাকে একটি বিজ্ঞানসম্মত ও দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করে যা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে সুখী ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গঠন সম্ভব।

সারণি : ৭

১.৫. ষড়ায়তন বা পঞ্চ ইন্দ্রিয় সংযম

নাম-রূপের কারণে আবির্ভাব হয় 'ষড়ায়তন'। এখানে চক্ষু আয়তন, শ্রোত্র আয়তন, ঘ্রাণ আয়তন, জিহ্বা আয়তন, কায়-আয়তন, এবং মন আয়তন এই ছয়টি ইন্দ্রিয়ের কাজ লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ, ষড়ায়তন হলো বৌদ্ধদর্শনের একটি মৌলিক ধারণা, যা ছয়টি ইন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় ও মন) এবং তাদের সংশ্লিষ্ট বাহ্যিক বিষয় (রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও মন) এর পারস্পরিক সম্পর্ককে নির্দেশ করে।[১০] ষড়ায়তন বা পঞ্চ ইন্দ্রিয় সংযম -এর কারণে অনেক সময় মিথ্যা প্রচার বেড়ে যায় এবং সামাজিক মাধ্যমের নেতিবাচক ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। ফলে জনমতে বিভ্রান্তি ও মিথ্যা প্রচার বিশৃঙ্খলা তৈরি করে। ব্যক্তির সকল তথ্যের নৈতিকতা ও বিচারশক্তি তৈরি করতে হবে

১.৫.১. সামাজিক জীবনে ষড়ায়তন বা পঞ্চ ইন্দ্রিয় সংযম- এর প্রভাব

সমাজজীবনে বুদ্ধ নির্দেশিত ষড়ায়তন বা ইন্দ্রিয় সংযমের প্রভাব বেশ লক্ষণীয়। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষ বিশ্বকে উপলব্ধি করে এবং সামাজিক নানারকম আচরণ গঠন করে। সমাজজীবনে এটির প্রভাব নিচে উপস্থাপিত হলো :

ইন্দ্রিয়-নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক শৃঙ্খলা ইন্দ্রিয়গুলোর সঠিক ব্যবহার ব্যক্তির আত্ম-নিয়ন্ত্রণ বাড়ায়, যা সামাজিক শান্তি বজায় রাখতে সহায়ক। শব্দ (কর্ণ) ব্যক্তি অপপ্রয়োগে মন্দ কথা শোনে, তা বিবাদ সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয়ের সংযম সমঝোতা বাড়ায়। রূপ (চক্ষু) দৃষ্টির মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে মানুষ পক্ষপাতিত্ব করতে পারে, কিন্তু সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে।
যোগাযোগ ও সামাজিক সম্পর্ক ইন্দ্রিয়গুলোর মাধ্যমে অন্যেও সাথে সংযোগ স্থাপিত হয়। এটির সঠিক ব্যবহার কার্যকর যোগাযোগের ভিত্তি। মন (ধর্ম/বিষয়) মানসিক সংবেদনশীলতা অন্যের ভাবনা বুঝতে পারা যা সুসম্পর্ক গড়ে তোলে। স্পর্শ (কায়) শারীরিক ভাষা সামাজিক বন্ধন শক্তিশালী করে।
ভোগবাদ ও সামাজিক সমস্যা ইন্দ্রিয়ের অতৃপ্তি (লোভ, আসক্তি) ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যা (ভোগবাদ, পরিবেশ ধ্বংস) সৃষ্টি করে। রস (জিহ্বা) অতিভোজন বা মাদকাসক্তি স্বাস্থ্য ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর। গন্ধ (নাসিকা) সুগন্ধির প্রতি আসক্তি বাড়াতে পারে।
শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রেরণা ইন্দ্রিয়ানুভূতি শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার মূল মাধ্যম। শব্দ (কর্ণ) সঙ্গীত, ভাষা ও কথোপকথন সাংস্কৃতিক পরিচয় গঠন করে। রূপ (চক্ষু) শিল্পকলা ও স্থাপত্য জাতীয় ঐতিহ্য বহন করে।
সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য সমতা ন্যায়বিচার উভয়ই তৈরি করতে পারে। মন (ধর্ম) কুসংস্কার বা গুজব (মিথ্যা ধারণা) সামাজিক বিভেদ সৃষ্টি করে। স্পর্শকে(কায়), অস্পৃশ্যতা বর্ণবৈষম্য ইন্দ্রিয়-ভিত্তিক বিভেদের ফল বলা হয়।
প্রযুক্তি ও আধুনিক সামাজিক প্রভাব তথ্য প্রযুক্তির যুগে ইন্দ্রিয়গুলোর ব্যবহার নতুন সামাজিক গতিশীলতা তৈরি করেছে। চক্ষু ও কর্ণ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তথ্য প্রাপ্তি (কখনও ভুল বা প্রভাবশালী)। ফলে মন ভার্চুয়াল সম্পর্ক বনাম বাস্তব সম্পর্কের দ্বিধা দ্বন্দ্ব তৈরি হয়।

সারণি : ৮

ষড়ায়তনের সঠিক বোঝাপড়া ও ব্যবহার ব্যক্তিগত শৃঙ্খলা, সামাজিক সম্প্রীতি এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ। ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযত ও সচেতনভাবে ব্যবহার করে একজন ব্যক্তি যেমন নিজের জীবন উন্নত করতে পারে, তেমনি সমাজেও ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। বৌদ্ধদর্শন অনুসারে, ইন্দ্রিয়-নিয়ন্ত্রণ হলো জ্ঞান ও নৈতিকতার ভিত্তি, যা একটি সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গঠনের চাবিকাঠি।

১.৬. স্পর্শ বা সংযোগ

স্পর্শের উৎপত্তি হয় ষড়ায়তনের দ্বারা। 'স্পর্শ' বলতে মানসিক প্রক্রিয়ার উপর বেশি জোড় দেওয়া হয়েছে। এটিকে সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া বলা হয়। এখানে পূর্বোক্ত এক একটি আয়তন এক একটি স্পর্শের উৎপন্ন করে। অর্থাৎ, চক্ষু আয়তন, চক্ষু সংস্পর্শের, শ্রোত্রায়তন শব্দ সংস্পর্শেও, ঘ্রাণায়তন গন্ধ সংস্পর্শের, জিহ্বায়তন আস্বাদ সংস্পর্শের, কায়ায়তন কায়িক সংস্পর্শের এবং মনায়তন মানসিক সংস্পর্শের কারণে হয়ে থাকে।[১১]

১.৬. ১. সামাজিক জীবনে স্পর্শ বা সংযোগ- এর প্রভাব

'স্পর্শ' বৌদ্ধদর্শনে একটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ধারণা, যা কেবল শারীরিক স্পর্শকেই নির্দেশ করে না, বরং ইন্দ্রিয় (কায়) ও বাহ্যিক বস্তুর মিলনের মাধ্যমে উদ্ভূত অভিজ্ঞতা-কে বোঝায়। এটি ব্যক্তির অনুভূতি, আবেগ, সম্পর্ক এবং সামাজিক আচরণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

শারীরিক স্পর্শ ও সামাজিক বন্ধন

মানবিক সম্পর্কে শারীরিক স্পর্শের ভূমিকা অপরিসীম। সান্ত্বনা, হাত মেলানো, কোলাকুলি বা পিঠ চাপড়ানো মানসিক সমর্থন জোগায়। সম্মান প্রকাশে প্রণাম বা নমস্কার সামাজিক শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা প্রকাশ করে।

স্পর্শের মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব

স্পর্শের মাধ্যমে সৃষ্ট অনুভূতি মানুষের মানসিক অবস্থা ও সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। ইতিবাচক উষ্ণ স্পর্শ উদ্বেগ কমায় এবং অক্সিটোসিন বা ভালোবাসার হরমোন নিঃসরণ বাড়ায়। আবার নেতিবাচক অস্বস্তিকর স্পর্শ আক্রমণাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

সামাজিক নিষেধ ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট

সমাজভেদে স্পর্শের গ্রহণযোগ্যতা ভিন্ন ভন্ন হয়। রক্ষণশীল সমাজ লিঙ্গভেদে স্পর্শে নিষেধাজ্ঞা। স্পর্শ কেবল একটি শারীরিক সংযোগ নয়, এটি সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক স্তরে অস্তিত্বকে প্রভাবিত করে।

সারণি : ৯

স্পর্শের সঠিক ব্যবহার সামাজিক সম্প্রীতি, মানসিক সুস্থতা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। বৌদ্ধ দর্শনের ইন্দ্রিয় সংবর (ইন্দ্রিয়-নিয়ন্ত্রণ) অনুসারে, স্পর্শের প্রতি সচেতনতা সম্যক আজীবন (সঠিক জীবিকা) ও সম্যক প্রচেষ্টা (সঠিক প্রচেষ্টা)-এর দিকে পরিচালিত করে, যা একটি সহানুভূতিশীল সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি।

১.৭. বেদনা বা অনুভূতি

বেদনার প্রকাশ হলো অনুভূতির দ্বারা। এটি হতাশা ও ক্রোধ বৃদ্ধি করে। স্পর্শ থেকে ছয় প্রকারে বেদনা উৎপন্ন হয়। চক্ষু-সংস্পর্শজ বেদনা, শ্রোত্র-সংস্পর্শজ বেদনা, ঘ্রাণ-সংস্পর্শজ বেদনা, জিহ্বা-সংস্পর্শজ বেদনা, কায়-সংস্পর্শজ বেদনা, মনোসংস্পর্শজ বেদনা।[১২] অর্থাৎ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মন এই ইন্দ্রিয়গুলোর দ্বারা যে অনুভূতি উৎপন্ন হয় তাই বেদনা। বেদনা প্রধানত তিন প্রকার ১. সুখ বেদনা, ২. দুঃখ বেদনা, ৩. উপেক্ষা বেদনা এবং সৌমনস্য বিষেশ্য ভেদে সুখময় বেদনা ও দৌর্মনস্য ভেদে দুঃখময় বেদনা সহ মোট পাঁচ প্রকার বেদনার উল্লেখ আছে।[১৩]

১.৭.১. সামাজিক জীবনে বেদনা বা অনুভূতি- এর প্রভাব

বৌদ্ধদর্শনে বেদনা হল পঞ্চস্কন্ধের দ্বিতীয় স্তর, যা সকল প্রকার অনুভূতি (সুখ, দুঃখ বা নিরপেক্ষ) কে অন্তর্ভুক্ত করে। এটি সমাজজীবনে সবাইকে প্রভাবিত করে।

সামাজিক সম্পর্ক গঠনে বেদনার ভূমিকা
ইতিবাচক বেদনা (সুখ) সহানুভূতি ও উদারতা বৃদ্ধি করে অন্যের সুখে অংশীদার হওয়া। সামাজিক বন্ধন শক্তিশালী করে উৎসবে অংশগ্রহণ। নেতিবাচক বেদনা (দুঃখ) সমবেদনার জন্ম দেয় বিপদগ্রস্তকে সাহায্য।

সংঘাত নিরসন ও সমবেদনা
বেদনার স্বীকৃতি (সবাই সুখ চায়, দুঃখ থেকে মুক্তি চায়) সংঘাত সমাধানের ভিত্তি। শ্রদ্ধা জানানো বিরোধে উভয় পক্ষের অনুভূতি বিবেচনা।

সামাজিক ন্যায়বিচার ও বেদনা
অনুভূতির ভিত্তিতে প্রতিবাদ। দুঃখ বেদনা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের শক্তি জোগায়।

প্রযুক্তি ও ভার্চুয়াল বেদনা
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সুখ বেদনার তাৎক্ষণিক প্রাপ্তি। আবার সাইবার বুলিং-এর মাধ্যমে দুঃখবেদনা সৃষ্টি।

বেদনার আধ্যাত্মিক প্রয়োগ
বৌদ্ধচর্চা বেদনাকে পর্যবেক্ষণ করে অনিত্য বোঝা (উপেক্ষা ভাবনা)। মৈত্রী ভাবনা সকল প্রাণীর সুখ কামনা। সামাজিক সর্বস্তরে শান্তি আন্দোলনের মাধ্যমে মৈত্রীর বার্তা ছড়ানো।

সারণি : ১০

বেদনা সামাজিক জীবনের একটি শক্তিশালী চালিকাশক্তি যা সঠিকভাবে বুঝলে ও পরিচালনা করলে ব্যক্তিগত পর্যায়ে আত্ম-সচেতনতা ও সামষ্টিক পর্যয়ে সহানুভূতিশীল সমাজ গঠন সম্ভব। বৌদ্ধদর্শনের 'সম্যক সংকল্প' (সঠিক উদ্দেশ্য) অনুসারে, বেদনাকে জ্ঞানের আলোকে দেখা মানেই সমাজে মঙ্গল সৃষ্টির পথ প্রশস্ত করা।

১.৮. তৃষ্ণা বা লোলুপতা

সংকটের একটি অন্যতম কারণ আছে যার মূলে রয়েছে তৃষ্ণা। তৃষ্ণা মানবসমাজকে সর্বনাশ করে। এটি ভোগবাদ ও শোষণকে উৎসাহিত করে। বুদ্ধ *'তৃষ্ণা বর্গে'* বলেছেন:

"যথাপি মূলে অনূপদ্দবে ফলহে ছিন্নোঁপি রুক্খো পুনরেব রুহতি।
এবম্পি তণ্হানুসয়ে অনূহতে নিবত্ততি দুক্খমিদং পুনপ্পুনং।"[১৪]

অর্থাৎ, মূল অনুৎপাটিত ও দৃঢ় থাকলে যেমন ছিন্ন গাছও আবার গজিয়ে উঠে, সেরূপ তৃষ্ণার মূল ছিন্ন না হলে দুঃখ পুনরায় উৎপন্ন হবে। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই তৃষ্ণার উৎপত্তি। অর্থাৎ, ছয়টি ইন্দ্রিয় ছয় প্রকার তৃষ্ণা তৈরী করে। চক্ষু ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপ তৃষ্ণা, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয় দ্বারা শব্দ তৃষ্ণা, ঘ্রাণ ইন্দ্রিয় দ্বারা গন্ধ-তৃষ্ণা, জিহ্বা-ইন্দ্রিয় দ্বারা রস তৃষ্ণা, কায় ইন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শ তৃষ্ণা, মন ইন্দ্রিয় দ্বারা ধর্ম তৃষ্ণা।[১৫] যার মাধ্যমে ছয় প্রকার আসক্তি আসে। এই তৃষ্ণা ব্যক্তির মধ্যে অতিমাত্রায় লোভ ও ক্রোধ সৃষ্টি করে।

১.৮.১. সামাজিক জীবনে তৃষ্ণা- এর প্রভাব

'তৃষ্ণা' বৌদ্ধদর্শনের চার আর্যসত্যের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত এটি শুধু ব্যক্তিগত দুঃখের উৎস নয়, সামাজিক সমস্যারও গভীর প্রভাবক। সামাজিক প্রেক্ষাপটে তৃষ্ণার প্রভাব ও তার ব্যবস্থাপনা বিশ্লেষণ করা হলো। যথা :

ভোগবাদ ও ভোগের সংস্কৃতি
অর্থনৈতিক প্রভাব এর অত্যধিক ভোগ (অতিতৃষ্ণা) পরিবেশ ধ্বংস, ঋণ সমস্যা ও অর্থনৈতিক অসমতা তৈরি করে। শিল্পের ক্ষতিকর প্রভাব (জলবায়ু পরিবর্তন, শ্রম শোষণ)।

সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া ও প্রতিযোগিতা
অহংকারের তৃষ্ণা সামাজিক মর্যাদার জন্য অতিযত্ন হতে পারে দামি গাড়ি, বাড়ি কেনার চাপ। ক্ষমতা বা সম্পদের জন্য সংঘাত।

সম্পর্ক ও আসক্তি
আবেগীয় তৃষ্ণা সম্পর্কে অতিনির্ভরতা বা মোহ। বিষময় ক্ষতিকর সম্পর্কে আটকে থাকা। যৌন লালসা, আসক্তি বা যৌন হয়রানির মতো সামাজিক সমস্যা।

ক্ষমতার লালসা
ক্ষমতার তৃষ্ণা দুর্নীতি, স্বৈরাচার ও যুদ্ধের মূলকারণ। সম্পদ বা অস্ত্রের জন্য দেশে দেশে সংঘাত। সাম্প্রদায়িকতা গোষ্ঠীগত শ্রেষ্ঠত্বের লালসা, জাতি, ধর্ম ইত্যাদি।

প্রযুক্তি ও ডিজিটাল আসক্তি
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লাইক, গেমিং বা অনলাইন শপিং আসক্তি। ডেটা লালসা কোম্পানিগুলোর ব্যবহারকারীর তথ্য সংগ্রহের তাগিদ।

তৃষ্ণার ইতিবাচক রূপান্তর
সমাজ উন্নয়নের জন্য আকাঙ্ক্ষা শিক্ষার প্রতি তৃষ্ণা। আধ্যাত্মিক পথ বৌদ্ধ অষ্টাঙ্গিক মার্গে সম্যক সংকল্প (সঠিক ইচ্ছা) চর্চা।

সারণি : ১১

তৃষ্ণা যেমন সমাজে সংঘাত ও অসমতার কারণ, তেমনি এর সচেতন ব্যবস্থাপনা সামষ্টিক শান্তির পথও খুলে দিতে পারে। বুদ্ধের তৃষ্ণার নিরোধ বা দুঃখ সমাপ্তির শিক্ষা সামাজিক স্তরে প্রয়োগ করে একটি সুষম অর্থনীতি (অতিভোগ নয়, প্রয়োজন পূরণ), সহানুভূতিশীল সম্পর্ক (আসক্তি নয়, আন্তরিকতা), নৈতিক প্রযুক্তি (ডিজিটাল সুস্থতা)।

১.৯. উপাদান বা আসক্তি

উপাদান বা আসক্তি ব্যক্তি মনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। তৃষ্ণার প্রবল চাহিদা উপাদানের কারণ। উপাদানের বর্ণনায় চার উপাদানের পরিচয় পাওয়া যায়। সেগুলো হলো ১. কাম-উপাদান, ২. দৃষ্টি-উপাদান, ৩. শীলব্রতপরামর্শ-উপাদান, ৪. আত্মবাদ-উপাদান।[১৬] উপর্যক্ত চার উপাদানের মধ্যে দৃষ্টি-উপাদান, শীলব্রতপরামর্শ-উপাদান, আত্মবাদ-উপাদান ও সাথে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ, তৃষ্ণা ছাড়া এই তিনটি উপাদান উৎপন্ন হতে পারে না। কাম-উপাদান এর ক্ষেত্রে রূপ, শব্দ, গন্ধাদি অবলম্বনের তৃষ্ণা প্রবল হয়ে কাম-উপাদান উৎপন্ন হয়। এজন্যই বলা হয় তৃষ্ণা উপাদানের কারণ।

১.৯.১. সামাজিক জীবনে উপাদান বা আসক্তি- এর প্রভাব

বৌদ্ধদর্শনে উপাদান হল তৃষ্ণার পরবর্তী স্তর, যেখানে লালসা দৃঢ় আসক্তিতে রূপ নেয়। এটি ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে গভীর সংকট সৃষ্টি করে। সামাজিক প্রেক্ষাপটে উপাদানের প্রভাব ও সমাধান নিয়ে একটি ধারণা নিম্নে আলোচনা করা হলো। যথা :

সামাজিক সম্পর্কে আসক্তি
অস্বাস্থ্যকর নির্ভরতা, সম্পর্কের মোহে আটকে থাকা, অপ্রত্যাশিত অসুখী বিবাহবন্ধন বা বন্ধুত্ব। এর প্রভাবে মানসিক নির্যাতন, আত্মসম্মান হারাতে হয়। আবার হতে পারে গোষ্ঠী আসক্তি গ্যাং কালচার বা চরমপন্থী গোষ্ঠীতে জড়িয়ে পড়া।

ভোগবাদ ও বস্তুর প্রতি আসক্তি
স্মার্টফোন, গেমিং, শপিং প্রতি আসক্তি।

ক্ষমতা ও মর্যাদার আসক্তি
ক্ষমতা ধরে রাখতে দুর্নীতি, হিংসা, একনায়কতন্ত্র। সামাজিক অবস্থান ব্যক্তির অনুসারীর সংখ্যার প্রতি আসক্তি ।

ধর্মীয়/আদর্শগত আসক্তি
অন্ধ বিশ্বাস, ধর্মীয় উগ্রবাদ, জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ববোধ। যা সাম্প্রদায়িক সহিংসতা বাড়ায়। কুসংস্কার অলৌকিক চিকিৎসা বা জ্যোতিষশাস্ত্রে অতিনির্ভরতা।

নেশাদ্রব্য ও রাসায়নিক আসক্তি
মাদক ও মাদকজাতীয় দ্রব্যের বিস্তার। সামাজিক অপরাধ বৃদ্ধি ও পরিবার ভাঙন। হিতাহিত জ্ঞান লোপ, পরিবারে অশান্তি সমাজের অবক্ষয়।

আধ্যাত্মিক সমাধান
বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি উপাদান ত্যাগের মাধ্যমে নিব্বান (মুক্তি) লাভ। ধ্যান করা এবং পঞ্চশীল পালন।

সারণি : ১২

উপাদান হল সমাজের অদৃশ্য শৃঙ্খল, যা ব্যক্তিকে পরাধীন করে, সমাজকে বিভক্ত করে। এর মোকাবিলায় প্রয়োজন ব্যক্তিগত সচেতনতা (ধ্যান, শিক্ষা)। সামষ্টিক প্রচেষ্টা, নীতি পরিবর্তন এবং সমর্থন।

১.১০. ভব বা অস্তিত্ব

'ভব' হলো জাগতিক অস্তিত্ব, হওয়া, সংসার বন্ধন, উৎপত্তি বা আবেগ প্রবণতা। কর্মভব ও উৎপত্তি ভব নামে ভব দুই প্রকার।[১৭] এটিকে সামাজিক কাঠামোর স্থায়িত্বরূপ বলা হয়। এখানে ব্যক্তি জীবনের সক্রিয় অংশ পূর্ব জন্মেও অবিদ্যা, সংস্কার, তৃষ্ণা, উপাদান ও ভব হলো কর্মভব আর ব্যক্তি জীবনের অব্যক্ত নিষ্ক্রিয় অংশ বিজ্ঞান, নাম, রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ ও বেদনা হলো উৎপত্তি ভব। কর্মভব ও উৎপত্তি ভব কর্ম ভেদে সুগতি ও দুর্গতি ফল প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ, এই ভব বা অস্তিত্বের মূলে আছে উপাদান তথা আসক্তি।

১.১০.১. সামাজিক জীবনে ভব বা অস্তিত্ব- এর প্রভাব

ভব বৌদ্ধ দর্শনে একটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ধারণা, যা শুধু ব্যক্তিগত পুনর্জন্মকেই নির্দেশ করে না, বরং সামগ্রিকভাবে সামাজিক অস্তিত্ব, সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠানগুলির গতিশীলতাকেও বোঝায়। সামাজিক প্রেক্ষাপটে ভবের প্রভাব ও তাৎপর্য নিম্নরূপ। যেমন :

সামাজিক ভূমিকা ও পরিচয়ের গতিশীলতা ভূমিকার বহুমুখিতা একজন ব্যক্তি একই সাথে পিতা-পুত্র, কর্মী, কর্তা এবং নাগরিক ইত্যাদি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। কর্মক্ষেত্রে নেতৃত্ব ও পরিবারে স্নেহশীল পিতার দ্বৈত ভূমিকা।
পরিচয়ের সংকট আধুনিক সমাজব্যবস্থাপনায় সামাজিক অবস্থান ও পেশার ভিত্তিতে পরিচয় নির্ধারণ। ব্যক্তিত্বের সংকট, আত্মপরিচয় হারানো
সামাজিক প্রতিষ্ঠানের গতিশীলতা পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকার-সবই ভবের নীতিতে চলমান।
সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন কল্যাণমূলক পরিবর্তন সামাজিক অগ্রগতির জন্য সচেতন প্রচেষ্টা।
সমষ্টিক কর্মফল সামাজিক কর্মের প্রভাবে সমষ্টিগত কর্ম সমাজের ভবিষ্যৎ গঠন করে। পরিবেশ দূষণের দীর্ঘমেয়াদী ফল। ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতা পূর্বপুরুষদের কর্মের প্রভাব বর্তমান সমাজে জাতিগত বৈষম্য, সাংস্কৃতিক ট্রমা।
প্রযুক্তি ও ভবিষ্যৎ সমাজ সামাজিক মাধ্যম ব্যক্তিত্ব, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাব, ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থান ও সামাজিক কাঠামো
আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ সমাজ হিসেবে আমাদের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য পারস্পরিক নির্ভরশীলতার স্বীকৃতি। বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি মুক্তির পথ।

সারণি : ১৩

ভব বা অস্তিত্বের সামাজিক দিকটি ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে গভীর সংযোগ বুঝতে সাহায্য করে । বর্তমান কর্ম ভবিষ্যৎ সমাজ গঠন করে সামাজিক পরিবর্তনের গতিশীল প্রকৃতি। বৌদ্ধদর্শনের আলোকে, সামাজিক ভব সম্পর্কে সচেতনতা দায়িত্বশীল নাগরিক হতে শেখায় সামষ্টিক কল্যাণে অবদান রাখতে উদ্বুদ্ধ করে, স্থিতিশীল সমাজ গঠনে সহায়তা করে।

১.১১. জন্ম বা জন্মের আকাঙ্ক্ষা

পূর্বে উল্লেখিত ভব নিদানে বর্ণিত কর্ম ভব হলো পুনর্জন্মের কারণ। এই সম্পর্কে উক্ত আছে, ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বগণের ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বনিকায়ে যে জন্মগ্রহণ, উৎপত্তি, অবতরণ, প্রকাশ, স্কন্ধসমূহের প্রাদুর্ভাব, আয়তনসমূহ লাভ তাই জন্ম।[১৮] এই সব কিছু কর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। আবার কর্ম জন্য সমাজে প্রাণীগণের উচ্চ-নীচ ভেদে প্রভেদ করে থাকে। জীবের জন্ম সম্পর্কে বর্ণিত আছে, 'সত্ত্বগণের জীবকুলে যা জন্ম, সঞ্জাত, মাতৃগর্ভে প্রতিসন্ধি, মাতৃগর্ভ থেকে নিষ্ক্রান্তি, পুনঃপুন উৎপত্তি, স্কন্ধসমূহের আবির্ভাব, চক্ষু প্রভৃতি দ্বাদশায়তনের প্রতিলাভই জন্ম নামে অভিহিত।[১৯]

১.১১.১ সামাজিক জীবনে জন্ম- এর প্রভাব

জন্ম (বা জন্মের আকাঙ্ক্ষা) শুধু একটি জীবন প্রক্রিয়া নয় এটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। পরিবার, সম্প্রদায় ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে এর নানামুখি প্রভাব রয়েছে। নিচে এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ দেওয়া হলো:

জনসংখ্যা পরিকল্পনা
জন্মহারের প্রভাব সরাসরি অর্থনৈতিক চাপ তৈরী করে। এ ক্ষেত্রে সরকারি নীতি অনুসারে জন্ম নিয়ন্ত্রণ এর পরিকল্পনা করা যেতে পারে।

সামাজিক প্রত্যাশা
সামাজিক ভিত্তিতে সন্তান জন্মে ক্ষেত্রে ছেলে সন্তান মেয়ে সন্তান এর আকাঙ্খা বৃদ্ধি পায়। ফলে অপরিকল্পিত জনসংখ্য বৃদ্ধি পায়।

সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ
জন্ম সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে প্রভাবিত করে

সামাজিক সমস্যা
জন্ম ও জন্মের আকাঙ্ক্ষা সামাজিক কাঠামো, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, ধর্মীয় এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রভাব ফেলে। অনেক সময় এর ফলে শিশুশ্রম বা বাল্যবিবাহের মতো সমস্যা সৃষ্টি হয়। এ ক্ষেত্রে সচেতন নীতি, শিক্ষা ও প্রযুক্তির সমন্বয় করে ভারসাম্য স্থাপন করা যেতে পারে।

সারণি : ১৪

এ ক্ষেত্রে সচেতন নীতি, শিক্ষা ও প্রযুক্তির সমন্বয় করে ভারসাম্য স্থাপন করা যেতে পারে।

১.১২. জরা-মরণ বা দুঃখ

জন্ম হলে মরণ অবশ্যম্ভাবী না বোধ করার ক্ষমতা কারও নেই। এই সত্ত্ব লোকে কেউ অমর নয়। মরণ তথা মৃত্যু সম্পর্কে উক্ত হয়েছে, 'যে কোন সত্ত্বগণের যেকোন সত্ত্বনিকায়ের থেকে চ্যুতি, চ্যবনতা, ভেত, নিক্ষেপ, জীবিতেন্দ্রিয় উচ্ছেদ তাই মরণ বলে।[২০]

১.১২.১. সামাজিক জীবনে জরা-মরণ বা দুঃখ-এর প্রভাব

জরা-মরণ (জরা ও মরণ) বৌদ্ধদর্শনের চার আর্যসত্যের চূড়ান্ত সত্য হলো জরা-মরণ। দেখা যায় মানুষ প্রতিনিয়ত দুঃখের সাথে পাঞ্জা দিয়ে এগিড়ে যাচ্ছেন। সামাজিক প্রেক্ষাপটে এটির তাৎপর্য ও প্রায়োগিক দিক বিশ্লেষণ:

বার্ধক্য ও সামাজিক কাঠামো
জরাসমস্যা, পরিবার কাঠামো পরিবর্তন, যৌথ পরিবার ভাঙন এবং বৃদ্ধাশ্রমের চাহিদা বৃদ্ধি।
মৃত্যুভয় ও সামাজিক আচরণ
প্রভাব ভোগবাদী মানসিকতা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার চাপ মৃত্যুভয়
কর্মক্ষমতা হ্রাস ও অর্থনীতি
কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর ওপর চাপ
আধ্যাত্মিক প্রেক্ষাপটে সমাজ
বৌদ্ধ অনুশীলন মরণানুস্মৃতি ভাবনা জীবনবোধ বৃদ্ধি

সারণি : ১৫

২. প্রতীত্যসমুৎপাদে অনুলোম-প্রতিলোম-এর ব্যবহার

'অনুলোম' এর বিপরীত হলো 'প্রতিলোম' অর্থাৎ, দুঃখের উৎপত্তি এর বিপরীত দুঃখের নিরোধ। প্রতীত্যসমুৎপাদ এ বারটি নীতির প্রত্যেকটি যেমন অপরটির সাথে সংযুক্ত হয়ে পর্যায়ক্রমে আবতির্ত হয় তেমনই এর বিপরীত দিক থেকে এক একটি নিরোধের মাধ্যমে আবর্তন থেকে মুক্ত থাকা যায়। এটি হলো প্রতীত্যসমুৎপাদের অনুলোম-প্রতিলোম ভাবনা পদ্ধতি। এ সর্ম্পকে একটি পরিচিতি নিম্নে[২১] তুলে ধরা হলো। যথা :

বর্ণনা	অনুলোম	প্রতিলোম
মূল নীতি	ইদং সতি ইদং হোতি অর্থাৎ, এটার কারণে এটা হয়	ইদং অসতি ইদং ন হোতি অর্থাৎ, এটার নিরোধে এটার নিরোধ হয়
দুঃখের কারণ শৃঙ্খল	অবিদ্যা ⟶ সংস্কার ⟶ বিজ্ঞান ⟶ নাম-রূপ ⟶ ষড়ায়তন ⟶ স্পর্শ ⟶বেদনা ⟶ তৃষ্ণা ⟶ উপাদান ⟶ ভব ⟶ জন্ম ⟶ জরা-মরণ	জরা-মরণ নিরোধ ⟵ জন্ম নিরোধ ⟵ভব নিরোধ ⟵ উপাদান নিরোধ ⟵তৃষ্ণা নিরোধ ⟵ বেদনা নিরোধ ⟵ স্পর্শ নিরোধ ⟵ ষড়ায়তন নিরোধ ⟵ নামরূপ নিরোধ ⟵ বিজ্ঞান নিরোধ ⟵ সংস্কার নিরোধ ⟵ অবিদ্যা নিরোধ
প্রক্রিয়া	অজ্ঞানতা থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমিকভাবে	অজ্ঞানতা দূর করে পর্যায়ক্রমে

	জন্ম-মৃত্যুর চক্র সৃষ্টি।	সমস্ত নিদান বিনষ্ট করা।
ফলাফল	সংসারে আবদ্ধতা ও দুঃখের উদ্ভব।	নির্বাণ তথা মুক্তি অর্জন।
উদাহরণ	তৃষ্ণা থাকলে উপাদান জন্মায় ⟶ ভব ⟶ জন্ম ⟶ জরা-মরণ।	তৃষ্ণা নিরোধ হলে উপাদান নিরোধ হয় ⟶ ভব নিরোধ ⟶ জন্ম নিরোধ।

সারণি : ১৬

৩. প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতির সামাজিক প্রয়োগ : একটি সমন্বিত বিশ্লেষণ

বুদ্ধের প্রতীত্যসমুৎপাদ (নির্ভরশীল উৎপত্তি) নীতিটি সামাজিক সমস্যাগুলির গভীরে নিহিত কারণ-প্রভাব শৃঙ্খল বোঝার একটি শক্তিশালী কাঠামো প্রদান করে। এই বিশ্লেষণে কীভাবে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের এই দ্বাদশ নিদানসমূহ সামাজিক জীবনে প্রাসঙ্গিক সামাজিক সংকটের মূলোৎপাটন তা তুলে ধরা হলো। যথা :

পর্যায়	সামাজিক প্রভাব	সমাধানের পথ
অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা	কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকতা, বৈষম্য	প্রকৃতবিদ্যা
সংস্কার বা চেতনা	জাতিগত বিদ্বেষ, বৈষম্য	সচেতনতা কর্মশালা
বিজ্ঞান বা মনের গঠন	তথ্যের অপপ্রচার বা কারসাজি	স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা
নামরূপ বা সংযোগ	সামাজিক স্তরবিন্যাস	সাম্যবাদী নীতি
ষড়ায়তন বা পঞ্চ ইন্দ্রীয় সংযম	ভোগবাদ, আসক্তি	ইন্দ্রিয় সংযম
স্পর্শ বা সংকট	সম্পর্কের সংকট	সামাজিক সংবেদনশীলতা
বেদনা বা অনুভূতি	সমবেদনার অভাব	সহানুভূতি শিক্ষা
তৃষ্ণা বা লোলুপতা	মানসিক অশান্তি	নিয়মিত ধ্যান চর্চা
উপাদান বা আসক্তি	সংঘাত	সংঘাত সমাধান
ভব বা অস্তিত্ব	পরিবেশ সংকট	টেকসই উন্নয়ন
জন্ম বা জন্মের আকাঙ্ক্ষা	অর্থনৈতিক চাপ	সচেতন নীতি
জরামরণ বা দুঃখ	দুঃখ উৎপত্তি	মরণানুস্মৃতি ভাবনা

সারণি : ১৭

এই নীতিতে তিনটি কালের প্রকাশ পায়। সেগুলো নিম্নরূপ[২২]-

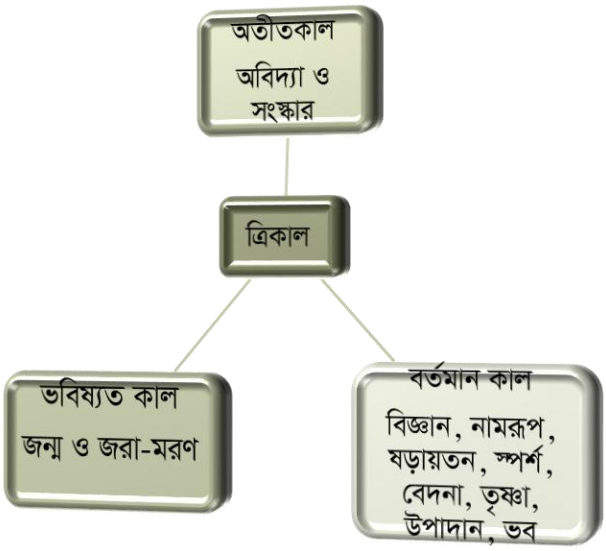

চিত্র ২ : প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতির ত্রিকালে প্রকাশ

বুদ্ধের প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতির পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রত্যেক সামাজিক সংকটের গভীরেও একটি কারণ-শৃঙ্খল বিদ্যমান। ফলে অবিদ্যা (মূল অজ্ঞানতা) দূর করে সচেতনতা, ন্যায়পরায়ণতা ও কার্য-কারণ বুঝে পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। বুদ্ধের এই শিক্ষা শুধু ব্যক্তিগত মুক্তিই দেয় না, বরং একটি সুশৃঙ্খল, ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের রূপকল্প দেখায়। সর্বোপরি বলা যায় যে সংকটের কারণ বুঝতে, সে সংকট জয় করে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, মানবজীবন নিয়ত বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। মানবজীবনের বহুমুখি সমস্যার জন্যই জীবনে সুখের চেয়ে দুঃখই বেশি প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য। জীবনদুঃখের এই সম্যক উপলব্ধিতেই বৌদ্ধধর্মের সূচনা। গৌতম বুদ্ধ বুঝেছিলেন জীবন মূলত দুঃখময়, দুঃখের আকর। এই দুঃখ হতে মুক্তি লাভের জন্য দীর্ঘ ছয় বছর তিনি কঠোর ধ্যান সাধনার দ্বারা লাভ করলেন পরম জ্ঞান, হলেন তিনি বুদ্ধ অর্থাৎ আলোকপ্রাপ্ত এবং উপলব্ধি করলেন জীবন দুঃখময়, এই দুঃখের কারণ আছে, এই দুঃখের নিরোধ আছে এবং এই দুঃখ নিরোধের উপায়ও আছে। বৌদ্ধধর্মে একে বলা হয় চারিআর্যসত্য এবং এই দুঃখ হতে নিরোধের উপায়কে বলা হয় আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। তদ্রুপ মানবজীবনের সমস্যা যেমন বিদ্যমান তা হতে উত্তরণের উপায়ও বিদ্যমান। বুদ্ধের শিক্ষা ও উপদেশে মধ্যে মানবজীবনের বহুমুখি সমস্যা হতে উত্তরণের উপায় নির্দেশনা রয়েছে।

প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি শিক্ষা দেয় কোনো কিছুই একা সংগঠিত হয় না। প্রাত্যহিক জীবনে আমরা সকলেই পরস্পর-পরস্পরের সাথে আবদ্ধ। অনুরূপভাবে সমাজেও একজনের আচার-আচরণ অন্যজনের উপর প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় রাজা/শাসক দুর্নীতিবাজ বলে প্রশাসন দুর্বল হয়। ফলশ্রুতিতে সাধারণ জনগণ কষ্ট পায়।

এমতাবস্থায় অসন্তোষ্ট ও আপত্তি সৃষ্টি হয়। ফলে সমাজে নানারকম অরাজকতা সৃষ্টি হয়। প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি কেবলমাত্র বৌদ্ধদর্শন নয়, এটাকে সমাজ রূপ-রূপান্তরের দার্শনিক পথ বলা হয়। কার্য-কারণের ন্যায় ও যুক্তিসংগত বিচার বিশ্লেষণ নির্ভরতা এবং অবিদ্যা (অজ্ঞান) পরিবর্তে বিদ্যা (জ্ঞান) -এই সতত সুন্দর নিয়ম নীতিগুলো পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি, সম্প্রীতি, সদ্ভাব, উদারতা,মানবিকতা ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় অপরিহার্য।

৩.১. চারি আর্যসত্য : দুঃখমুক্তির উপায়

বুদ্ধ মানবজীবনের চারটি ধ্রুব সত্যকে চারি আর্যসত্য বলেছেন। এগুলো হলো : দুঃখ, দুঃখ উৎপত্তির কারণ বা দুঃখ সমুদয়, দুঃখ নিরোধ এবং দুঃখ নিরোধের উপায়। যে বিষয়গুলো নিজেদের অথান্তে জীবনে প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। এই আর্যসত্য বুদ্ধের জীবন দর্শনের এমন একটি বিষয় যা গভীর অর্থবহন করে চলেছে আজও। বুদ্ধের ধর্মদর্শনে এটি একটি অমূল্য প্রকাশ। সমাজজীবনের দুঃখ সংকট বিষয়গুলো গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করতে বুদ্ধের আর্যসত্য সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে বিষয়গুলো সমাধান সহজ হবে। সুখ-দুঃখ যেন মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের ছায়াসঙ্গী। মানব তথা সমাজের অন্যতম সমস্যা দুঃখ। দুঃখময় এই জগৎ ও জীবন। মানব জীবনে সুখের চেয়ে দুঃখের পরিমানই বেশী, আপাতদৃষ্টিতে যা সুখ তা যেন দুঃখেরই দ্বারা প্রাপ্তি যা ক্ষণস্থায়ী। দুঃখের এ যথার্থ উপলব্ধি থেকে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি নিঃসন্দেহে। মহামানব বুদ্ধ মহান রাজ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করা সত্ত্বেও মানবের নানাবিধ দুঃখ সমস্যা সমাধানের জন্য দীর্ঘ ৬ বছর কঠোর ধ্যান করেন। আবিষ্কার করেন চুরার্য সত্য। জীবন দুঃখময়-দুর্দশা ও মানুষ প্রতিনিয়ত দুঃখের সাথে পাঞ্জা দিয়ে জীবনযাপন করেন। সংস্কার মাত্রই দুঃখময়। দুঃখ সম্পর্কে বুদ্ধ বলেছেন : এই জগতে কেবলমাত্র দুঃখের উৎপত্তি ও বিলয় হয়। দুঃখ ব্যতীত কোন কিছুর উৎপত্তিও হয় না আবার বিলয়ও হয় না।[২৩]

চারি আর্যসত্য বুদ্ধের শিক্ষা-দর্শনের অন্যতম মূলভিত্তি। বুদ্ধ মানবজীবনের দুঃখ এবং সমাধানের পথ ব্যাখ্যা করেছেন চুরার্য সত্যের আলোকে। মানবজীবনের সংকটের একটি চার্ট এমন হতে পারে যা সংকট সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। নিচে একটি সারণির মাধ্যমে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে উপস্থাপন করা হলো:

চারি আর্যসত্য	বৌদ্ধিক দৃষ্টিকোণ	সামাজিক দৃষ্টিকোণ
দুঃখ	মানবজীবনের দুঃখ	সমাজের বহুমুখী সমস্যা, বৈষম্য
দুঃখের কারণ	তৃষ্ণা, অবিদ্যা	লোভ, অজ্ঞতা, কুসংস্কার
দুঃখ নিরোধ	তৃষ্ণা তথা লোভ, দ্বেষ, মোহ থেকে মুক্তি	ন্যায় দ্বারা সমাজ পরিচালনা করা
দুঃখ মুক্তির পথ	আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন	সুশাসন, সুশিক্ষা প্রতিষ্ঠা

সারণি : ১৮

বুদ্ধের চতুরার্য সত্য কেবল ব্যক্তিগত মুক্তির পথই নয়, এটি সমাজের কাঠামোগত সংকট বিশ্লেষণ ও সমাধানেরও একটি মডেল। আধুনিক সমাজে এর প্রয়োগ সম্ভব নীতি নির্ধারণ, নৈতিকতা ও সামষ্টিক দায়িত্ববোধের মাধ্যমে।

৩.২. আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ: নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পথনির্দেশ

মানবজীবন জগৎ দুঃখময় এই বোধ থেকে মহামানব গৌতম বুদ্ধ মুক্তির পথ অনুসন্ধান করতে গিয়ে অতি কৃচ্ছতা সাধন না করে মধ্যপথ অনুসরণ করে যে অভিনব পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন তা হলো জগৎ বিখ্যাত আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এটি আধ্যাত্মিক জীবনের পাশাপাশি সামাজিকজীবনে সমভাবে গুরুত্ববহন করে চলেছে আজও। এই নীতিগুলো অনুশীলন করে যে কেউ জাগতিক লোভ-দ্বেষ-মোহ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। আর এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো তৃষ্ণা থেকেই দুঃখের সৃষ্টি। এই তৃষ্ণা বা জাঁল ছিন্ন করতে পারলেই দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করা যাবে। *'ধর্মচক্রপ্রবর্তন সূত্রে'* বুদ্ধ এই দুঃখ থেকে মুক্তির জন্যে আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণের কথা বলেছেন। এ বিষয়ে *'ধর্মপদ'* গ্রন্থের *'বুদ্ধবর্গে'* উক্ত রয়েছে :

'দুক্খং দুক্খসমুপ্পাদং দুক্খস্স চ অতিক্কমং,
অরিযট্ঠঙ্গিকং মগ্গং দুক্খূপসমগামিনং।'[২৪]

অর্থাৎ, দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখ অতিক্রম এবং দুঃখ উপশমকারী পথই হলো আর্য অষ্টাঙ্গিকমার্গ।

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলনে মানুষের ইহজীবনের দুঃখ দুর্দশা দূর হয়। এটি একাধারে অসংযত ভোগবিলাস এবং অনাবশ্যক শারীরিক কৃচ্ছ্রতা থেকে ব্যক্তিকে মুক্ত রেখে মধ্যবর্তী পথ অবলম্বনের মাধ্যমে সংযত জীবন যাপনের সহায়ক হিসেবে কাজ করে। মার্গটি প্রজ্ঞা তথা জ্ঞান, শীল তথা নীতি, সমাধি তথা মনের স্থিরতায় ত্রিধারায় বিভজিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ হলো :

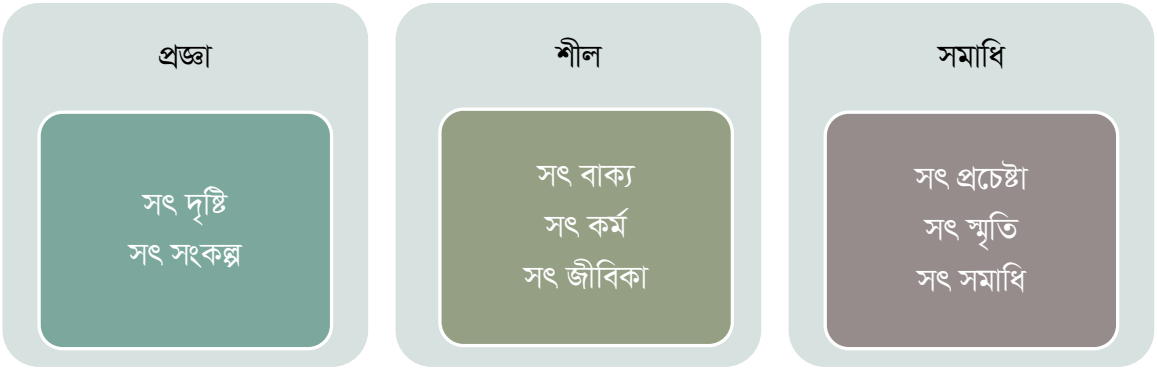

চিত্র ৩ : আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ

দুঃখ নিরশনের জন্য এই মার্গ বা পথ অবলম্বন অনস্বীকার্য। সমাজ জীবনের আলোকে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের একটি প্রতিফলন নিচে তুলে ধরা হলো।

৩.২.১. সমাজ জীবনে সৎ দৃষ্টির প্রভাব

বুদ্ধ নির্দেশিত আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের মধ্যে সর্ব প্রথম মার্গ হলো সৎ দৃষ্টি বা যথার্থ দৃষ্টি। সম্যকদৃষ্টি যা ব্যক্তিকে সত্য সঠিক বিষয় সম্পর্কে অবহিত করে। এখানে 'সম্যক' অর্থ সঠিক, প্রত্যক্ষ সত্য বিষয়, যথার্থ দৃষ্টি, প্রকৃত সত্য দর্শনীয় দৃষ্টি বা দর্শন, চারি আর্য সত্য, যথার্থ সত্য বিষয়ক বিশ্বাস, শুদ্ধ, সুন্দর এবং কার্য-কারণ সম্পর্ককে বোঝায়। নীতিটি যথার্থভাবে সত্য আর দুঃখ সম্পর্কে অবহিত করে। বর্তমান প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্বে মানুষ বহুভাবে প্রতারিত হচ্ছে অসত্য প্রচার প্রসারের ফলে। সৎ দৃষ্টি বা সম্যক প্রসঙ্গে বুদ্ধ বলেন : 'যদি কেউ মিথ্যা কর্মকে মিথ্যাকর্ম এবং সম্যক কর্মকে সম্যক কর্ম বলে জানে তা-ই সম্যক দৃষ্টি'।[২৫] সম্যক দৃষ্টির মধ্যে অবিদ্যা যথার্থ বিষয় জ্ঞান প্রাপ্তিতে বাঁধাসৃষ্টি করে। সম্যক দৃষ্টি অবিদ্যার বা অজ্ঞানের মুলোৎপাটন করে পুত পবিত্র বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জনে সহায়ক শক্তি হিসেবে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। একইসাথে যা প্রজ্ঞা, জ্ঞান, বিচার, ধর্মবিচার, তদন্ত, অর্ন্তদৃষ্টি, তীক্ষ্নবুদ্ধি, প্রত্যক্ষভাবে বিচারকরণ, পাণ্ডিত্য, পারদর্শিতা, নিপুণতা, চিন্তা, পরিক্ষণ, মেধা, পরিজ্ঞান, বিদর্শন, সম্প্রজ্ঞান, প্রতোদ প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞা-ইন্দ্রীয়, প্রজ্ঞাবল, প্রজ্ঞাস্ত্র, প্রজ্ঞা-প্রাসাদ, প্রজ্ঞালোক, প্রজ্ঞাজ্যোতি, প্রজ্ঞাপ্রদীপ, প্রজ্ঞারত্ন, অমোহ, ধর্মবিচার, ধর্মবিচার সম্বোধ্যঙ্গ, মার্গাঙ্গ এবং প্রতিপন্ন সম্যক দৃষ্টি নামে অভিহিত।[২৬] লৌকিক সম্যক দৃষ্টি ও লোকোত্তর সম্যক দৃষ্টি ভেদে সম্যক দৃষ্টি দুই প্রকার[২৭]। এখানে লৌকিক সাধারণ জ্ঞান বা জাগতিক জ্ঞানকে লৌকিক সম্যক দৃষ্টি বলে। কর্ম ও কর্মফল এর প্রতি আস্থা সৃষ্টি করাই হলো লৌকিক সম্যক দৃষ্টি অন্যতম কৃত্য। লোকোত্তর সম্যক দৃষ্টি হলো মার্গ ও তার ফল সম্পর্ক যুক্ত জ্ঞান। এর মধ্যে রয়েছে কর্ম সম্পর্কীয় সম্যক দৃষ্টি, আর্যসত্য সম্পর্কীয় সম্যক দৃষ্টি[২৮] এবং দশবথু সম্পর্কীয় সম্যক দৃষ্টি[২৯]। সকলে কর্ম অনুসারে ফল ভোগ করে। কুশল কর্ম করলে কুশল ফল এবং অকুশল কর্ম করলে অকুশল ফল। কর্ম বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তি যা কায়, বাক্য ও মন দ্বারা কর্ম সংঘঠিত হয়। ফলে সুষ্ঠ-সুন্দর আদর্শসম্পন্ন জীবনযাপনে তিনটি দ্বারের সংযম প্রয়োজন আবশ্যক। কায়, বাক্য ও মন সংযম প্রসঙ্গে 'ক্রোধ বর্গে' উল্লেখ আছে :

> 'কাযপ্পকোপং রক্খেয্য কাযেন সংবুতো সিযা, কাযদুচ্চরিতং হিত্বা কাযেন সুচরিতং চরে।
> বচীপকোপং রক্খেয্য বাচায সংবুতো সিযা, বচীদুচ্চরিত হিত্বা বাচায সুচরিতং চরে'।
> মনোপকোপং রক্খেয্য মনসা সংবুতো সিযা, মনোদুচ্চরিতং হিত্বা মনসাসুচরিতং চরে।[৩০]

অর্থাৎ, কায়িক আচার-আচরণ থেকে নিবৃত্ত থেকে সংযত কায় হবে এবং কায়িক দুশ্চরিত্রতা ত্যাগ করে সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হবে। বাচনিক আচার-আচরণ থেকে নিবৃত্ত থেকে বাক্যে সংযত হবে এবং বাচনিক দুরাচার ত্যাগ করে বাক্যের মাধ্যমে সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হবে। মানসিক উত্তেজনা নিবৃত করে সংযমী হবে এবং মানসিক দুষ্কর্ম ত্যাগ করে সৎকর্মে নিয়োজিত হবে।

ব্যক্তি যেমন দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে তার জীবনের গতি নির্ণয় করে, অনুরূপভাবে সমাজজীবনের দৃষ্টিভঙ্গি পুত-পবিত্রতা; সামাজিক ন্যায়-পরায়ণতা শান্তি স্থাপনের অন্যতম শর্ত।

সমাজজীবনে সৎ দৃষ্টির বেশ প্রভাব রয়েছে :

সমাজজীবনের প্রভাব	প্রায়োগিক ব্যবহার
নীতি-নৈতিকতা	ভুল থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে কর্মফল উপলব্ধি
সদ্ভাব-সম্প্রীতি	দ্বন্দ্ব-সংঘাত কমিয়ে এনে পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি
ন্যায় বিচার	নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি
শান্তি স্থাপন	হিংসা, ঝগড়া-বিভাদের অবসান

সারণি : ১৯

৩.২.২. সমাজ জীবনে সৎ সংকল্পের প্রভাব

সৎ সংকল্প বা সম্যক সংকল্প হলো পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় মার্গ। এখানে সৎ সংকল্প বলতে বোঝায় সৎ প্রতিজ্ঞা, স্থিরকৃত কাজ। সকল প্রকার কামনা, ক্রোধ, হিংসা, আসক্তি, ভোগবিলাস দূর করে সংযতজীবন যাপনে দৃঢ়তা স্থাপন করাই সম্যক সংকল্প। আদর্শ, ন্যায়সম্পন্ন, সুশৃঙ্খল জীবন এবং যথার্থ জ্ঞানানুসারে আদর্শ জীবনগঠনের জন্য সৎ সংকল্পের অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন। সৎ সংকল্পের মধ্যে ব্যক্তির সুন্দর ও মহৎ হয় চিন্তা-চেতনা, প্রজ্ঞা, মননশীলতা, সৃজনশীলতার বহিঃপ্রকাশ গঠে। সৎ সংকল্প চিন্তা-চেতনা ও মনোভাবকে পরিশুদ্ধ করার শিক্ষা দেয়। বুদ্ধ তিন প্রকার সৎ সংকল্প করার কথা বলেন।[৩১] এগুলো হলো :

চিত্র ৪ : ত্রি-সংকল্প

উপরি-উক্ত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মন থেকে ত্যাগ করে সংকল্প গ্রহণ করলে তা ব্যক্তিজীবনের পাশাপাশি সমাজজীবনে সৎ প্রভাব প্রতিফলিত হবে। ফলে সমাজে আদর্শের সুবাতাস প্রবাহিত হবে। তাই বলা যায় যে ব্যক্তি যথাযথ নিষ্ঠা ও সততার সাথে বাক্য, কর্মে, চিন্তা চেতনায় সর্বদা সৎ দৃষ্টি ও সৎ সংকল্প মেনে জীবন যাপন করেন দুঃখ তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

সমাজজীবনে সৎ সংকল্পের প্রভাব অপরিসীম। নিচে একটি সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো :

সমাজজীবনে প্রভাব	প্রায়োগিক ব্যবহার
পরিবার	অপরিমেয় ভালোবাসা (loving kindness) ও ক্ষমার মনোভাব গড়ে উঠে
সমাজ	অন্যের দুঃখ-দুর্দশা উপলব্ধিতে সহায়তা করে
নেতৃত্ব	রাজা/শাসক হিংসার পরিবর্তে দয়া, ক্ষমা এবং প্রতিশোধের পরিবর্তে সহনশীল আচরণ
আচরণ	অবৈধ বা অসৎ পথে লাভ নয় বরঞ্চ ন্যায়-পরায়ণতা ও কল্যাণমুখি সংকল্পে কাজ করা

সারণি : ২০

৩.২.৩. সমাজ জীবনে সৎ বাক্য প্রভাব

দুঃখ মুক্তির আটটি মার্গে তৃতীয় মার্গ তথা পথ হলো সৎ বা সম্যক বাক্য। বুদ্ধের ব্যাখ্যায় মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরত, পিশুন (ভেদ) বাক্য বলা হতে বিরত, পরুষ (কর্কশ) বাক্য বলা হতে বিরত, সম্প্রলাপ (বৃথা বাক্য) বলা হতে বিরত থাকাকে সম্যক বাক্য বলে।[৩২] মিথ্যা বাক্য প্রসঙ্গে *'সুত্ত নিপাত'* গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে:

সভগ্গতো বা পরিসগ্গতো বা, একস্স বেকো ন মুসা ভণেয্য;
ন ভাণযে ভণতং নানুজঞ্ঞা, সব্বং অভূতং পরিবজ্জযেয্য।[৩৩]

অর্থাৎ, সভাগৃহ বা পরিষদ গৃহে কেউ কারো সাথে মিথ্যা বাক্য ভাষণ করবে না, কেউ কাউকে মিথ্যা কথা বলতে উৎসাহিত করবে না, মিথ্যার অনুমোদন করবে না। সকল প্রকার মিথ্যা পরিত্যাগ করবে।

সকল ধর্মেই আছে মিথ্যা বলা মহাপাপ। এটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। মানুষের জীবনে জয় পরাজয় দুই আছে। এর কারণও রয়েছে। ভালো কাজের জন্য যেমন জয় আসে ঠিক তেমনি মন্দ কাজের জন্য মানুষের পরাজয় হয়। বুদ্ধ পরাভব সূত্রে মানব জীবনে পরাজয়ের কারণ উল্লেখ করেছেন তন্মধ্যে একটি কারণ হলো :

যো ব্রাহ্মণং বা সমণং বা, অঞ্ঞং বাপি বণিব্বকং
মুসাবাদেন বঞ্চেতি, তং পরাভবতো মুখং।[৩৪]

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নিষ্পাপ ব্রাহ্মণ, শ্রমণ বা অন্য কোনো যাচককে মিথ্যা বলে বঞ্চনা করে, সে ব্যক্তি জগতে পরাজিত হয়। পিশুন বা ভেদবাক্য থেকে বিরত থাকা মানে হিংসাবশতঃ অন্যদের মধ্যে ভেদ, শত্রুতা সৃষ্টি হতে পারে এরকম কথা না বলা বরং এমন কথা বলা যা দ্বারা শত্রুর মধ্যেও বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়। *'অঙ্গুত্তর নিকায়'* গ্রন্থের *'বাক্য সূত্রে'* উল্লেখ আছে পঞ্চবিধ অঙ্গে সমৃদ্ধ বাক্য সুভাষিত হয়। সেই পঞ্চবিধ[৩৫] বাক্য হলো

- সঠিকসময়ে সুমধুর বাক্য বলা
- সত্য কথা বলা
- নম্রতার সাথে কথা বলা

- অর্থপূর্ণ কথা বলা
- মৈত্রী চিত্তে কথা বলা।

একটি বাক্যের দ্বারাই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের প্রকাশ পায়। সংযত বাক্য মানুষের মধ্যে প্রীমিময় সম্পর্ক স্থাপন করে। কাউকে কটাক্ষ, হীন, আক্রমণাত্মক, পীড়াদায়ক বাক্য বলা থেকে সংযত থাকা মানে পরুষ (কর্কশ) বাক্য বলা হতে বিরত থাকা। মানবজীবনের মঙ্গলের বর্ণনা দিতে গিয়ে বুদ্ধ বলেছেন :

সুভাসিতা চ যা বাচা এতং মঙ্গলং উত্তমং। [৩৬]

অর্থাৎ, সুভাষিত বাক্য ভাষণ করাই উত্তম মঙ্গল।

সম্প্রলাপ বাক্য বলা হতে বিরত থাকা বলতে বাজে কথা না বলা, বাজে গল্প না করা, গুজব না করা, অপ্রপ্রলাপ না করা, বৃথা বাক্য না বলা, শূন্যগর্ভ বাক্য না বলা, অন্যায় প্রস্তাব না করা, ঠাট্টা বিদ্রূপ বা প্রলাপ বাক্য না করা বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকা বোঝায়। এ প্রসঙ্গে নিচে প্রদত্ত বুদ্ধের উপদেশটি যথার্থ :

তমে'ব বাচং ভাসেয্য, যায'ত্তানং ন তাপযে,
পরে চ ন বিহিংসেয্য, সা বে বাচা সুভাসিত।[৩৭]

অর্থাৎ, যে বাক্য আত্মপীড়া দায়ক নয়, যা পরকে আঘাত করে না, সেইরূপ সুভাষিত বাক্য বলা উচিত।

সৎ বাক্যের একটি প্রধান শিক্ষা হলো সমাজের স্থান, কাল, পাত্র, ব্যক্তি বিবেচনা করে বাক্য ব্যবহারে সচেতন থাকা। একটি বাক্য এশবার বল হয়ে গেলে তা ব্যক্তি বিশেষে সমাজে কতটা প্রভাব পড়তে পারে তা বিবেচনা করা একান্ত প্রয়োজন। সামাজিকভাবে যেন কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, প্রতিষ্ঠান যেন ক্ষতিগ্রস্থ না হয় কিংবা কোন কারনে তাদের মনোবলে অনুভূতিতে যেন আঘাতপ্রাপ্ত না হয়। অপরদিকে একটি সৎবাক্য যেন সমাজের সকলের মনোবল বৃদ্ধিতে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে সে দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

সৎ বাক্যকে সমাজের মৌল নৈতিক আচরণ বলা হয়। এটিকে সমাজগঠন, সম্পর্ক রক্ষা এবং ন্যায়-নৈতিকতা প্রতিষ্ঠায় এক শক্তিশালী মহৌষধ বলা যায়। নিচে সমাজজীবনে সৎ বাক্যেও প্রাসঙ্গিকুার একটি ধারণা উপস্থাপন করা হলো :

সমাজজীবনের ক্ষেত্র	প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা
পরিবার	আন্তরিকতাপূর্ণ বাক্য, মধুর বাক্য, পরিবারে শান্তি আনে
শিক্ষা	সমাজবিনির্মাণে গঠনমূলক বাক্য শিক্ষায় অবিরত উৎসাহ দেয়
নেতৃত্ব	সৎ, সুন্দর ও মধুর ভাষণ ঐক্যবদ্ধতা সৃষ্টি করে সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা নিয়ে আসে।
যোগাযোগ	মিথ্যা রটনা, গুজব পরিহারের মাধ্যমে সমাজে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ রোধ হয়
বিচার	বিচারিক কাজে অভিযোগ, সাক্ষ্য, উপস্থাপনায় সত্য ও সুবিবেচনায় সুন্দর ভাষা আবশ্যক
অন্তঃধর্মীয় সহাবস্থান	আন্তঃধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সহাবস্থান সৎ বাক্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

সারণি : ২১

৩.২.৪. সমাজজীবনে সৎ কর্মের প্রভাব

চতুর্থ মার্গটি হলো সৎ কর্ম। কুশল কর্ম সম্পাদন করাই সম্যক কর্মের কৃত্য। যে কর্ম সম্পাদন করলে সমাজে ব্যক্তির নৈতিক, মানসিক, আত্মিক উন্নতি সাধিত হয় তাই সম্যক কর্ম। বুদ্ধ প্রদর্শিত কর্মে চিত্ত এবং চৈতসিকের কায়িক-বাচনিক এবং মানসিক অভিব্যক্তি বিরাজমান। কর্মই একমাত্র অবলম্ভন বা ধর্ম। বুদ্ধ সবসময় কর্মকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কর্ম মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে আছে। সৎ কর্মের মূল শিক্ষা হলো সমাজে প্রাণিহত্যা, চুরি, অবৈধ কামাচার থেকে বিরত থেকে সংযত জীবনযাপন।[৩৮] যার মাধ্যমে সমাজে বিরাজমান বহু সংকট দূর হবে। ব্যক্তি কর্মের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে। ব্যক্তি যেভাবে কাজ করে ঠিক তেমনিই তার স্বভাব-চরিত্র বা ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয়। কর্মকে নৈতিক আচরণ ও দায়িত্বশীলতার মূলভিত্তি বলা হয়। সমাজে সকলে যদি এই নীতি অনুসরণ দেশের মঙ্গলের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট কাজ করে তবে পরিবার, সমাজ সর্বোপরি রাষ্ট্রে উন্নতি বা কল্যাণ সাধিত হবে। সৎকর্ম পরিবার, সমাজজীবনে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ সম্পর্কিত একটি ধারণা নিচে সারণির মাধ্যমে তুলে ধরা হলো :

সমাজজীবনে ক্ষেত্র	সমাজে প্রায়োগিক ব্যবহার
পরিবার	পরিবারের সকলের মধ্যে আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে
শিক্ষা	সহ পাঠীদের প্রতি সহিংসতা, রূঢ়তা, হিংস্রতা, চুরি, প্রতারণা পরিহার
কর্মক্ষেত্র	অনিয়ম ও দুর্নীতি থেকে বিরত
নেতৃত্ব	রাজা/শাসকের ন্যায় ভিত্তিক আচার-আচরণ
সহাবস্থান	সকলের নানারকম অকুশলকর্ম রোধে সক্রিয় আচরণ

সারণি : ২২

৩.২.৫. সমাজ জীবনে সৎ জীবিকা প্রভাব

সৎ জীবিকা অষ্টাঙ্গিক মার্গের মধ্যে পঞ্চম মার্গ। এটি বৈধ উপায়ে জীবিকা নির্বাহের শিক্ষা প্রদান করে। সকল প্রকার অনিয়ম, দুর্নীতি, শঠতা, চতুরতা দূর করে আদর্শ এবং সুন্দর ও সততভাবে জীবনযাপনের শিক্ষা দেয়। বুদ্ধ মিথ্যা জীবিকা পরিত্যাগ করে সম্যক বা নির্দোষ জীবিকা দ্বারা জীবনযাপন করাকে সম্যক জীবিকা বলে অভিহিত করেন।[৩৯] শুধু তাই নয়, সমৃদ্ধি শান্তি, সম্প্রীতি সদ্ভাব বৃদ্ধির জন্য সৎ জীবিকা প্রতিষ্ঠায় বুদ্ধ পঞ্চ বাণিজ্যকে নিষেধ করছেন।[৪০] সেগুলো হলো: অস্ত্র বাণিজ্য, প্রাণী বাণিজ্য, মাংস বাণিজ্য, মাদক ও নেশা জাতীয় দ্রব্য বাণিজ্য ও বিষ বাণিজ্য। উপরি-উক্ত পাঁচটি বাণিজ্য তথা ব্যবসা ত্যাগ করে সৎ-শুদ্ধজীবিকা দ্বারা জীবননির্বাহ করার শিক্ষা দেয়। এটি বর্তমানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথা অত্যাবশকীয় একটি নীতি শিক্ষা। এতে অহিংসা প্রকাশ পায় যা বিশ্বে শান্তি, শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

সমাজজীবনে সৎ জীবিকার প্রভাব অপরিসীম। এ বিষয়ে নিচে সারণির মাধ্যমে তা উপস্থাপন করা হলো।

সমাজজীবনে ক্ষেত্র	সম্যক জীবিকার প্রায়োগিক ব্যবহার
চরিত্র গঠন	সৎ জীবিকার মাধ্যমে আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি পায়, ন্যায়পরায়ণতা জাগ্রত হয়
পারিবারিক শান্তি	ন্যায্যতার মাধ্যমে উপার্জনে শান্তি ও সন্তুষ্ঠি আসে
ন্যায়-বিচার	সকল প্রকার অবৈধ্য ব্যবসা-বাণিজ্য দূর হলে সমাজে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায়
সহাবস্থান	সৎ জীবিকা পরস্পর আস্তা, বিশ্বাস ও সহনশীলতার মাধ্যমে সুস্থ সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখে
পরিবেশ সংরক্ষণ	পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ বিনষ্ট হয় এমন ব্যবসা বাণিজ্য না করলে পরিবেশ সংরক্ষিত হয়

সারণি : ২৩

৩.২.৬. সমাজ জীবনে সৎ প্রচেষ্টা প্রভাব

সৎ প্রচেষ্টা হলো মন ও কর্মের উন্নয়নের একটি কৌশল। যেখানে শুধুমাত্র আত্মিক মুক্তি নয়, বরঞ্চ সমাজ উন্নয়নের দায়-দায়িত্ব ও ন্যায়-নৈতিকতার ভিত্তিও বিরাজমান। সৎ প্রচেষ্টা অষ্টমার্গের ষষ্ঠ মার্গ যাকে সম্যক ব্যায়ামও বলা হয়। বুদ্ধ সৎ প্রচেষ্ঠাকে নিম্নোক্তভাবে[৪১] বিভাজন করে দেখিয়েছে:

- অনুৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্ম সমূহের অনুৎপাদনের চেষ্টা
- উৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্মসমূহ দূরীকরণের জন্য চেষ্টা
- অনুৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহ সম্পাদনের চেষ্টা
- উৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহ প্রবৃদ্ধি করার চেষ্টা

ফলশ্রুতিতে, সমাজে যে সংকট উৎপন্ন হয়েছে তা যেন আর উৎপন্ন না হয় তার চেষ্টা করে, যে সংকট উৎপন্ন হয়নি তা যেন আর উৎপন্ন হতে না পারে তার চেষ্টা করে, যে ভালো কর্ম উৎপন্ন হয়েছে তা যেন বৃদ্ধি পায় তার চেষ্টা করে, যে ভালো কর্ম উৎপন্ন হয়নি তা উৎপন্ন করার চেষ্টা করা। সৎ প্রচেষ্টা সমাজ পরিবর্তনে সহায়ক শক্তি হিসেবে ভুমিকা পালন করবে।

সমাজজীবনে নানাক্ষেত্রে সৎ প্রচেষ্টার অনুশীলনে সমাজ, পরিবার সুন্দর থেকে সুন্দর হয়ে উঠে। এ সম্পর্কে একটি উদাহরণ নিচে উপস্থাপিত হলো ।

সমাজজীবনের ক্ষেত্র	সৎ প্রচেষ্টার প্রায়োগিক ব্যবহার
নীতি-নৈতিকতা সমৃদ্ধ সমাজগঠন	অন্যায়, অবিচার ও অনৈতিক প্রবৃত্তি দমন এবং সৎ কাজে উৎসাহ
পরিবার	লোভ, দ্বেষ, মোহ, হিংসা, ক্রোধ, মান, অহংকারের পরিবর্তে দয়া, ধৈর্য্য ও আন্তরিক সহনশীলতা চর্চা
শিক্ষা	অলসতা, জড়তা, ত্যাগ করে প্রকৃত জ্ঞানের চর্চা
অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা	অনিয়ম, দুর্নীতিমুক্ত, ন্যায্য ও ন্যায়নিষ্ঠ কল্যাণকর পেশা গ্রহণ করা
সুযোগ্য নেতৃত্ব	রাজা/শাসক সৎ প্রচেষ্টা বলতে সততার সাথে জনসেবা, মানবিকতা, উদারতা ও সহানুভূতির মাধ্যমে শাসনকে বোঝায়
পরিবেশ	জীব-বৈচিত্র্য রক্ষায় প্রকৃতির প্রতি পরিবেশবান্ধব অহিংস আচার-আচরণ করা।

সারণি : ২৪

৩.২.৭. সমাজ জীবনে সৎ স্মৃতির প্রভাব

সৎ স্মৃতি হলো সপ্তম মার্গ। 'স্মরণ' অর্থে 'স্মৃতি' বোঝায়। সৎ স্মৃতি অর্থে বোঝানো হয়েছে, যা কুশল কর্মকে স্মরণ করায়। অকুশল বিষয় মনে উদিত হওয়া সম্যক স্মৃতি নয়। সৎ স্মৃতি স্মরণ করার পাশাপাশি কুশল কর্ম ও নীতিকে সচেতনভাবে ধারণ করার প্রক্রিয়া। স্মৃতি সহকারে মিথ্যাদৃষ্টি পরিহার ও সম্যক দৃষ্টি লাভ করে অবস্থান করাকে সম্যক স্মৃতি বলা হয়েছে।[৪২] এটি কোনো ধ্যানের অংশ নয় বরং ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনে নৈতিক জাগরণের মূলভিত্তি। সৎ স্মৃতির চর্চা ব্যক্তিকে সকল বিষয়ে সচেতনতার সাথে সজাগ রাখে ফলে গড়ে উঠে একটি সুস্থ, সুন্দর ও সমতাপূর্ণ সমাজ।

সমাজজীবনে সৎ স্মৃতির প্রায়োগিক ব্যবহার খুবই অপরিহার্য। নিচে এ সম্পর্কিত একটি ধারণা উপস্থাপিত হলো।

সমাজজীবনের ক্ষেত্র	প্রায়োগিক ব্যবহার
পরিবার	রাগ দমন করা এবং সহানুভূতিমূলক আচরণ
কর্মক্ষেত্র	সততার সাথে দায়িত্ব পালন
শিক্ষা	সংযম, মনোসংযোগ ও আত্মনিয়ন্ত্রণ
নেতৃত্ব	বিবেচনা সহকারে সিদ্ধান্ত

সারণি : ২৫

৩.২.৮. সমাজ জীবনে সৎ সমাধির প্রভাব

সৎ সমাধি বা সম্যক সমাধি অষ্টাঙ্গিক মার্গের অষ্টম ও শেষ স্তর যা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে গভীর রূপান্তর সাধন করে। এটি কেবল ধ্যানের প্রক্রিয়া নয় বরং চিত্তের পরিশুদ্ধি ও প্রজ্ঞার বিকাশের সর্বোচ্চ অবস্থা। এটি পূর্বে উল্লেখিত সাতটি নীতি অনুশীলনের মাধ্যমে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ করে ক্রোধ, লোভ ও হিংসা দমন করে সহনশীলতা বাড়াতে সাহায্য করে। মানসিক স্থিতি, মনোসংযম রক্ষায় এটি অসাধারণ নৈতিক শক্তি। এ প্রসঙ্গে *'দীর্ঘ নিকায়'* গ্রন্থের *'জনবসভ সূত্রে'* উল্লেখ আছে, 'সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, এবং সম্যক স্মৃতি এই সপ্ত প্রকার অঙ্গের দ্বারা যে একগ্রতা সম্পাদিত হয়, তা উপনিশ্রয়িত এবং পরিস্কৃত তাই সম্যক সমাধি বলে।[৪৩] সমাধি লাভের হেতু বা কারণ আট প্রকার। এগুলো হলো ত্যাগ, তিতিক্ষা, মৈত্রী, শুচিতা, নিরুদ্বেগ, সকল প্রকার কুশলধর্ম, বিচার, এবং সত্যজ্ঞান।[৪৪] সৎ সমাধির মাধ্যমে ব্যক্তির আত্মিক শান্তি প্রতিষ্ঠা পায়। ফলে সমাজে ছড়িয়ে দেয় সাম্য, ন্যায় ও সম্প্রীতি। মার্গগুলোর সঠিক চর্চাই পারে আধ্যাত্মিক মুক্তির সাথে সমাজের যুদ্ধ, দারিদ্র্য ও অবিচার এর অবসান ঘটাতে। সূত্রপিটকের অন্তর্গত *'থেরগাথা'* গ্রন্থে অনন্য সাধারণ একটি গাথায় রয়েছে :

সুখং সুখত্থো লভতে তদাচরং
কিত্তিঞ্চ পপ্পোতি যস্স বড্ঢতি,
যে অরিয়ট্ঠঙ্গিকমগ্গং উজুং
ভাবেতি মগ্গং অমতস্স পত্তিযা'তি।[৪৫]

অর্থাৎ, যিনি সরল আর্য অষ্টবিধ মার্গ নির্বাণ প্রাপ্তির জন্য একাগ্রচিত্তে ভাবনা করেন, সেই সুখার্থী তদানুরূপ আচরণ করে ধ্যান-সুখ ও নির্বাণ সুখ লাভ করেন। সেই কারণে তিনি সুখ্যাতি অর্জন করে এবং পরিবার সম্পদ-সম্পত্তিতে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেন। আলোচনা পরিশেষে এই গাথাটির সাথে সুর মিলিয়ে বলা যায় :

মগ্গানট্ঠঙ্গিকো সেট্ঠো, সচ্চানং চতুরো পদা,
বিরাগো সেট্ঠো ধম্মানং বিপদানঞ্চ চক্খুমা।[৪৬]

অর্থাৎ, মার্গসমূহের মধ্যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ শ্রেষ্ঠ, সত্যের মধ্যে চতুরার্যসত্য শ্রেষ্ঠ। ধর্মসমূহের মধ্যে বিরাগই শ্রেষ্ঠ মানুষ্যগণের মধ্যে চক্ষুষ্মানই শ্রেষ্ঠ। সমাজজীবনে সৎ সমাধি প্রয়োজন রয়েছে। এ বিষয়ে নিচে সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো।

সমাজজীবনের ক্ষেত্র	প্রায়োগিক ব্যবহার
পরিবার	সর্বত্র মনের সংযম রক্ষা
কর্মক্ষেত্র	পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতায় মনোসংযোগ ও কর্মদক্ষতা বজায় রাখা
নেতৃত্ব	পক্ষপাতহীণ হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ
শিক্ষা	দৃঢ়তার সাথে বিশ্লেষণ
বিচার	পক্ষপাতহীন হয়ে বিচারে সহায়তা
সহনশীলতা	সর্বত্রে ধৈর্যশীল আচরণ

সারণি : ২৬

জ্ঞানীজন মাত্র আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলনের মাধ্যমে একটি নীতি নৈতিকতা সম্পন্ন আদর্শ সমাজ তৈরি করতে পারে কুশল কর্ম সম্পানের মধ্যেমে। কেননা, আটটি মার্গ একটি অপরটির সাথে সম্পর্কযুক্ত ফলে কুশল কর্মের বিন্যাস হয় সুষ্ঠভাবে। বুদ্ধ বলেছেন, কুশল ধর্মসমূহ সম্পানের জন্য বিদ্যাই অগ্রগামী, যা পাপের প্রতি লজ্জাবোধ ও ভয় জন্মায়। বিদ্বান, বিদ্যাগত এবং পণ্ডিত ব্যক্তির সম্যকদৃষ্টি উৎপন্ন হয়, সম্যকদৃষ্টি পোষণকারীর সম্যক সংকল্প উৎপন্ন হয়, সম্যক সংকল্পকারী সম্যক বাক্য বলে থাকে, সম্যক বাক্য ভাষী সম্যক কর্ম সম্পদান করে, সম্যক কর্মকারী সম্যকভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, সম্যক জীবিকা নির্বাহকারীর সম্যক ব্যায়াম বা প্রচেষ্টা উৎপন্ন হয়, সম্যক ব্যায়াম বা প্রচেষ্টাকারীর সম্যক স্মৃতি উৎপন্ন হয় এবং সম্যক স্মৃতি সম্যক সমাধি উৎপন্ন করে।[৪৭]। মূলত বুদ্ধের নির্দেশিত দেশনার মাধ্যমে মানবতা, প্রেম, প্রীতি, মমতা, ভালোবাসা এবং মানবিক গুণাবলির চর্চা হয়। এখানে বড় হয় মানবিক আবেদন ও কার্যকারিতা। প্রকৃত ধর্মেও মর্যাদা সেখানেই। ধর্ম কোনো আলাদা জীবন সত্তা নয়। ধর্ম হলো কতকগুলো নীতিগুচ্ছ ও আদর্শনিষ্ঠ মানবিক আচার-আচরণ যেখানে জীবজগৎ ও বিশ্বেও মানব সমাজকে সর্বাঙ্গীণভাবে উপকৃত করে।[৪৮]

টেকসই সমাজগঠনে বুদ্ধের ব্যবহারিক শিক্ষা-দর্শন

টেকসই সমাজগঠনে বুদ্ধের ব্যবহারিক শিক্ষা ও দর্শনের ভূমিকা অত্যন্ত গভীর ও প্রাসঙ্গিক, বিশেষ করে নৈতিকতা, সম্প্রীতি, সদ্ভাব বৃদ্ধি, চেতনা, মননশীলতা, সামাজিক এবং মানবিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে। বুদ্ধের কল্যাণকর সূত্রগুলো সামাজিক স্থিতিশীলতা, পরিবেশগত ভারসাম্য এবং ব্যক্তির আত্ম-উন্নয়নকে একসাথে সম্পৃক্ত করে যা টেকসই উন্নয়নের মূল স্তম্ভ হিসেবে কাজ করে। এ প্রসঙ্গে Walpola Rahula এর অভিমতটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য:

> 'Buddhism aims at creating a society where the ruinous struggle for power is renounced; where calm and peace prevail away from conquest and defeat; where the persecution of the innocent is vehemently denounced; where one who conquers oneself is more respected than those who conquer millions by military and economic warfare; where hatred is conquered by kindness, and evil by goodness; where enmity, jealousy, ill-will and greed do not infect men's minds; where compassion is the driving force of action; where all, including the least of living things, are treated with fairness, consideration and love; where life in peace and harmony, in a world of material contentment, is directed towards the highest and noblest aim, the realization of the Ultimate Truth, Nirvana.[৪৯]

উপসংহার

বুদ্ধের শিক্ষা-দর্শন সমাজগঠনের অন্যতম উপায় বিশেষ। তাঁর শিক্ষা অনিয়ম, দুনীর্তি, অন্যায়, অবিচার, শোষণ, বৈষম্য ও কুসংস্কার দূর করে একটি সহিষ্ণু ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজগঠনের পথ দেখায়। বর্তমান সমাজে বর্ণগোত্র, ধর্ম লিঙ্গ, শ্রেণি নির্বিশেষে অর্থনৈতিক বিভেদ দূর করতে বুদ্ধের এই শিক্ষা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তিনি জাতি,বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে রাজা ও প্রজাসাধারণ বা গৃহীদেরকে উপলক্ষ্য করে মানবজীবনের চলার পথে প্রত্যেকটি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেছেন। বুদ্ধের চিন্তা-চেতনার মূল বিষয় ছিল মানবকল্যাণ, মানবমুক্তি। অর্থাৎ, বৌদ্ধ শিক্ষাদর্শন মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ প্রদর্শন করে সাম্যতার পথ প্রদর্শন করে। মানুষের নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের উপায় প্রদর্শন করে। মানুষ নিজেই নিজের চালিকা শক্তি। মানুষ মাত্রই পারে নিজের ভাগ্যকে পরিবর্তন করতে। তার জন্য কারও সহায়তা দরকার হয় না। বুদ্ধ প্রদর্শিত উপদেশে রয়েছে বহুজনের সুখ-বহু জনের কল্যাণ এবং বহুজনের শান্তি, মানব মর্যাদাবোধসহ সকল প্রকার মানবিক কল্যাণবোধের কথা যা মানুষকে আপন মহিমায় বড় করে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। পারস্পরিক ঐক্য-সংহতি, ভ্রাতৃত্ববোধ জাগরণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে বুদ্ধ প্রদর্শিত নীতি শিক্ষা আদর্শ যুগান্ত সৃষ্টিকারী পদক্ষেপ হিসেবে অভিহিত করা হয়। বুদ্ধের শিক্ষা কেবল ব্যক্তিগত মুক্তির পথই নয় বরং এটি একটি সুশৃঙ্খল, সমতাভিত্তিক ও টেকসই সমাজগঠনের দার্শনিক ও ব্যবহারিক ভিত্তি প্রদান করে। তাঁর শিক্ষার মূলকেন্দ্রে রয়েছে কারণ ও ফলাফলের সম্পর্ক। অর্থাৎ, কার্য-কারণের সম্পর্ক, সামাজিক নৈতিকতার ভিত্তি, সামাজিক সমস্যার মূলবিশ্লেষণ, সামাজিক সংহতি, সুশাসনের কাঠামো, টেকসই পরিবেশ, অর্থনৈতিক সমতা, একতা ভিত্তিক উন্নয়ন সহমর্মিতা, নৈতিকতা ও প্রজ্ঞা যা সমাজের প্রতিটি স্তরে শান্তি, শৃঙ্খলা, সম্প্রীতি, সদ্ভাব এবং সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয়। নীতিগুলো ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত যা কিনা সর্বজনীন এবং সর্বকালীন। বুদ্ধের সর্বজনীন এই শিক্ষায় সুশৃঙ্খল টেকসই সমাজ বিনির্মাণের উপাদান বিদ্যমান রয়েছে যা অনুশীলনের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক উন্নয়নে যেমন সম্ভব তেমনি আবার আদর্শ সমাজেও পরিণত করা যায়। পরিশেষে বলা যায়, বুদ্ধের শিক্ষা আদর্শ ও শৃঙ্খলিত সমাজবির্নিমাণের জন্য অপরিহার্য সহায়তা করে ।

তথ্য নির্দেশিকা ও টীকা

১. শ্রীমৎ জ্যোতিঃপাল ভিক্ষু অনূদিত, *উদান*, পরিমার্জিত সংস্করণ (চট্টগ্রাম : ত্রিপিটক রিসার্চ সোসাইটি, ১০১৯), পৃ. ২১

২. প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, *মহাবর্গ* (কলিকাতা : যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ত্রিপিটক ট্রাষ্ট বোর্ড, ২০১৩), পৃ. ২

৩. বিশুদ্ধনন্দ মহাস্থবির, *সত্যদর্শন* (কলিকাতা : ১৯৫৩), পৃ. ৫১

৪. ভদন্ত, প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু, *অঙ্গুত্তর নিকায়*, দশম ও একাদশ নিপাত (রাঙ্গামাটি : রাজবন বিহার, ২০১১), পৃ, ১৪০

৫. শ্রীমৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ভিক্ষু, *অভিধর্ম পিটকে বিভঙ্গ (*চট্রগ্রাম : ২০১২), পৃ. ২৮০-২৮৩

৬. প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৪৯

৭. অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া, *অঙ্গুত্তর নিকায়* (এক, দুক, তিক নিপাত), প্রথম খণ্ড (রাঙ্গামাটি : বনভান্তে প্রকাশনী, ২০০৪), পৃ. ১৯৭

৮. *অভিধর্মপিটকে বিভঙ্গ*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৫০

৯. শীলানন্দ ব্রহ্মচারী অনূদিত, *সংযুক্ত নিকায়*, ১ম ও ২য় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ (রাঙ্গামাটি: সদ্ধর্মপ্রাণ দায়ক-দায়িকা, ২০০৯), পৃ. ১৬৫

১০. *অভিধর্মপিটকে বিভঙ্গ*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৫০

১১. প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৫০

১২. প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৫০

১৩. সুভূতি রঞ্জন বড়ুয়া, অভিধমার্থ-সংগ্রহ (কলিকাতা : *ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী*, ১৯৯১), পৃ. ১৫

১৪. গিরিশচন্দ্র বরুয়া, *ধম্মপদ*, দ্বিতীয় প্রকাশ (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৭৭) পৃ. ১৮০

১৫. *অভিধর্মপিটকে বিভঙ্গ*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৫০

১৬. প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৫০

১৭. প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৫১

১৮. প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৫১

১৯. ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, *দীর্ঘনিকায়*, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় প্রকাশ (চট্টগ্রাম : ২০০৭), পৃ. ২১৫

২০. প্রাগুপ্ত, পৃ. ২১৫

২১. শ্রীমৎ জ্যোতিঃপাল ভিক্ষু অনূদিত, *উদান*, পরিমার্জিত সংস্করণ (চট্টগ্রাম : ত্রিপিটক রিসার্চ সোসাইটি, ২০১৯), পৃ. ২১

২২. *অভিধর্মার্থ-সংগ্রহ*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৩০৭

২৩. *দীর্ঘনিকায়*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুপ্ত, পৃ. ২১৫

২৪. *ধম্মপদ*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১১৯

২৫. বেণীমাধব বড়ুয়া, *মধ্যম নিকায়*, প্রথম খণ্ড (কলিকাতা : যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ত্রিপিটক বোর্ড, ১৯৪০), পৃ. ৮২

২৬. *অভিধর্মপিটকে বিভঙ্গ*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১১৫

২৭. ভিক্ষু শীলভদ্র, *দীর্ঘনিকায়*, তৃতীয় খণ্ড (রাঙ্গামাটি : ২০০৭), পৃ. ১৮৫

২৮. আর্যসত্য সম্পর্কিত সম্যক দৃষ্টি চারটি :

- দুঃখ আর্যসত্য সম্পর্কীয় সম্যক দৃষ্টি।
- দুঃখের কারণ আর্যসত্য সম্পর্কীয় সম্যক দৃষ্টি।
- দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য সম্পর্কীয় সম্যক দৃষ্টি।
- দুঃখ নিরোধ এর উপায় আর্যসত্য সম্পর্কীয় সম্যক দৃষ্টি।

২৯. দশবস্তু সর্ম্পকিত সম্যক দৃষ্টি হলো : প্রাণিহত্যা, চুরি করা, মিথ্যা কামাচার, মিথ্যা কথা, পিশুন বাক্য, কর্কশ বাক্য, সম্প্রলাপ বাক্য, পরধনে লোভ, হিংসা করা, মিথ্যাদৃষ্টি।

৩০. *ধম্মপদ*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১১৯

৩১. *অভিধর্মপিটকে* বিভঙ্গ, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১১৩

৩২. প্রাগুপ্ত, পৃ. ১১৫

৩৩. সাধনানন্দ মহাস্থবীর বনবন্তে অনূদিত, *সুত্তনিপাত*, (রাঙ্গামাটি : ১৯৮৭) পৃ. ১০২

৩৪. প্রাগুপ্ত, পৃ. ২৬

৩৫.ভদন্ত প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু, *অঙ্গুত্তর নিকায়*, পঞ্চম নিপাত (রাঙামাটি : রাজবন বিহার, ২০০৮), পৃ. ২৩২

৩৬. *সুত্তনিপাত*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৭১

৩৭. প্রাগুপ্ত, পৃ. ১১৬

৩৮. *অভিধর্মপিটকে* বিভঙ্গ, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১১৩

৩৯. প্রাগুপ্ত, পৃ. ১১৩

৪০. চতুর্থ অধ্যায়ে পঞ্চ বাণিজ্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

৪১. *অভিধর্মপিটকে* বিভঙ্গ, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১১৩

৪২. ড. বিনয়েন্দ্র নাথ চৌধুরী অনূদিত, *মধ্যম নিকায়*, তৃতীয় খণ্ড (কলিকাতা : ১৯৯৩), পৃ. ৮২

৪৩. *দীর্ঘনিকায়*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৯৭

৪৪. ড. জিনবোধি ভিক্ষু, *তথাগত বুদ্ধের বোধি-বিধি* (চট্টগ্রাম : ২০০৩), পৃ. ৭৪

৪৫. স্থবির, *থেরগাথা*, প্রথম সংস্করণ (রেঙ্গুন বৌদ্ধ মিশন প্রেসে মুদ্রিত : ১৯৩৫), পৃ. ৫০

৪৬. *ধম্মপদ*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৫১

৪৭. শ্রীমৎ বঙ্গীস ভিক্ষু, শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু, শ্রীমৎ প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু, *সূত্র পিটকে সংযুক্ত নিকায়* (খাগড়াছড়ি : ২০১১), পৃ. ১

৪৮.অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া, *ত্রিপিটকে বৌদ্ধ নীতি-সমীক্ষা ও ধর্ম-দর্শন এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ* (ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০২১), পৃ. ২৯৭

৪৯. Walpola Rahula, *What the Buddha Taught*, Second and enlarged edition (Gordon Fraser Gallery : 1978), p.88-89

তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

টেকসই পরিবেশ সংরক্ষণে বুদ্ধের শিক্ষা

১. প্রারম্ভিকা

পরিবেশ ও মানবজীবন একে-অপরের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। মানবজীবনের অস্তিত্ব ও উন্নতির জন্য প্রকৃতির সুস্থতা অপরিহার্য। পরিবেশের উপাদান ও মানবজীবনের নির্ভরতা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এক্ষেত্রে উল্লেখ থাকে যে, পরিবেশের উপাদান বায়ু আর বিশুদ্ধ বায়ু ছাড়া মানুষ কখনো বাঁচতে পারে না। দূষিতবায়ু অর্থাৎ, বায়ুদূষণ শ্বাসকষ্ট, হৃদরোগ, সর্দি, কাশি ও মরণব্যাধী ক্যান্সারের মতো রোগ সৃষ্টি করে। পরিবেশের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো পানি আর পানির অপর নাম জীবন। মানবজীবনের জন্য বিশুদ্ধ পানির বিকল্প নেই। একইসাথে পানি কৃষি, গাছ-পালা ও শিল্পেরও জন্য অপরিহার্য। দূষিত পানি ডায়রিয়া, কলেরাসহ অন্যান্য পানিবাহিত রোগের কারণ। উর্বর মাটি খাদ্য উৎপাদনের ভিত্তি যা পরিবেশের উপাদান। মাটিতে রাসায়নিক সারের অত্যধিক ব্যবহার ও ভূমি দূষণের সাথে খাদ্য নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলে। গাছ-পালা, প্রাণী ও অনুজীব পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। যেমন করে মৌমাছি ও অন্যান্য পরাগায়ণকারী না থাকলে ফসল উৎপাদন বিঘ্নিত হয়। একইসাথে পরিবেশ দূষণের প্রভাব জলবায়ু পরিবর্তন গ্রিনহাউস গ্যাসের বৃদ্ধি বিশ্ব উষ্ণায়ন ঘটাচ্ছে যার ফলে একদিকে প্রতিনিয়ত বরফ গলে বন্যা হচ্ছে আবার অন্যদিকে খরা, তাপপ্রবাহ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাড়ছে। স্বাস্থ্যগত সমস্যা হিসেবে বায়ু ও পানি দূষণ ফুসফুসের রোগ, ত্বকের সমস্যা ও ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়। অর্থনৈতিক ক্ষতি হচ্ছে দূষণ ও প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয় কৃষি, মৎস্য ও পর্যটন শিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। সর্বোপরি যুগপোযোগী পরিবেশ মানবজীবন, মানবসমাজ, মানবসভ্যতার, মানবইতিহাসের জন্য আর্শীবাদস্বরূপ। বুদ্ধ তাঁর শিক্ষায় পরিবেশকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি পরিবেশ রক্ষায় খুব সচেতন ছিলেন। তাঁর জীবনের প্রতি পর্যায়ে পরিবেশের সাথে সম্পর্ক দেখা যায়। ভিক্ষু-সংঘ এবং সাধারণ দায়কদেরকে দেশনাকালে তিনি পরিবেশের উপাদানের সাথে তুলনা করে দেশনা প্রদান করেছেন। বুদ্ধের জীবন-দর্শন ও পরিবেশ প্রাচীন ভারতের সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গভীরভাবে ও নিবিড়ভাবে প্রোথিত। তাঁর শিক্ষা ও দর্শন পরিবেশ-সচেতনতা, সহমর্মিতা ও সাম্যবাদের উপর গুরুত্বারোপ করে। বুদ্ধের জীবন ও দর্শন শুধু আধ্যাত্মিক মুক্তিই নয়, বরং প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপনের শিক্ষা দেয়। তাঁর শিক্ষা আজও পরিবেশ সুরক্ষা, টেকসই উন্নয়ন ও মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে চলেছে। বুদ্ধের জীবন ও দর্শন প্রকৃতপক্ষে একটি গভীর পরিবেশ, সামাজিক ন্যায়বিচারভিত্তিক ও আধ্যাত্মিক বিপ্লব ছিল, যা খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর ভারতের বৈচিত্র্যময় প্রেক্ষাপটে বিকশিত হয়েছিল। যেখানে বৌদ্ধ দর্শনে সরাসরি পরিবেশ এর সাথে সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়। কেননা প্রকৃতি ও পরিবেশকে বুদ্ধ মানবজীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। পরিবেশকে কেন্দ্র করে করেই সকল প্রকার জীবের

বেড়ে উঠা ও জীবন ধারণ করা। অর্থাৎ, একটি সুস্থ, সুশৃঙ্খল,স্বাভাবিক পরিবেশ একটি আদর্শ সুস্থ, সুশৃঙ্খল সমাজ বিনির্মাণের সহায়ক শক্তিস্বরূপ।

২. পরিবেশ

'পরিবেশ' একটি বিস্তৃত শব্দের নাম। পরিবেশ হলো চারপাশের জীবিত ও নির্জীব উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত একটি ব্যবস্থাকে বোঝায়, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানবসহ সকল প্রাণীর জীবনকে প্রভাবিত করে। এটি এমন একটি গতিশীল আন্তঃসম্পর্কিত ব্যবস্থা, যেখানে প্রকৃতি, মানুষ, প্রাণী, উদ্ভিদ, জলবায়ু এবং সম্পদ একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এটি শুধু ব্যক্তির বেঁচে থাকার জন্যই নয়, বরং সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যও অপরিহার্য। 'পরিবেশ' ইংরেজিতে 'Environment' -যা ফরাসি 'Environia' থেকে 'Environment' -শব্দটির উৎপত্তি। *'বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান'*- গ্রন্থে বর্ণিত করা হয়েছে এভাবে : 'চারপাশের অবস্থা, পরিমণ্ডল, প্রতিবেশ।[১] 'পরিবেশ' বা Environment' সচরাচর জৈবিক সত্তার পরিবেষ্টনকারী প্রত্যেক উপাদানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থাৎ, উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রয়োজন সেই অবস্থাকে পরিবেশ বলে।[২] *'Oxford Advanced Learner's Dictionary'* -গ্রন্থে পরিবেশের ধারণা তুলে ধরা হযেছে এভাবে : 'the natural world in which individuals, creatures and plants live'.[3] পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে জীব জগতের সকল কিছু। পরিবেশ চারপাশের জীব জগতের সমস্ত কিছুর উপর গভীর প্রভাব ফেলে। এটি শুধুমাত্র উদ্ভিদ, প্রাণী, এবং অণুজীবের বেঁচে থাকা ও বিকাশই নিয়ন্ত্রণ করে না, বরং বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য, তাদের আচরণ এবং বিবর্তনকেও প্রভাবিত করে। আর এই পরিবেশের উপাদান এর মধ্যে যে বিষয়বস্তু রয়েছে তার একটি সামগ্রিক ধারণা নিম্নে সারণির মাধ্যমে তুলে ধরা হলো :

প্রাকৃতিক উপাদান	অপ্রাকৃতিক উপাদান	মানবসৃষ্ট উপাদান
মানুষ	বাতাস	কলকারখানা
গাছপালা	অক্সিজেন	যানবাহন
পোকামাকড়	কার্বন ডাই-অক্সাইড	সকল প্রকার বর্জ্য
পশু-পাখিসহ সমস্ত জীবজগৎ	নদী-নালা, সমুদ্র	রাসায়নিক সার, কীটনাশক, বন উজাড়
জলজ প্রাণী	বৃষ্টিপাত	রাস্তাঘাট, বাঁধ, আবাসন প্রকল্প
ব্যাকটেরিয়া	ভূগর্ভস্থ জল	শব্দ দূষণ, বায়ু দূষণ, জল দূষণ, মাটি দূষণ
ছত্রাক	মাটি, খনিজ, শিলা	সকল প্রকার স্থাপনা, দালান-কোঠা, অফিস-আদালত, ঘর-বাড়ি ইত্যাদি
ভাইরাস	পাহাড়	কৃষি ও বনায়ন

সারণি : ১

মূলত পরিবেশ হচ্ছে একটি জায়গার চারপাশের নানা উপাদানের সামগ্রিকরূপ যা ব্যক্তিকে দৈনন্দিন নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ-কর্মে, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে বেশ প্রভাব সৃষ্টি করে। প্রাণী থেকে উদ্ভিদ প্রত্যেকেই প্রভাবিত হয়

এই পরিবেশের মাধ্যমে। চারপাশের পরিবেশের উপাদানগুলো হলো এটি সমাজের প্রাকৃতিক, অপ্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট উপকরণ যা সচরাচর একটি নির্দিষ্ট স্থান তথা সমাজের চারপাশের জীবনব্যবস্থাকে গঠন করে। উপরি-উক্ত সকল উপাদান একটি অপরটির সাথে সম্পর্কযুক্ত যা কিনা একটি সুস্থ বাস্তুতন্ত্রের জন্য এগুলোর মধ্যেকার ভারসাম্য বজায় রাখা অপরিহার্য। সহজভাবে সূর্যালোক ব্যবহার করে গাছপালা খাদ্য তৈরি করে এবং অক্সিজেন ছেড়ে দেয় আর মানুষ অক্সিজেন গ্রহণ করে কার্বন নিঃসরণ করে। ফলে পর্যাপ্ত বনায়ন এর কারণে জলবায়ু পরিবর্তন ঘটায় যা প্রাণী ও উদ্ভিদের উপর প্রভাব ফেলে। পরিবেশের প্রত্যেকটি বিষয় এরকম চক্রাকারে আবর্তিত হয়ে সামগ্রিক ভাবে প্রভাব ফেলে।

বৌদ্ধযুগে প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যাপারে সাধারণ মানুষের মধ্যে এক অসাধারণ গণচেতনা সৃষ্টি হয়েছিল। পশুবলি প্রায় লোপ পেয়েছিল, উদ্ভিদ ও পশু-পাখির প্রতি সমস্ত রকম নিষ্ঠুরতা খুবই নিন্দনীয় ছিল। বৌদ্ধ দর্শনের জাতক সাহিত্যের কাহিনিগুলোর মধ্যে মানুষ ও পশু-পাখির এক পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের নির্দশন দেখা যায়। মানবসভ্যতার সূচনালগ্নে সবুজ, গাছপালায় আচ্ছাদিত ঘন বন-জঙ্গলে সমাকীর্ণ ছিল পৃথিবী। প্রাণীর অবাদ বিচরণক্ষেত্র ছিল সেই সবুজ বন-বনাঞ্চল। প্রকৃতির সৌন্দর্যে গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ, মহী, সিন্ধু, সরস্বতী, রাপতি, তিস্তা, চন্দ্রভাগা, ভাগীরথী এবং এদের অসংখ্য শাখা নদী, উপনদী প্রভৃতি ছিল নগর সভ্যতায় প্রকৃতির অপূর্ব সৌন্দর্যের প্রতীক।[৪]

এই সুন্দর প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর প্রতিনিয়ত নানাভাবে মানুষ বিরুদ্ধাচরণ করে চলেছে। মানুষ নিজেরাই পরিবেশের সাথে বিরূপ আচরণ করে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে সমাজ ও সংস্কৃতিকে করে তুলছে বিপর্যস্ত। ভূ- পরিবেশ আজ মানুষের স্বেচ্ছাচারী কাজের জন্য বিপন্ন। সেই সাথে মানুষ আগামীর দিন নিয়ে শঙ্কিত এবং ভীত। Peter Raven তাঁর "We Are Killing Our World" with a similar sense of urgency regarding the magnitude of the environmental crisis" শিরোনামের প্রবন্ধে বলেন এভাবে :"The world that provides our evolutionary and ecological context is in serious trouble, trouble of a kind that demands our urgent attention. By formulating adequate plans for dealing with these large-scale problems, we will be laying the foundation for peace and prosperity in the future; by ignoring them, drifting passively while attending to what may seem more urgent, personal priorities, we are courting disaster." [৫]

এমতাবস্থায় পরিবেশ নিয়ে সবাইকে আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন হতে হবে। পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনমত গড়ে তুলতে হবে। পরিবেশ শান্তি, সম্প্রীতি বৃদ্ধিকরণেও বেশ প্রভাব রাখে।

পরিবেশ বিষয়ক ভাবনা একেবারে নতুন কোনো ভাবনা নয়। পৃথিবীর প্রাচীন সব সভ্যতা, ধর্মীয়গ্রন্থ, সাহিত্য, সমাজচিন্তা এবং বিজ্ঞানসম্মত ভাবনায় পরিবেশ বিভিন্নভাবে স্থানলাভ করে রয়েছে। বলা বাহুল্য যে, মানুষ ও পরিবেশ একে-অপরের উপর নির্ভরশীল। একটু সহানুভূতিই পারে উভয়-উভয়কে বিশাল ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে তথা বাঁচাতে। কেবল অবৈরী ও প্রীতিময়ভাবই পারে উভয়ের মধ্যে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব তৈরী করতে। পরস্পরের

মধ্যে সুসম্পর্ক কিংবা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজমান না থাকলে বা বৈপরীত্যমূলক মনোভাব থাকলে সভ্যতার বিলুপ্তিকে রোধ করার সাধ্য কারও থাকবে না। পৃথিবীতে সকলের আলাদা আলাদা বাসস্থান রয়েছে। অনেক সময় মানুষ নিজেদেরকে অন্যান্যদের চেয়ে বড় মনে করে প্রকৃতির উপর নির্মম অত্যাচার করে। যার প্রভাব সমগ্র পরিবেশের উপর পড়ে। এ বিষয়ে Stephen Clark বলেন:'Those who would live virtuously, tradition tells us, must seek to allow each creature its own place, and to appreciate the beauty of the whole. It is because human beings can sometimes come to see that whole, and know their own place in it, that—in a sense—they are superior to other forms. Our 'superiority', insofar as that is real, rests not upon our self-claimed right always to have more than other creatures do ... but on the possibility that we may (and the corresponding duty that we should) allow our fellow creatures their part of the action'.[৬]

চিত্র ১ : পৃথিবীতে পরিবেশের অবস্থান

Source : https://www.momscleanairforce.org/dalai-lama-climate-appeal-to-the-world-book/

মানুষ, পরিবেশ ও প্রকৃতিকে আলাদা করা যায় না কখনো। প্রকৃতির এবং মানুষ মধ্যে সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে নিবিড় সুসম্পর্ক বিরাজমান। বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত বর্তমান পরিবেশ। কেন যেন পরিবেশ তার চির চেনা-জানা আপনরূপ হারিয়েছে। ফলে প্রতিনিয়ত দূষিত হচ্ছে মাটি-পানি-বায়ু। বায়ুমণ্ডলে অবিরত উষ্ণতা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। লোভে আগ্রাসী হয়ে মানুষ বন ও পাহাড় কেটে এবং জলাশয় ভরাট করে বাড়ি-ঘর নির্মাণ করছে প্রতিনিয়ত। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য কলকারখানা নির্মাণ করছে। ময়লা-আবর্জনা, প্লাস্টিক ও বর্জ্য ফেলে নদ-নদী ও সমুদ্রের পানিকে দূষিত করছে। মানুষ নিজের সুখের আশায় জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্য করে গড়ে তোলার জন্য প্রকৃতির

বিভিন্ন সম্পদকে নিজের মতো করে ব্যবহার করছে। ফলশ্রুতিতে সুখ-কল্যাণ বয়ে তো আনছেই না বরং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ আনয়নের সৃষ্টি করে দিচ্ছে। এমতাবস্থায় নানাবিধ প্রজাতির প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। আর পরিবেশ থেকে প্রতিনিয়ত হারিয়ে যাচ্ছে জীববৈচিত্র্য। বর্তমান পরিবেশবাদকে গুরুত্ব দিয়ে কথা-বার্তা বলা হয়। এখানে পরিবেশবাদ বলতে অখণ্ড মানবজাতির সুস্থ স্বাভাবিকভাবে প্রকৃতির সাথে মমতাময় বন্ধুত্ব গড়ে তুলে বেঁচে থাকার মতবাদকে বোঝায়। তাই পরিবেশকে সুন্দর, সুস্থ, এবং স্বাভাবিক রাখা সকলের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। আধুনিকতার ছোঁয়ার প্রাকৃতিক পরিবেশ শুধু প্রভাবিত হয়েছে তা নয়, মানবজীবনও প্রভাবিত হয়ে বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সামাজিক পরিবেশও একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত। সেই হিসেবে পরিবেশ দুই ভাগে বিভাজিত : প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সামাজিক পরিবেশ।[৭] প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর সামাজিক পরিবেশ নির্ভরশীল। বলা যায়, মানুষ নিজে প্রকৃতির অবিভাজ্য অঙ্গ। তাই মানব অস্তিত্বকে ধরে রাখতে হলে পরিবেশের দীর্ঘস্থায়িত্বের জন্য সবার একসাথে লড়াই-সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

৩. পরিবেশ সংরক্ষণে বুদ্ধের শিক্ষা-দর্শন

মহামতি বুদ্ধের শিক্ষা-দর্শনে পরিবেশের গুরুত্ব অত্যন্ত বিস্তৃত। বুদ্ধের বোধিলাভের সময়ে পৃথিবীর সকলপ্রকার প্রাকৃতিক ঘটনাগুলোর মধ্যে কার্যকারণ নীতিমালা ছিল অন্যতম আবিষ্কার। জীবের দুঃখের মূল কারণ হলো জন্মমৃত্যু চক্রে সে বারবার আবর্তিত হয়। এই কার্যকারণ নীতিমালাকে প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতিও বলা হয় যা দ্বাদশ নিদান নামেও পরিচিত। এগুলো হলো : অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নাম-রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি এবং জরা-মরণ-ব্যাধি- শোক-দুঃখ ইত্যাদি।[৮] এই কার্যকারণ নীতিমালার প্রতিটি বিষয় পূর্ববর্তী বিষয়ের সাথে পরস্পর পস্পেরের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। বুদ্ধের শিক্ষা-দর্শনে বিশ্ব-জগতের সবই প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তশীলতাকে বলা হয় অনিত্যতা যা বুদ্ধের শিক্ষা-দর্শনে সবচেয়ে বড় স্তম্ভ। পরিবেশ বিদ্যার আলোকে বুদ্ধের শিক্ষা-দর্শনে অনিত্যতার সূত্র একান্তভাবে প্রযোজ্য। বাস্তুচক্রের (Eco-system) প্রতিটি উপাদান একে-অপরের উপরে নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতার জোড়েই প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় থাকে। মানুষ এই চক্রের বাহিরে নয়। মানুষ বাস্তুচক্রের একটি উপাদান। লোভাসক্ত হয়ে প্রকৃতির প্রভু হতে গিয়ে মানুষ অবিরত সর্বনাম ডেকে আনছে। বুদ্ধ দৃপ্তকণ্ঠে বলেছিলেন যার উৎপত্তি আছে তার বিনাশও রয়েছে। অর্থাৎ, দুঃখ আছে দুঃখের বিনাশও আছে। এ প্রসঙ্গে তিনি চারি আর্যসত্যের কথা বলেছিলেন।[৯] যথা : দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখ নিরোধ এবং দুঃখ নিরোধের উপায়। এখানে এই চারি আর্যসত্যের সাথে পরিবেশেরও একটি সম্পর্ক রয়েছে। যেমন: দুঃখ: লোভের কারণে পরিবেশ নষ্ট বা ধ্বংস হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে মানবজাতির দুঃখ। দুঃখের কারণ: লোভের মূল কারণ আসক্তি বা অজ্ঞানতা। দুঃখ নিরোধ: লোভ দমন করে সংযত জীবনযাপন। দুঃখ নিরোধের উপায় : আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ যথা : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধির যথার্থ অনুশীলনের মাধ্যমে লোভ দমন। বুদ্ধের প্রদত্ত শিক্ষা পরিবেশ ও প্রকৃতির সাথে

ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপন পাশাপাশি মৈত্রী, অহিংসা এবং সকলপ্রাণীর উপর করুণার উপর দৃষ্টি নিবন্ধ করে। বুদ্ধ অহিংসার উপর যে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন পরিবেশ রক্ষার জন্য তা একটি চরম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। গুণবান ব্যক্তি মাত্রই উদ্ভিদ এবং প্রাণী তো বটেই এমন কি বীজের বিনাশ করতেও বিরত থাকে। অহিংসার প্রয়োগ শুধু বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান ও কায়িক কর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর গুরুত্ব মানসিক চিন্তা- চেতনা ও ধ্যান-ধারণায়ও পরিব্যপ্ত। সুতরাং পরিবেশ সংরক্ষণে অহিংস চেতনাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বুদ্ধ পরিবেশের সাথে নিবিড়ভাবে বসবাস করতেন এবং তাঁর অনুসারীদের প্রকৃতির যত্ন নিতে শিক্ষা দিয়েছিলেন। বুদ্ধ সকলের জন্য পাঁচটি নীতির প্রবর্তন করেছিলেন যা পঞ্চশীল[১১] এই পঞ্চশীল গৃহীবিনয় নামেই ব্যাপক পরিচিত। পঞ্চশীলের প্রথম নীতি হলো সকল প্রকার প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকা। নীতিটি মৈত্রীর উপর প্রতিষ্ঠিত যা প্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণে নীতি হিসেবে দেখা যায়। বুদ্ধ মধ্যম পথের কথা বলেন যেটি অতিরিক্ত ব্যবহার ও সম্পদের অপচয় রোধ করতে সহায়তা করে।[১২] আজকের পৃথিবীতে ভোগবাদী সমাজব্যবস্থাপনায় পঞ্চশীলের প্রথম নীতিটি প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহারকে উৎসাহ প্রদান করে। প্রত্যেক ধর্মে প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা রয়েছে। ধর্মীয় পরিবেশগত নৈতিকতা টেকসই পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ বিষয়ে J. Baird Callicott-এর উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ। তিনি বলেন : 'the conceptual resources" of the religious traditions as a means of creating a more inclusive global environmental ethics.'[১৩] বৌদ্ধধর্মেও এ বিষয়ে চমৎকার তথ্য ও উপাত্ত রয়েছে যা বৌদ্ধ সাহিত্য থেকে জানা যায়। বুদ্ধ সকলের প্রতি মৈত্রী, করুণা এবং অহিংসময় আচার-আচরণ দ্বারা পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার উল্লেখ করেন। বুদ্ধ সকল জীবের মঙ্গলকামী এবং সকল প্রাণীর সুরক্ষার কথা বলেন। এ বিষয় Alan Sponberg তাঁর 'Green Buddhism and the Hierarchy of Compassion' প্রবন্ধে বলেন : 'the need to assess traditional Buddhism more accurately, first, by noting that Buddhism often encouraged a hierarchical beginning of the human and natural world, and second, by recognizing the usefulness of what he calls the "hierarchy of compassion, sympathy, kindness " in contributing to a specifically Buddhist attitude to environmental principles'.[১৪] মানুষ নানাভাবে পরিবেশ ও প্রকৃতিকে ধ্বংস করছে। বুদ্ধ প্রকৃতির সাথে মানুষের সহাবস্থানকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন যা বুদ্ধজীবন-দর্শনে দেখতে পাই। এই সম্পর্কে Kabilsingh, C. তাঁর 'An ethical approach to environmental education. বলেন এভাবে: 'It also emphasizes kindness, admiration for all living individuals, and harmony between living things sharing the planet'[১৫] পরিবেশ সুরক্ষা এবং সংরক্ষণের জন্য বুদ্ধ অসামান্য দৃষ্টিভঙ্গী প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি তাঁর শিষ্য এবং অনুসারীদেরকে প্রকৃতিকে ভালোবাসতে এবং সম্মান করতে উপদেশ দিয়েছিলেন।[১৬] মহামতি বুদ্ধ আজ থেকে ২৫০০ বছরেরও পূর্বে বর্তমান নেপালের কপিলবাস্তুতে জন্মগ্রহণ করেন। 'বুদ্ধ' একটি গভীর অর্থবোধক শব্দ যার অর্থ 'মহাজ্ঞানী'। মানবপ্রেমের পরিপূর্ণ

বিকাশ লক্ষ্য করা যায় বুদ্ধের জীবন-দর্শনে। এক মৌলিক চিন্তাধারা প্রচারের মাধ্যমে গৌতম বুদ্ধ ভারতীয় চিন্তাধারার গতিপথ প্রদর্শন করেন।[১৭] পরিবেশ বিষয়ে আত্মসচেতন হবার জন্য পথপ্রদর্শন করেন। তিনি তাঁর অনুসারীদের পরিবেশকে সংরক্ষণের উপদেশ প্রদান করতেন। তাঁর উপদেশে পরিবেশ এবং মানুষের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের কথাও বিরাজমান। *'সংযুক্ত নিকায়'* গ্রন্থের 'বনরোপ সূত্র'-মাধ্যমে জানা যায় যে, যারা ফুল ও ফলের উদ্যান রচনা করেন, বন রোপন করেন, সেতু নির্মাণ করেন এবং জলপত্র, জলাশয় ও পান্থনিবাস দান করেন, তাদের পুণ্য বর্ধিত হয় এবং সে ব্যক্তিগণ ধর্মস্থ শীলসম্পন্ন ও স্বর্গগামী।[১৮] বুদ্ধের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অবিস্মরণীয় ঘটনাগুলো পরিবেশকে ঘিরেই সঙ্ঘটিত হয়। এই অবিস্মরণীয় ঘটনাগুলোর হলো :

ঘটনা	স্থান	তাৎপর্য	উৎস
বুদ্ধের জন্ম	লুম্বিনী উদ্যানে বর্তমান নেপাল	এটি একটি পবিত্র উদ্যান, যা প্রকৃতির মাঝে মানবজীবনের সূচনাকে প্রতীকী করে। বর্তমানে লুম্বিনী সংরক্ষিত অরণ্য ও জীববৈচিত্র্যের কেন্দ্র।	Narada Maha Thera, *Buddha and His Teaching* (Taiwan: The Corporate Body of the Buddha Education Foundation), P. 1
বুদ্ধত্ব লাভ	গয়ার বোধিবৃক্ষ, বিহার রাজ্য, ভারত	প্রকৃতির মাঝে নীরব ধ্যানের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জন, যা প্রকৃতি ও মানব মনের সম্পর্ককে নির্দেশ করে।	প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত, *মহাবর্গ*, তাইওয়ান: সন অনুল্লেখিত, করপর‍্যাট বডি অব দি বুদ্ধ এডুকেশনাল ফাউন্ডেশন), পৃ. ১
ধর্মচক্র প্রবর্তন	বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদাবে, উত্তর প্রদেশ, ভারত	মৃগদাব হলো হরিণের বন। এটি প্রাণী ও মানুষের সহাবস্থানের প্রতীক। বুদ্ধের শিক্ষার সূচনা একটি শান্তিপূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশে হয়েছিল, যা অহিংসা ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার বার্তা বহন করে।	প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত, *মহাবর্গ*, তাইওয়ান: সন অনুল্লেখিত, করপর‍্যাট বডি অব দি বুদ্ধ এডুকেশনাল ফাউন্ডেশন), পৃ. ১০-১১
মহাপরিনির্বাণ	কুশিনারার যমক শালবৃক্ষের নিচে, উত্তর প্রদেশ, ভারত	বুদ্ধের অন্তিম মুহূর্তও প্রকৃতির কোলে সংঘটিত হয়েছিল। শালগাছ বৌদ্ধধর্মে মুক্তি ও স্থিতিশীলতার প্রতীক।	রাজগুরু ধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির অনূদিত, *মহাপরিনিব্বানং সূত্ত* (তাইওয়ান: সন অনুল্লেখিত, করপর‍্যাট বডি অব দি বুদ্ধ এডুকেশনাল ফাউন্ডেশন), পৃ. ১৬৯

সারণি : ২

বুদ্ধের জীবনের কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা চিত্রগল্পের মধ্যমে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো যেগুলো প্রমাণ করে পরিবেশ সাথে তাঁর গভীর সম্পৃক্ততা। যা থেকে সহজেই প্রতিয়মান হয় যে বুদ্ধ, প্রকৃতি, পরিবেশ, পরিবেশের উপাদান বৃক্ষ, লতাপাতা, ফুল, পশু, পাখি, জীব, জন্তু, নদী, পর্বত, মাটি, ঘাস প্রভৃতি যেন একে অপরের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে আছে।

চিত্র ২ : লুম্বিনী উদ্যানে সিদ্ধার্থের (বুদ্ধ) জন্ম

Source : https://www.sundaytimes.lk/110109/Plus/plus_12.html

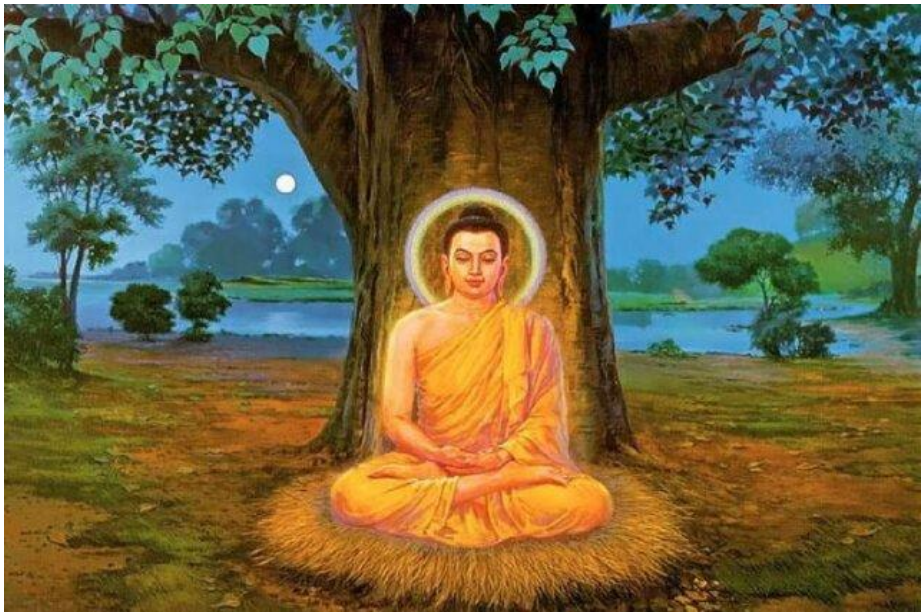

চিত্র ৩ : বোধিবৃক্ষের নিচে সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্ব লাভ

Source : https://www.researchgate.net/publication/341519914_The_Age_Of_The_Eco-Sattva_Practical_Conservation_Consequences_Of_Buddhist_Belief/figures?lo=1

চিত্র ৪ : বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদাবে বোধিলাভের পর ধর্মচক্র প্রবর্তন বা ধর্মপ্রচার

Source : https://in.pinterest.com/pin/1122382156833536l3/

চিত্র ৫ : কুশিনারার যমক শালবৃক্ষের নিচে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভ

Source : https://in.pinterest.com/pin/781163497851991015/

উপরি-উক্ত চিত্রের মাধ্যমে বুদ্ধের জন্ম, বোধি লাভ এবং মহাপরিনির্বাণ লাভের মধ্য দিয়ে বুদ্ধজীবনে সাথে পরিবেশের একটি চমৎকার সম্পর্ক দেখতে পাই। এ বিষয়ে Chatsumarn Kabilsingh -এর নিম্নের উক্তিটি বিশেষভাবে স্মরণ যোগ্য। তিনি বলেন: 'From the time the Buddha left his palace Buddhism has been associated with forests. The Buddha's quest for the truth (saccadhamma) took place in the forest. It was in the forest that for six years he sought to overcome suffering and it was under the Bodhi tree that he attained enlightenment. Throughout his life the Lord Buddha was involved with forests, from his birth in the forest garden of Lumbini under the shade of a Sal tree to his parinibbana under the same kind of tree. Thus, Buddhism has been associated with the forest from the time of the life of its founder'.[19]

তাছাড়াও '*খুদ্দক নিকায়*' গ্রন্থের অন্তর্গত '*বুদ্ধবংশ*' গ্রন্থে গৌতম বুদ্ধের পূর্বে ২৪ জন বুদ্ধের আবির্ভাবের কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে। এবং এই গ্রন্থের মাধ্যমে আরো জানা যায় যে, তাঁরা সকলেই বৃক্ষমূলকেই ধ্যান-সাধনার উপযুক্ত স্থান হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। অর্থাৎ, বিভিন্ন বৃক্ষতলে তাঁরা সাধনা করে বোধি জ্ঞান লাভ করেছিলেন। নিম্নে একটি সারণির[২০] মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো :

ক্রমিক নং	বুদ্ধের পরিচিতি	বোধি লাভের স্থান	পরিচিতি
১	দীপঙ্কর বুদ্ধ	শিরীষ বৃক্ষের নিচে	রম্যবতী নগর, পিতার নাম সুদেব ক্ষত্রিয়, মাতার নাম সুমেধা
২	কৌণ্ডিন্য বুদ্ধ	শালকল্যাণী বৃক্ষের নিচে	রম্যবতী নগর, পিতা সুনন্দ নামক ক্ষত্রিয় ও মাতা সুজাতা দেবী
৩	মঙ্গল বুদ্ধ	নাগেশ্বর বৃক্ষের নিচে	উত্তর নগর, পিতা উত্তর নামক ক্ষত্রিয়, মাতা উত্তরা নাম্নী ক্ষত্রিয়া
৪	সুমন বুদ্ধ	জিননাগ বৃক্ষের নিচে	মেঘলা নগর, পিতা সুদত্ত নামক ক্ষত্রিয়, মাতা সিরিমা ক্ষত্রিয়ানী
৫	রেবত বুদ্ধ	নাগেশ্বর বৃক্ষের নিচে	সুধর্মবর্তী নগর। পিতা বিপুল নামক ক্ষত্রিয়, মাতা বিপুলা ক্ষত্রিয় রমণী
৬	সোভিত বুদ্ধ	নাগেশ্বর বৃক্ষের নিচে	সুধর্ম নগর। পিতা সুধর্ম ক্ষত্রিয় নৃপতি, সুধর্মা রাজমহিষী
৭	অনোমদর্শী বুদ্ধ	অর্জুন বৃক্ষের নিচে	চন্দ্রবতী নগর। পিতা যশবন্ত ক্ষত্রিয়, মাতা যশোধরা রাজমহিষী
৮	পদুম বুদ্ধ	মহাসোন (স্বর্ণ চাপা) বৃক্ষের নিচে	চম্পকনগর। পিতা অসম ক্ষত্রিয় রাজা, মাতা অসমা রাজমহিষী
৯	নারদ বুদ্ধ	মহাসোন (স্বর্ণ চাপা) বৃক্ষের নিচে	ধন্যবতী নগর। পিতা সুদেব ক্ষত্রিয়, মাতা অনোমাবতী ক্ষত্রিয়ানী
১০	পদুমুত্তর বুদ্ধ	সলল বৃক্ষের নিচে	হংসবতী নগর। পিতা আনন্দ ক্ষত্রিয়, মাতা

			সুজাতা ক্ষত্রিয়ানী
১১	সুমেধ বুদ্ধ	মহানিম্ব বৃক্ষের নিচে	সুদর্শন নগর। পিতা সুদত্ত ক্ষত্রিয়, মাতা সুদত্তা রাজরাণী
১২	সুজাত বুদ্ধ	মহাবেণু বৃক্ষের নিচে	সুমঙ্গল নগর । পিতা উগ্গত ক্ষত্রিয়, মাতা প্রভাবতী ক্ষত্রিয়া
১৩	প্রিয়দর্শী বুদ্ধ	অর্জুন বৃক্ষের নিচে	সুধন্য নগর। সুদত্ত ক্ষত্রিয়, মাতা সুচন্দ্রা ক্ষত্রিয়ানী।
১৪	অর্থদর্শী বুদ্ধ	চম্পক বৃক্ষের নিচে	শোভন নগর। পিতা সাগর ক্ষত্রিয়, মাতা সুদর্শনা ক্ষত্রিয়ানী।
১৫	ধর্মদর্শী বুদ্ধ	রক্তকরবী বৃক্ষের নিচে	শরণ নগর। পিতা শরণ ক্ষত্রিয়, মাতা সুনন্দা রাজমহিষী।
১৬	সিদ্ধার্থ বুদ্ধ	কির্ণকার বা স্বর্ণালু বৃক্ষের নিচে	বেভার নগর। পিতা উদেন ক্ষত্রিয়, মাতা সুফস্সা ক্ষত্রিয়া
১৭	তিস্স বুদ্ধ	অসন বা পীতশাল বৃক্ষের নিচে	ক্ষেমনগর। পিতা জনসন্ধ ক্ষত্রিয়, মাতা পদুমা ক্ষত্রিয়ানী
১৮	ফুস্স বুদ্ধ	আমলকী বৃক্ষের নিচে	কাসিক নগর। পিতা জয়সেন ক্ষত্রিয়, মাতা সিরিমা ক্ষত্রিয়ানী
১৯	বিপস্সী বুদ্ধ	অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে	বুন্ধমতী নগর। পিতা বন্ধুমা, মাতা বন্ধুমতী ক্ষত্রিয়ানী
২০	শিখী বুদ্ধ	পুণ্ডরীক বৃক্ষের নিচে	অরুণবতীনগর। পিতা অরুণ ক্ষত্রিয়, মাতা প্রভাবতী ক্ষত্রিয়ানী
২১	বস্সভূ বুদ্ধ	শাল বৃক্ষের নিচে	অনোম নগর। পিতা সুপতীত ক্ষত্রিয়, মাতা যশবতী ক্ষত্রিয়ানী
২২	ককুসন্ধ বুদ্ধ	শিরীষ বৃক্ষের নিচে	ক্ষেমবতী নগর। অগ্নিদত্ত ব্রাহ্মণ, মাতা বিশাখা ব্রাহ্মণী
২৩	কোণাগমন বুদ্ধ	উদুম্বর বা ডুমুর বৃক্ষের নিচে	সোভবতী নগর। পিতা যজ্ঞদত্ত ব্রাহ্মণ, উত্তরা ব্রাহ্মণী
২৪	কাশ্যপ বুদ্ধ	ন্যগ্রোধ বৃক্ষের নিচে	বারাণসী নগর। পিতা ব্রহ্মদত্ত, মাতা ধনবতী ব্রাহ্মণী
২৫	গৌতম বুদ্ধ	অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে	কপিলাবাস্তু নগর। পিতা শুদ্ধোদন মহারাজা, মাতা মহামায়াদেবী।

সারণি : ৩

উপর্যক্ত সারণি থেকে এটাই প্রতিয়মান হয় যে পরিবেশের সাথে আধ্যাত্বিক শক্তির উৎস রয়েছে। প্রকৃতির শিক্ষা ব্যক্তির মননকে বিকশিত করে। প্রকৃতির শান্ত, শীতল, অকৃত্রিম দান প্রাণ ভরে বিলিয়ে যায় যা মানবসমাজ, মানবসভ্যতা বিকাশে সৃষ্টির শুরু থেকে চলে আসছে। বৌদ্ধসাহিত্যের মধ্যে এই পরিবেশ প্রকৃতির সকল উপাদানের

গুরুত্ব অনুধাবনে আলাদা মাত্রা যোগ করেছে। তাইতো দেখা যায় বুদ্ধের পারিলয্য বনে একাকী বসবাস করার সময়কালে নালাগিরি নামের একটি হস্তী তাঁর দেখাশোনা করতেন।[২১] এর মাধ্যমেই পরিবেশের প্রত্যেকটি উপাদানের গুরুত্ব যে কত অপরিসীম তা অনুমেয়।

৩.১. বুদ্ধ ও বোধিবৃক্ষ

পালি সাহিত্যে বোধিবৃক্ষ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধ প্রতীক, যা গৌতম বুদ্ধের বোধি জ্ঞানলাভ এবং আধ্যাত্মিকতার সাথে গভীর ও নিবিড় সম্পর্কযুক্ত। 'বোধিবৃক্ষ' বলতে অশ্বত্থ গাছকে বোঝায় যা বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন প্রতীকগুলোর মধ্যে পবিত্র, অর্থপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ। পঞ্চম শতাব্দীতে চীনা পরিব্রাজক ও বৌদ্ধভিক্ষু ফা-হিয়েন প্রাচীন ভারত ভ্রমণে এসে বোধিবৃক্ষ সর্ম্পকে একটি চমৎকার তথ্য উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন মহামতি সম্রাট অশোক বোধিবৃক্ষের চারদিকে সুউচ্চ প্রাচীর নির্মাণ করে দেন যেন বোধিবৃক্ষের কোনোরূপ ক্ষতি করতে না পারে।[২২] তাছাড়া সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাঙ নামের আরেকজন বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক প্রাচীন ভারত ভ্রমণের এসে বোধিবৃক্ষ দেখেছিলেন বলে জানা যায়।[২৩]

চিত্র ৬ : বোধিবৃক্ষ

Source : https://a-z-animals.com/articles/discover-the-bodhi-tree-and-why-its-so-important-throughout-the-world/

চিত্র ৭ : বোধিবৃক্ষের পাতার গঠন

Source : https://gyokyo.blog/wp-content/uploads/2020/12/bodhi-leaves.jpg

পালি সাহিত্য ও বৌদ্ধ দর্শনে বহু জায়গায় বোধিবৃক্ষ নিয়ে আলোচিত হয়েছে। বিশেষ করে বুদ্ধের বোধিজ্ঞান লাভের পর পর সপ্তসপ্তাহ (৭ সপ্তাহ) ধরে তিনি বোধিবৃক্ষের নিকটে যে ধ্যান করেছেন তার বিবরণ আছে। অর্থাৎ, বুদ্ধত্ব লাভের পর মহামানব গৌতম বুদ্ধ সাত সপ্তাহ ধরে প্রকৃতির কুলে বোধিবৃক্ষ এর নীচে ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। সেই সময়ে তিনি আরো গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন এবং ধর্মের সূক্ষ্মতম সত্য উপলব্ধি করেন। বুদ্ধ জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ যেন পরিবেশকে ঘিরেই অর্জিত হয়েছে। সপ্তম সপ্তাহে তিনি সপ্তমহাস্থান (সাতটি পবিত্র স্থান) সম্পর্কে নিবিড় চিন্তা করেন এবং সেগুলোর প্রতি সানুগ্রহে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বুদ্ধ যেন পরিবেশেরই বরপুত্র। নিম্নে তার একটি ধারণা উপস্থাপন করা হলো। যথা :

ক্রমিক	বুদ্ধের অবস্থান	বুদ্ধের ভাবনা	উৎস
প্রথম সপ্তাহ	উরুবেলার নৈরঞ্জনা নদীর তীরস্থ বোধিবৃক্ষমূল	বুদ্ধ একাসনে ধ্যান পদ্মাসনে বিমুক্তি সুখের মাধ্যমে অতিবাহিত করেন। বুদ্ধ এখানে রাত্রির প্রথম, মধ্যম, শেষ যামে প্রতীত্যসমুৎপাদ-তত্ত্ব অনুলোম-প্রতিলোম ভাবে, উৎপত্তি ও নিরোধ বশে স্বমনে আনুপূর্ব্বিক পর্য্যালোচনা করলেন	প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত, *মহাবর্গ*, তাইওয়ান: সন অনুল্লেখিত, করপর‍্যাট বডি অব দি বুদ্ধ এডুকেশনাল ফাউন্ডেশন), পৃ. ১
দ্বিতীয় সপ্তাহ	অজপাল-ন্যগ্রোধ তরু-মূল	বোধিলাভের আসন এবং অনিমেষ বৃক্ষকে স্মরণ করে একাসনে ধ্যান পদ্মাসনে অতিবাহিত করেন	মহাবর্গ, প্রাগুপ্ত. পৃ. ৩

তৃতীয় সপ্তাহ	মুচলিন্দ তরু-মূল	মণিচংক্রামণে চঙ্ক্রমণ করে অতিবাহিত করেন।	মহাবর্গ, প্রাগুপ্ত. পৃ. ৪
চতুর্থ সপ্তাহ	রাজায়তন-মূল	বোধিবৃক্ষের পার্শ্ববর্তী রত্নঘর চৈত্যে বসে তিনি কার্যকারণতত্ত্ব বা প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেন।	মহাবর্গ, প্রাগুপ্ত. পৃ. ৪
পঞ্চম সপ্তাহ	অজপাল ন্যগ্রোধ বৃক্ষমূলে একাসনে,	ধ্যান পদ্মাসনে বিমুক্তি সুখ অনুভব করে অতিবাহিত করেন।	মহাবর্গ, প্রাগুপ্ত. পৃ. ৫
ষষ্ঠ সপ্তাহ	মুচলিন্দ বৃক্ষমূল একাসনে	ধ্যান পদ্মাসনে বিমুক্তিসুখ অনুভব করে অতিবাহিত করেন। এই সময় ঝড়ো বাতাস, বৃষ্টি-বাদল শুরু হলে নাগরাজ বুদ্ধের দেহকে বেষ্টিত করে তাঁর শিরোপরি ফণা বিস্তৃত করে রইলেন।	মহাবর্গ, প্রাগুপ্ত. পৃ. ৬
সপ্তম সপ্তাহ	রাজায়তন বৃক্ষ	বুদ্ধ সাতদিন একাগ্রচিত্তে একাসনে ধ্যান পদ্মাসনে বিমুক্তি সুখানুভব করে অতিবাহিত করেন।	মহাবর্গ, প্রাগুপ্ত. পৃ. ৭

সারণি : ৪

আর এই বোধিবৃক্ষের নিচে বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে সুজাতা বুদ্ধকে পায়েস দান করেছিলেন।[২৪]

চিত্র ৮ : বোধিবৃক্ষের নিচে বুদ্ধকে সুজাতা কর্তৃক পায়েস দান। পাশে নৈরঞ্জনা নদী বয়ে চলেছে।

Source : https://peacepaul.wordpress.com/2018/01/21/sujata-the-buddhas-last-teacher/

ভারতের বিহার রাজ্যের রাজগৃহের বেণুবন-এর অবস্থান যা বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে বিবেচিত। বর্তমানে এটি বিহার রাজ্যের রাজগৃহে অবস্থিত। বেণুবন-এর সাথে বুদ্ধ জীবনের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বেণুবনস্থ বিহার ছিল রাজা বিম্বিসার কর্তৃক গৌতম বুদ্ধকে দান করা প্রথম বৌদ্ধ বিহার। এখানে 'বেণু' বলতে বাঁশ আর 'বন' বলতে অরণ্য বা বাঁশের বাগানকে বোঝায়। বেণুবন বিহারে তিন বর্ষাবাস (২য়, ৩য় ও ৪র্থ) অতিবাহিত করেন। এটি বুদ্ধের প্রিয় আবাস্থল ছিল। বেণুবন বিহারে বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদেরকে সংঘব্যবস্থার ধারণা প্রবর্তন করেন। চীনের বিখ্যাত পরিব্রাজক ও বৌদ্ধভিক্ষু ফা-হিয়েন পঞ্চম শতাব্দীতে ভারত ভ্রমণে এসে বেণুবন বিহারের অস্তিত্ব দেখতে পান বলে জানা যায়।[২৫]

চিত্র ৯ : বেণু বন

Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Venuvana1.jpg

গৌতম বুদ্ধের সাথে ভারতের উত্তর প্রদেশে অবস্থিত জেতবন বিহারের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। বৌদ্ধ সাহিত্যের বহু স্থানে এই জেতবন বিহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে বুদ্ধ ১৯ বার বর্ষাবাস অতিবাহিত করেন। শ্রাবস্তীর মহাধনী বা শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক রাজপুত্র জেত-এর কাছ থেকে উদ্যান ক্রয় বুদ্ধ ও তাঁর মহান ভিক্ষু-সংঘের জন্য দান করেন। রাজপুত্র জেত'র নামানুসারে এটি নামকরণ করা হয় জেতবন।[২৬] জেতবন বিহার ধর্মীয় ঐতিহ্যের পাশাপাশি বর্তমানে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের অংশ হয়ে আছে। তাই বলা যায় এটি কেবল একটি বিহার নয় এটি বুদ্ধের শিক্ষা, বৌদ্ধ

সংঘের, বৌদ্ধধর্ম বিকাশ এবং ধর্মীয় ঐতিহ্যের একটি জীবন্ত স্মারকস্বরূপ। বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস, ঐতিহ্য, দর্শন ও সংস্কৃতিতে এর গুরুত্ব অপরিসীম। আজ এটি বিশ্বজুড়ে বৌদ্ধদের জন্য শ্রদ্ধা ও দর্শনীয় স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়।

চিত্র ১০ : জেতবন

Source : https://www.pelago.com/en-SG/activity/p2vtmm5l4-pilgrimage-to-jetavana-monastery-lucknow-to-shravasti-day-trip-lucknow/

পারিলেয্য বনের সাথে মহামতি বুদ্ধের নিবিড় ও গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এ সম্পর্কে একটি কাহিনি[২৭] নিম্নরূপ: এক সময় বুদ্ধ ঘোষিতারামে তাঁর প্রবর্তিত মহান ভিক্ষু-সংঘের মধ্যে বিনয়-বিধান নিয়ে বির্তক সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে মহান ভিক্ষু-সংঘ ধর্মধর বা ধর্মকথিক এবং বিনয়ধর বা নিয়মানুবর্তী দল নামে দুই দল-এ বিভক্ত হলে নবীন ভিক্ষুদের দ্বন্দ্ব আরও চরম আকার ধারণ করল। বুদ্ধ তাঁদেরকে দ্বন্দ্ব নিরসন করতে বলেন। কিন্তু কোনো দলই তা মেনে না নিয়ে কলহ-বিবাদকে আরো বৃদ্ধি করে। ভিক্ষু-সংঘ বুদ্ধের উপদেশকে অবজ্ঞা করলে তিনি তাদেরকে ছেড়ে পারিলেয্য বনে চলে যান। সেখানে একটি বানর ও হাতী পরম মায়া-মমতায় সেবা-শ্রশ্রূষা করতো। বুদ্ধ এখানে দশম বর্ষাবাস অতিবাহিত করেন। বৌদ্ধ দর্শনে বর্ণিত প্রত্যেকটি বন, অরন্য, বিহার যেন বুদ্ধ জীবনের সাথে মিলেমিশে এক হয়ে আছে যা বৌদ্ধ ইতিহাসের নীরব স্বাক্ষী হয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে। এ থেকে পরিবেশ অপার মহিমার পরিচয়ও পাওয়া যায়।

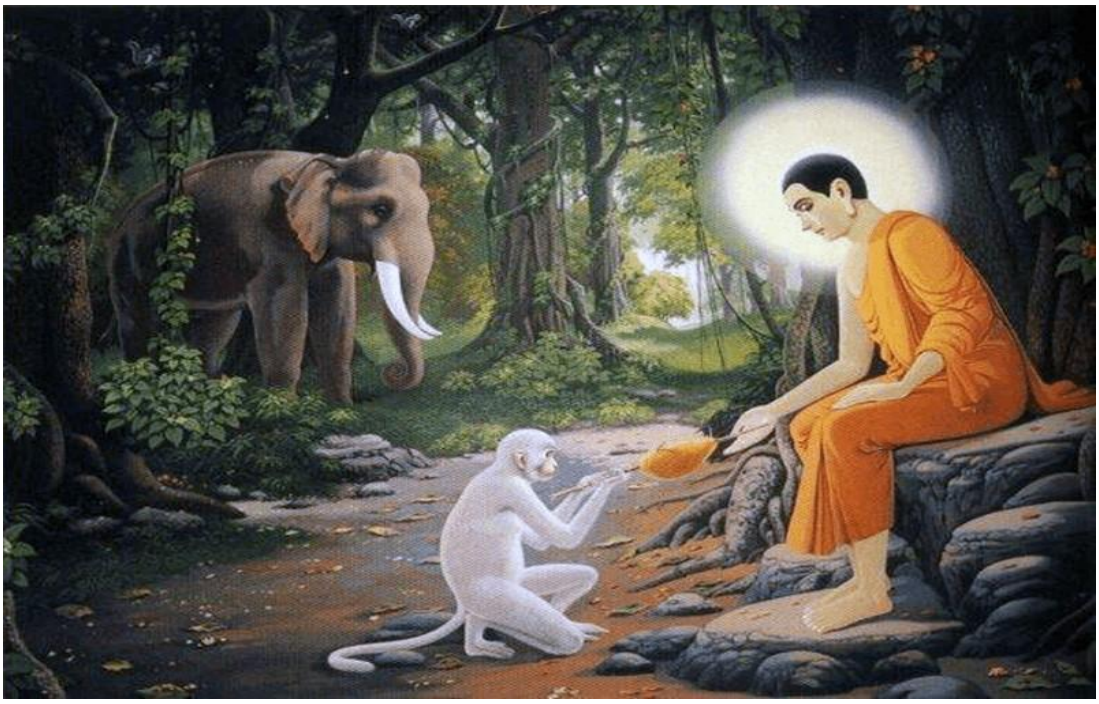

চিত্র ১১ : বুদ্ধকে বানরের মধু দান

Source: https://www.buddhistdoor.net/features/honey-offering-festival-commemorating-service-of-animals-to-the-buddha/

৪. পরিবেশ সম্পর্কে বুদ্ধের নির্দেশনা

মানুষের সাথে প্রকৃতি ও পরিবেশের নিবিড় এবং অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। বুদ্ধ বোধিজ্ঞান লাভের পর তিনি যখন ধর্মবাণী প্রচার করেন তখন তিনি যাপিতজীবনে প্রকৃতি ও প্রকৃতির বহুরকম উদাহরণ উপমায় এনে তাঁর উপদেশে উপস্থাপন করেন। মানুষ সচরাচর লোভ-দ্বেষ-মোহে আবদ্ধ। অর্থাৎ, মাকড়সার জালের ন্যায় তৃষ্ণায় আবদ্ধ। অবিরত মানুষ তৃষ্ণাজালে আবদ্ধ হচ্ছে এবং হবে। মানুষ তৃষ্ণাকে দমন কিংবা সংযম করতে না পারলে মানবজীবনে দুঃখ ক্রমশ বৃদ্ধি পায় কখনো কমবে না। এ বিষয়ে বুদ্ধ বলেছেন :

যথাপি মূলে অনূপদ্দবে ফল্হে ছিন্নো'পি রুক্খো পুনরেব রুহতি
এবম্পি তণ্হানুসযে অনূহতে নিবত্ততি দুক্ইমদং পুনপ্পুনং।[২৮]

অর্থাৎ, মূল অনুৎপাটিত ও দৃঢ় থাকলে যেমন ছিন্ন গাছও আবার গজিয়ে উঠে ঠিক একইভাবে তৃষ্ণার মূল ছিন্ন না হলে দুঃখ বার বার উৎপন্ন হবে। এখানে বুদ্ধ বৃক্ষরাজির সাথে মানবজীবনের তুলনা করেছেন। দুর্দমনীয় তৃষ্ণার ক্রমবর্ধমান ধারাকে প্রাকৃতিক পরিবেশের গাছ-পালা ও লতা-গুল্মের সাথে তুলনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন :

সবন্তি সব্বধি সোতা লতা উবিভজ্জ তিট্ঠতি,

তঞ্চ দিস্বা লতং জাতং মূলং পঞ্ঞায ছিন্দথ।[২৯]

অর্থাৎ, তৃষ্ণা স্রোত সর্বত্রই প্রবাহিত হয়। আর তৃষ্ণালতা অঙ্কুরিত হয়। তৃষ্ণালতাকে অঙ্কুরিত হতে দেখলেই প্রজ্ঞা দৃষ্টিতে জ্ঞানী লোকেরা তার মূলোৎপাটন করে।

'খুদ্দক নিকায়' গ্রন্থের *'ধর্মপদ* -এর অন্তর্ভূক্ত পুষ্পবর্গ-এ পুষ্প তথা ফুলের সাথে ব্যক্তির চরিত্রের দিকটি তুলনা করে অতি সুন্দর করে তুলে ধরা হয়েছে এভাবে :

চন্দনং তগরং বা'পি উপ্পলং অথ বস্সিকী

এতেসং গন্ধ জাতানং সীলগন্ধো অনুত্তরো।[৩০]

অর্থাৎ, চন্দন, টগর, পদ্ম কিংবা চামেলী প্রভৃতি গন্ধজাত পুষ্পের সুগন্ধ অপেক্ষা শীলবান এর যশঃ সৌরভই শ্রেষ্ঠ। সজ্জনের চরিত্র সৌরভ অতুলনীয়।

একসময় বুদ্ধ কৃষি কাজে সম্পৃক্ত কাশী ভারদ্বাজকে উপমা সহযোগে বলেন :

সদ্ধাবীজং তপো বুট্ঠি, পঞ্ঞা মে যুগনঙ্গলং।

হিরী ঈসা মানো যোত্তং, সতি মে ফালপাচনং।[৩১]

অর্থাৎ, শ্রদ্ধা আমার বীজ, সাধনা হলো বৃষ্টি, প্রজ্ঞা হলো যুগ লাঙ্গল, বিনয় হলো ফলা, মন হলো জোয়াল বন্ধনী এবং স্মৃতি হলো তার ফাল ও যষ্ঠি। এভাবে তিনি কৃষিকর্ম করে নির্বাণরূপ অমৃতফল উৎপাদন করেন। যেখানে সকল দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করা যায়। এখানে প্রকৃত কৃষক, কৃষিকাজ ও কৃষি উপাদানের মাধ্যমে বুদ্ধ সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন।

বুদ্ধ বৃক্ষের সাথে বাসনার সম্পর্কে চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। এখানে তাঁকে বলতে দেখা যায় : 'বনের একটি বৃক্ষ বাসনা কর্তন না করে সমুদয় অরণ্য উৎপাটন কর। অরণ্য থেকে ভয়ের উৎপত্তি হয়। বন ও ঝোপ ছেদন করে বাসনা অরণ্য থেকে মুক্ত হও। [৩২]

এখানে বুদ্ধ অরণ্যকে তৃষ্ণার সাথে উপমায় তুলে এনেছেন। এখানে তিনি অকুশল কর্ম থেকে বিরত থেকে তৃষ্ণাকে সংযম করার কথা বলেন। পরিবেশ ও প্রকৃতিকে উপলব্ধি করার জন্য Buddhadasa-এর নিম্নের উক্তিটি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। এখানে তিনি বলেন:

> 'Trees, rocks, sand, even dirt and insects can speak. This doesn't mean, as some people believe, that they are spirits [Thai, phi] or gods [Pali, devata]. Rather, if we reside in environment near trees and rocks, we'll discover feelings and thoughts arising that are actually out of the normal. At first, we'll feel a sense of peace, harmony and quiet [Thai, sangopyen=quiet-cool] which may eventually move beyond that feeling to a transcendence of self. The deep sense of peaceful that

nature. providey through separation [Pali, viveka] from the troubles and anxieties that plague us in the day-to-day world functions to protect heart and mind. Certainly, the teachings nature teaches us lead to a new birth beyond the suffering [Pali, dukkha] that results from attachment to self. Trees and rocks, then, can talk to us. They help us recognize what it means to cool down from the heat of our confusion, despair, anxiety, and suffering'.[৩৩]

৪.১. জীববৈচিত্র্য রক্ষা

বৌদ্ধধর্ম ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা যেন একে-অপরের পরিপূরক। কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে বৌদ্ধধর্ম প্রকৃতি ও সকল জীবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, মৈত্রী ও করুণার শিক্ষা প্রদান করে। পৃথিবীতে সবাই পরস্পর নির্ভশীল। তাই প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে চলা অত্যাবশ্যক। বর্ষাকালে ভ্রমণ করলে পোকামাকড়, উদ্ভিদ এর ক্ষতি হতে পারে। এই সময়ে পথে-ঘাটে ক্ষুদ্র প্রাণী, কীটপতঙ্গ এবং অঙ্কুরিত গাছের সংখ্যা বেড়ে যায়। বুদ্ধ এই সময়ে ভিক্ষুদের এক জায়গায় অবস্থান করার নির্দেশ দেন, যা পরিবেশ-সচেতনতারক্ষেত্রে এক অনন্য উদাহরণ। বর্ষাকালে ভিক্ষুদের একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল মূলত প্রকৃতি ও জীবজগতের কল্যাণের জন্য। ভিক্ষুদের ভ্রমণ এড়ানোর মাধ্যমে বুদ্ধ ক্ষুদ্র প্রাণীর অস্তিত্ব রক্ষা করেছিলেন।[৩৪] বুদ্ধ সকল জীবকে রক্ষা করার কথা বলেন। এটি সকলের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ বিষয়ে Chatsumarn. Kabilsingh-এর বক্তব্যটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন :

'Buddhist teachings gave rise to an ecological ethic with a strong concern for nature and the forest. They emphasize the importance of coexisting with nature rather than conquering it Chatsumarn.'[35]

৫. বর্ষাবাস : প্রকৃতি ও পরিবেশ

বর্ষাবাস-এর সাথে কম বেশি সবাই পরিচিত। বর্ষাবাস বুদ্ধ প্রতিষ্ঠিত বিনয়-বিধানের মধ্যে একটি গভীর অর্থপূর্ণ অনন্য সাধারণ নীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধধর্মে বর্ষাবাস গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রীয় নীতি যা *'ত্রিপিটক'*-এর অন্তর্গত *'বিনয় পিটক'* গ্রন্থের মধ্যে এক বিশেষ স্থান দখল করে রয়েছে। বুদ্ধ তাঁর অনুসারী ভিক্ষুদের জন্য নিয়মটি লিপিবদ্ধ করেছিলেন, যাতে তাঁরা বর্ষাকালে (আষাঢ় থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত) একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে ধর্মচর্চা, ধ্যান ও সংযম পালন করতে পারেন। বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পর ৪৫ বছর-ব্যাপী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করে ধর্ম-বাণী প্রচার করেন। উল্লেখ থাকে যে, তিনি ৪৫টি (পয়তাল্লিশ) বর্ষাবাসের মধ্যে ৩৬টি (ছত্রিশ) বর্ষাবাস লোকালয় থেকে দূরে নির্জন গভীর অরণ্যে প্রকৃতির কোলে লতা-গুল্ম ও গাছ-গাছড়ায় ঘেরা সবুজ উদ্যানে অবস্থিত

বিহারে পালন করেন। তিনি যেসব বিহারে অবস্থান করে তাঁর লব্ধ ধর্মপ্রচার করেন তার একটি তালিকা[৩৬] নিম্নে উপস্থাপন করা হলো। যথা:

বর্ষাবাস ও প্রকৃতি	বর্ষাবাসের অবস্থান	বর্ষাবাসের কাল	অবস্থানের সমকাল
মৃগদাব বন	বারানসীর ঋষিপতন	১ম বর্ষাবাস	১ বার
বেণুবন	রাজগৃহ	২য়, ৩য় ও ৪র্থ বর্ষাবাস	৩ বার
মহাবন	বৈশালী	৫ম বর্ষাবাস	১ বার
মুকুল পর্বত	বর্তমানে ভারতের বিহার রাজ্য	৬ষ্ঠ বর্ষাবাস	১ বার
পারল্যেয় বন	কোসাম্বী	১০ম বর্ষাবাস	১ বার
চালিয় পর্বত	বিহার রাজ্য	১৩ তম, ১৮তম, ১৯তম বর্ষাবাস	৩ বার
জেতবন	শ্রাবস্তী	১৪তম ও ১ম থেকে ৪৪ তম এর মধ্যে ১৮ বার বর্ষাবাস	১৯ বার
ন্যগ্রোধারাম নামক রমণীয় উদ্যান	কপিলবস্তু	১৫ তম বর্ষাবাস	১ বার
বিশাখা প্রদত্ত পূর্বারাম	শ্রাবস্তী	২১-৪৪ তম বর্ষাবাসের মধ্যে ৬ বর্ষাবাস	৬ বার

সারণি : ৫

উপরি-উক্ত সারণির মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে যে বৌদ্ধ দর্শনের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসের মধ্যে আষ্টেপৃষ্ঠে আছে প্রকৃতি ও পরিবেশ। বুদ্ধের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা বা আচার-আচরণসহ সমগ্র জীবন-দর্শনের প্রায় সর্বত্রই প্রকৃতির সাথে তাঁর নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর জীবদ্দশায় যে সকল মহান কার্য সম্পাদিত হয় তার সবই পরিবেশ ও প্রকৃতিকে ঘিরে। ধ্যানের জন্য বুদ্ধ সর্বোত্তম স্থান হিসেবে নির্জন ও গভীর ঘন বনাঞ্চলকেই বেছে নেন। তাঁর বিচরণের স্থান হিসেবে বনাঞ্চল এবং পাহাড়-পর্বতের কথা উঠে আসে। বুদ্ধ তাঁর পঞ্চবর্গীয় শিষ্য[৩৭] (কৌণ্ডিন্য, বপ্প, মহানাম, ভদ্রিয় ও অশ্বজিৎ), যশ, যশের চার বন্ধুসহ অপর ৫০জন, ৩০জন ভদ্রবর্গীয় গৃহীকে দীক্ষা দান করা, সারিপুত্র ও মহামৌদ্গালায়নের উপসম্পদা প্রদান এবং রাজা বিম্বিসারের বৌদ্ধশাসনে প্রবেশ প্রায় সবই হয় সুজলা-সুফলা সমৃদ্ধ প্রকৃতির কোলে।[৩৮]

৫.১. বুদ্ধ প্রবর্তিত বর্ষাবাসের গুরুত্ব

বর্ষাবাস বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশবান্ধব বিনয় বিধান। মহাবগ্গ এ বর্ষাবাস সংক্রান্ত বিস্তারিত নিয়ম উল্লেখ আছে। ভিক্ষুদের বর্ষাবাস শুরু হয় আষাঢ় পূর্ণিমায় আর আশ্বিনী পূর্ণিমায় "পবারণা" করে বর্ষাবাস সমাপ্ত করা হয়। যদি কোনো ভিক্ষু বর্ষাকালে জরুরি কারণে স্থান ত্যাগ করেন, তবে তাঁকে নির্দিষ্ট শর্ত পালন করতে হয়। বর্ষাকালে ভিক্ষুরা একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে ধর্মচর্চা, ধ্যান ও শিক্ষাদান করেন। গৌতম

বুদ্ধ শুধু ভিক্ষুদের শৃঙ্খলাই প্রতিষ্ঠা করেননি বরং প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি গভীর পরিবেশ-বান্ধব জীবনব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। বর্ষাবাসের মাধ্যমে বুদ্ধ প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা, জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ এবং মানবিক দায়বদ্ধতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। বুদ্ধ প্রায়শই গভীর বন, পাহাড় বা নদীতীরের বিহারগুলোকে বর্ষাবাসের জন্য নির্বাচন করতেন। বুদ্ধের শেষ বর্ষাবাস বৈশালীতে অতিবাহিত হয়, এরপর তিনি কুশীনগরে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। বর্ষাবাসের বর্ণিত তালিকাটি থেকে খুব সহজেই বোঝা যায়, বুদ্ধের জীবন ছিল প্রকৃতি ও মানবকল্যাণের মধ্যে সমন্বিত। তিনি ধর্ম প্রচারের পাশাপাশি পরিবেশের সান্নিধ্যকে গুরুত্ব দিতেন।

৫.২. কৃষি ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ

ভারী বৃষ্টিতে মাটি নরম থাকে, এবং ভিক্ষুদের পদচারণায় কৃষিজমি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বর্ষাবাস কৃষকের ফসল রক্ষা করে গ্রামীণ অর্থনীতিকে সহায়তা করে। উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে সহায়ক নির্জন বনাঞ্চলে অবস্থান করে ভিক্ষুরা গাছপালা ও লতাগুল্মের সাথে সহাবস্থান করতেন, যা প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় ভূমিকা রাখে। বর্ষাবাসের সময়কালে ভিক্ষুদের ভ্রমণ নিষিদ্ধ করে বুদ্ধ প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিলেন। *'বিনয় পিটক'* গ্রন্থে *'মহাবর্গে'* উল্লেখ আছে, বর্ষাকালে বিচরণকারী ভিক্ষু নিজের অগোচরে অসংখ্য প্রাণীর মৃত্যুর কারণ হয়।[৩৯]

৫.৩. অরণ্য ও জলসম্পদের ভারসাম্য

বুদ্ধ ৩৬টি বর্ষাবাস গভীর অরণ্যে কাটিয়েছেন, যা বনাঞ্চলের সংরক্ষণে ভূমিকা রেখেছে। নদীর তীর সংলগ্ন বিহারগুলো (যেমন: বৈশালীর ভদ্রবন) জলসম্পদের টেকসই ব্যবহারের অন্যতম উদাহরণ বলা যায়।

৫.৪. ঐক্য ও শৃঙ্খলা

বর্ষাকালে ভিক্ষুসংঘ একত্রে বসবাস করে, যা সমষ্টিক শান্তি, সম্প্রীতি, সদ্ভাব ও সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। স্থানীয় জনগণ ভিক্ষুদের জন্য আবাস ও খাদ্য প্রদান করে, ফলে ধর্মীয়-সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয়, যা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বিনয়ের অনুশীলনকে শক্তিশালী করে।

৫.৫. নৈতিক শিক্ষা চর্চা

বর্ষাবাসের সময় মহান ভিক্ষুরা ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন, ধ্যান ও সাধারণ গৃহীদেরকে শিক্ষাদান করে, যা সমাজে নৈতিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। বুদ্ধ জেতবন বিহারে ১৯টি বর্ষাবাস অতিবাহিত করে হাজার হাজার শিষ্যকে উপদেশ প্রদান করেন যার মাধ্যমে সমাজে নৈতিক মূল্যবোধ ছড়িয়ে পড়ে।

৫.৬. আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রকৃতির কোলে ধর্মচর্চা

বর্ষবাসের সময়কালে দীর্ঘ তিন মাস এক স্থানে থেকে ভিক্ষুরা গভীর ধ্যান, অধ্যয়ন ও ধর্মালোচনার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন করেন। এই রকম চর্চার মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন যে প্রকৃতিই হলো ধ্যান ও আত্মউন্নতির শ্রেষ্ঠ শিক্ষক।

৬. দূষণমুক্ত প্রকৃতি ও পরিবেশ বিনির্মাণে বুদ্ধের আহ্বান

বুদ্ধের সময়ে পরিবেশের উপর বর্তমান সময়ের মতো বহুবিধ সমস্যা ছিল না কিংবা পরিবেশের উপর কখনো কারও আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবের প্রভাব পড়তে দেখা যায় না কখনো। সেই সময় প্রকৃতির ভূ-ভাগকে দূষিত বা নষ্ট করার কোনো রকম প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে ছিল না বললেই চলে। আজ নানাবিধ প্রাকৃতিক বির্পযয়ের কারণে নদ-নদী ভরাট হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন নদ-নদীর পানি দূষিত হচ্ছে। পাহাড়-পর্বতে বাড়ি-ঘর নির্মাণ করার কারণে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ ও লতা-গুল্মকে কেটে ফেলা হচ্ছে সাথে কাটা হচ্ছে পাহাড়। ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং পাহাড় কাটার ফলে পাহাড় ধ্বস হয়ে বড় ধরণের বিপর্যয় তৈরি হয়। এভাবে বন-পাহাড়-পর্বতের উচ্ছেদে মানবসমাজে দেখা দেয় বিভিন্ন শঙ্কা। দূষণসমস্যা পরিবেশের অন্যতম ক্ষতিকর দিক। এই প্রকৃতি ও পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখার জন্য বুদ্ধ আত্মপ্রত্যয়ী ছিলেন। তিনি বিনয় অনুশীলন ও প্রজ্ঞার আলোয় তাঁর শিষ্যদেরকে পরিবেশ সংরক্ষণে উপদেশ প্রদান করে গেছেন। বুদ্ধের সংরক্ষিত দেশনার '*পাচিত্তিয়*' গ্রন্থের সেখিয়া অংশে বর্ণিত আছে সজীব উদ্ভিদে, সবুজ ঘাস বা জীবিত উদ্ভিদে, তৃণ-ঘাস-জলে মলমূত্র, থুথু ফেলে পানিকে দূষিত করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন।[৪০] পরিবেশ দূষণ রোধে বুদ্ধ খুবই সচেতন ও আন্তরিক ছিলেন। বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদেরকে যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার জন্য অনুজ্ঞা প্রদান করেন।[৪১] যতত্রত মলমূত্র ত্যাগ করার কারণে পরিবেশ দূষিত হয়। এমতাবস্থায় তিনি যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ না করার বিধিনিষেধও আরোপ করেন। তিনি শৌচাগার থেকে যাতে কোনো দুর্গন্ধ না আসে তার জন্য যথাযথ ঢাকনা ব্যবহার করার জন্য উপদেশ প্রদান করেন। শুধু তাই নয়, তিনি মলমূত্র ত্যাগ করার স্থানকে কীভাবে তৈরি করতে হয়, তারও একটি স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করেন। পরিবেশকে পুত-পবিত্র ও পরিশুদ্ধ রাখার জন্য বুদ্ধ শৌচাগার সম্পর্কে তাঁর শিষ্যদের অবহিত করেন। বর্তমান সময়ে শৌচাগার ব্যবহার করা হয়।[৪২] বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘের জন্য বুদ্ধের দেওয়া এই নির্দেশটি কেবল ধর্মীয় অনুশাসনই নয়, বরং এটি সামাজিক সহাবস্থান, পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রাণিজগতের প্রতি সম্মানবোধেরও প্রতিফলন। এই শিক্ষাপদের সামাজিক প্রভাব নিম্নোক্ত দিকগুলোতে বিশ্লেষণ করা যায়:

৬.১. অহিংসা ও সম্মান

বুদ্ধের শিক্ষায় সজীব উদ্ভিদে, সবুজ ঘাস বা জীবিত উদ্ভিদে মল-মূত্র ত্যাগ না করার নির্দেশ অহিংসার মূলনীতির সঙ্গে যুক্ত। যেখানে প্রকৃতির উপাদানগুলিকে (জল, উদ্ভিদ, মাটি) গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। *'বিনয় পিটক'* গ্রন্থের '*পাচিত্তিয়*' এ উল্লেখ আছে যে ভিক্ষুদের উদ্ভিদের ক্ষতি এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ তা প্রাণীবধের অনুরূপ পাপ সৃষ্টি করতে পারে। উদ্ভিদ বা বৃক্ষকে প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ দান বলা হয়। বনজাত গাছ-পালার মাধ্যমে ভূ-মণ্ডলের পরিবেশ ও প্রকৃতির ভারসাম্য সংরক্ষণ করা হয়। উদ্ভিদ প্রকৃতি ও পরিবেশের পরম বন্ধু। বুদ্ধ বৃক্ষকে সর্বপ্রথম এক জীববিশিষ্ট প্রাণী বলে আখ্যায়িত করেন।[৪৩] বুদ্ধের সময়কাল খ্রি. পূর্ব ষষ্ঠ শতক। সুতরাং ইতোপূর্বে আর কেউ

বৃক্ষকে প্রাণী হিসেবে স্বীকৃতি বা চিহ্নিত করেনি। পরবর্তী সময়ে স্যার জগদীশচন্দ্র বসু প্রমাণ করলেন গাছের প্রাণের অস্তিত্বের কথা।

৬.২. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

বৌদ্ধ ধর্মের পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালা আজকের বিশ্বে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক, বিশেষ করে যখন জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয় একটি বৈশ্বিক সংকটে পরিণত হয়েছে। বুদ্ধের নির্দেশিত এটি একটি গভীর পরিবেশবান্ধব দর্শনের প্রতিফলন। মল-মূত্র বা থুথু ফেলার স্থান নির্বাচনে সচেতনতা পরিবেশ দূষণ রোধ করে। আধুনিক পরিবেশবিজ্ঞানও মল-মূত্রকে মাটি ও জলদূষণের একটি কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা আজও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতাকে ধর্মাচরণের অংশ বিবেচনা করেন। Graham Parkes তাঁর প্রবন্ধে 'Voices of Mountains, Trees, and Rivers: Kukai, Dogen, and a Deeper Ecology' লিখেছেন বৌদ্ধধর্ম পরিবেশেবাদকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।[৪৪]

৬.৩. সামাজিক শ্রদ্ধা ও গ্রহণযোগ্যতা

বুদ্ধেও শিক্ষ-দর্শন আর আচরণ-আচরণ ইঙ্গিত দেয় যে, পরিবেশ দূষণ রোধে সমাজে বৌদ্ধ সংঘের আলাদা গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। থাইল্যান্ডে "ecology monk" নামে পরিচিত মহান বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বন সংরক্ষণ ও প্লাস্টিক দূষণ রোধে সক্রিয়।[৪৫] দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধ ভিক্ষুরা অরণ্য বিহার প্রতিষ্ঠা করে বন উজাড় প্রতিরোধ করেন।[৪৬] মিয়ানমারে "সবুজ সংঘ" নামে একটি বৌদ্ধ সংঘঠন জলবায়ু সচেতনতায় কাজ করে যাচ্ছে।[৪৭] প্রাচীন ভারতে ভিক্ষুদের আচরণ সমাজের দৃষ্টিতে তাঁদের মর্যাদা নির্ধারণ করতেন। *'বিনয় পিটক'* গ্রন্থের *চুল্লবগ্গ* এ বলা হয়েছে, ভিক্ষুদের অবিনয়ী আচরণ সাধারণ মানুষের নিকট অবিশ্বাস সৃষ্টি করে।[৪৮]

৬.৪. স্বাস্থ্যবিধি ও সামগ্রিক কল্যাণ

সজীব উদ্ভিদে মল-মূত্র ত্যাগ রোগজীবাণু ছড়ায়। বুদ্ধের যুগে কলেরা বা ডায়রিয়ার মতো রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল যা *'বিনয় পিটক'* গ্রন্থের অন্তর্গত *'মহাবর্গ'* পাঠের মাধ্যমে জানা যায়।[৪৯] WHO-র মতে, অস্বাস্থ্যকর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ডায়রিয়ার ৮৮% হওয়ার কারণ।[৫০]

৬.৫. অপরাধ ও শাস্তির ধারণা

এই নিয়ম ভঙ্গ করলে "দুক্কট" বা সামান্য অপরাধ শ্রেণির অপরাধ হয়, যা সংশোধনের মাধ্যমে শুদ্ধ করা যায়।[৫১] এটি ভিক্ষুদের আত্মনিয়ন্ত্রণ শেখায়। বুদ্ধের এই শিক্ষা একটি সামগ্রিক সামাজিক-পরিবেশগত দর্শন যা প্রাণী, প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে। আধুনিক প্রেক্ষাপটে এর তাৎপর্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষত জলবায়ু সংকট ও সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণে।

৬.৬. বৌদ্ধধর্মে প্রকৃতির প্রতি সম্মান প্রর্দশন

প্রকৃতির সকল উপাদান মাটি, জল, উদ্ভিদকে সংযুক্ত ও জীবন্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয় বৌদ্ধ দর্শনে । *'বিনয় পিটক'* -এর *'চূল্লবর্গ'* গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, উদ্ভিদের অনাবশ্যক ক্ষতি প্রাণীহিংসার সমতুল্য পাপ সৃষ্টি করতে পারে।[৫২] এটি বৌদ্ধ সাহিত্যে আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত যেহেতু জগতের সকল জীবের প্রতি প্রাণের প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশ করার কথা বলা হয়েছে মানব দুঃখ মুক্তির জন্য।

৬.৭. আধুনিক পরিবেশ বিজ্ঞানের সাথে সঙ্গতি রক্ষা

মল-মূত্র ও থুথু প্রাকৃতিক পরিবেশে ফেললে নাইট্রোজেন ও ব্যাকটেরিয়ার কারণে মাটি ও জলদূষণ হয়। WHO-র মতে, ৮০% জলবাহিত রোগের কারণ অস্বাস্থ্যকর পয়ঃনিষ্কাশন।[৫৩]

৬.৮. বিশ্বায়ণে প্রয়োগ

SDGs (Sustainable Development Goals)-এর[৫৪] লক্ষ্য ৬ হলো পরিষ্কার জল ও স্যানিটেশন এবং লক্ষ্য ১৫ হলো স্থলজ জীবন যা বৌদ্ধ পরিবেশ নীতির সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। ভুটানের গ্রস ন্যাশনাল হ্যাপিনেস নীতিতে বৌদ্ধ পরিবেশদর্শনের প্রভাব রয়েছে, যেখানে প্রকৃতির অধিকার সংবিধানে স্বীকৃত। বুদ্ধের এই শিক্ষা শুধু খ্রিষ্টপূর্ব যুগের প্রাসঙ্গিকতা নয়; এটি আজকের পরিবেশ সংকটের একটি সক্রিয় সমাধান। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পরিবেশ সংরক্ষণের ঐতিহ্য প্রমাণ করে যে ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয়েই টেকসই ভবিষ্যৎ গড়ে উঠতে পারে। মল-মূত্রের মাধ্যমে মাটি ও জলদূষণ রোধ করে, যা আজকের SDG-লক্ষ্য ৬ (পরিষ্কার জল ও স্যানিটেশন)-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভুটানে বৌদ্ধনীতির ভিত্তিতে ৭২% বনাঞ্চল সংরক্ষিত।[৫৫] প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ বিহারগুলোতে শৌচাগার ও নর্দমা ব্যবস্থা থাকত। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে শৌচালয়গুলি জল প্রবাহের মাধ্যমে পরিষ্কার হতো।

৬.৯. বর্জ্য নিষ্কাষণ ব্যবস্থা

বর্তমান সময়ে বিভিন্ন ছোটো বড় কলকারখানা থেকে নানারকম বর্জ্য অপসারণ করা হয়। কিন্তু অনেক সময় আবার যথাযথভাবে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় না। ফলে সমাজে দেখা দেয় বহু রোগের প্রাদুর্ভাব। তাছাড়া এই বর্জ্য আবার সরাসরি নদ-নদী, খাল, বিলে অপসারণ করা হয়। ফলশ্রুতিতে নদ-নদী, খাল, বিলের পানি দূষণের পাশাপাশি নদ-নদী, খাল, বিল ভরাট হয়ে যাচ্ছে। যার কারণে বন্যার দেখা দেয়। বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে মানবজীবন। বুদ্ধ তাঁর শিক্ষায় যথাযথ ময়লা আবর্জনা অপসারণ করার কথা বলে গেছেন।

৭. জীবপ্রেম

মহামতি গৌতম বুদ্ধের জীবন ও শিক্ষার প্রধানতম আকর্ষণ ছিলো অহিংসা ও করুণা যা তার গভীর জীবপ্রেমকে প্রকাশ করে। তিনি শুধু মানুষেরই নয়, সমস্ত প্রাণীর মুক্তি ও সুখ কামনা করতেন। বৌদ্ধ সাহিত্য, জাতক কাহিনি এবং বুদ্ধের বাণীতে এই জীবপ্রেমের অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। বুদ্ধ পঞ্চশীলের প্রথম শীলেই প্রাণী হত্যা সম্পর্কিত

শিক্ষাপদ উল্লেখ করেছেন। এই শিক্ষাপদ শিকার, পশুবলি ও প্রাণীহত্যা হতে বিরত থেকে সকল প্রাণীর প্রতি প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, মৈত্রী ও করুণা শিক্ষা দেয়। বুদ্ধ ভিক্ষুদের পরিস্রাবিত পানি পান করার জন্য বলেন। অর্থাৎ, অপরিস্রাবিত পানি পান না করার জন্য বিধি-নিষেধ আরোপ করেন।[৫৬] মূলত এরূপ নিয়মগুলো প্রবর্তিত হয়েছিল ভিক্ষুদের কীট-পতঙ্গ ধ্বংস করা থেকে বিরত রাখার জন্যে। উপরি-উক্ত বিধান অনুসারে যদি কোনো ভিক্ষু কীট-পতঙ্গযুক্ত পানি পান করেন তবে তিনি পাচিত্তিয়া অপরাধেও অপরাধী হবেন।[৫৭] সাধারণ অর্থে 'পাচিত্তিয়া' বলতে দুঃখ প্রকাশ, প্রায়শ্চিত্তিক, দোষ স্বীকার ইত্যাদি বোঝায়। এটি কুশল ধর্মকে প্রভাবিত করে বা পরমার্থ লাভের অন্তরায়কর বলে তাকে পাচিত্তিয়া বলে। বলা যায়, উপরি-উক্ত নির্দেশনায় স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করা ছাড়াও সমস্ত প্রাণীর প্রতি করুণা ভাবও প্রদর্শন করা হয়।

৭.১. তীর বিদ্ধ হাসেঁর শূশুষা

প্রাণীর সাথে বুদ্ধের খুব সখ্যতা ছিল। শিশু-কিশোর বয়স থেকেই প্রকৃতি, পরিবেশ ও প্রাণীর প্রতি বুদ্ধের অহিংস ভাব ছিল। বুদ্ধের শৈশবের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কথিত আছে, একদা বুদ্ধ রাজবাড়ির উদ্যানে একাকী অবস্থান করছিলেন। সেইসময় বুদ্ধের জ্ঞাতি ও মামাতো ভাই দেবদত্ত একটি রাজহাসঁকে তীরবিদ্ধ করেন। তীরবিদ্ধ হাঁসটি বুদ্ধের সামনে এসে পড়ে। তীরে আহত হাঁসটি কষ্টে ছটফট করছিল । তখন সিদ্ধার্থ পরম মমতায় হাসঁটিকে উদ্ধার করে কোলে নিয়ে তার ক্ষত শুশ্রুষা করেন। এবং হাঁসটি সুস্থ হয়ে উঠে।

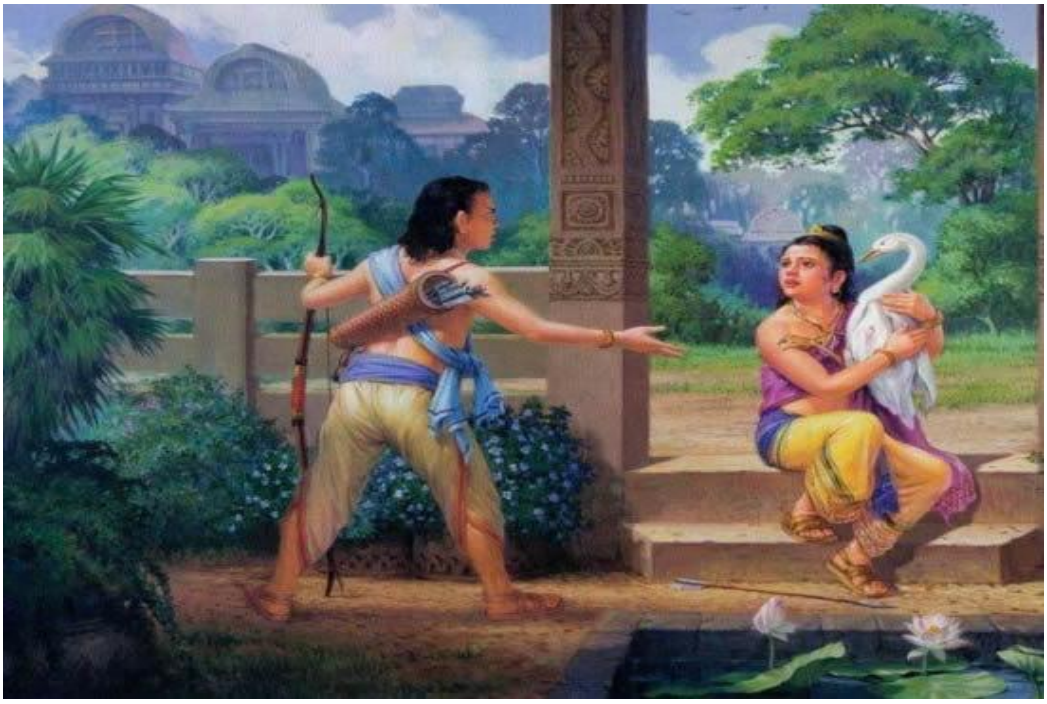

চিত্র ১২ : বুদ্ধ কর্তৃক তীরবিদ্ধ হাসেঁর শুশ্রুষা

Source: https://elinepa.org/who-owns-the-swan/

পরে রাজহাসঁটি নিয়ে দেবদত্তের সাথে মতবিরোধ হলে, সিদ্ধার্থ যুক্তি দেন যে এই হাসঁ হত বা হত্যা হয়নি, আহত হয়েছে মাত্র। আমি হাসঁটির সেবা-শূশুষা করে তার প্রাণ বাঁচিয়েছি। যে বাঁচায় আহত প্রাণীটি তারই হয়, মরে গেলে তোমার হতো।[৫৮] অর্থাৎ, প্রাণীর জীবন রক্ষাকারীই তার প্রকৃত মালিক, হত্যাকারী নয়। অত:পর সিদ্ধার্থ হাঁসটিকে মুক্ত আকাশে ছেড়ে দিয়ে মুক্ত করে দেন। এই ঘটনায় তাঁর প্রজ্ঞা ও জীবপ্রেম, অহিংসা প্রকাশ পায়। *'সুত্ত নিপাত'* গ্রন্থের *'মৈত্রীসূত্রে'* জীবপ্রেমের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে :

মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ূসা একপুত্তোমনুরক্খে
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসং ভাবযে অপরিমানং।[৫৯]

অর্থাৎ, মা যেমন নিজের একমাত্র সন্তানকে আপন জীবন দিয়ে সকল প্রকার বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করেন তেমনি সবাইকে সীমাহীন অপরিমেয় মৈত্রী দিয়ে ভালোবাসবে।

৮. হলকর্ষণ উৎসব ও বুদ্ধের জীবের প্রতি আকর্ষণবোধ

বুদ্ধের সময়কালে রাজাগণ হলকর্ষণ[৬০] উৎসব পালন করতেন। হল কর্ষণ উৎসব হলো ঐতিহ্যবাহী উৎসব। একসময় সিদ্ধার্থ গৌতম পিতা রাজা শুদ্ধোধনের সাথে হলকর্ষণ উৎসবে যোগ দেন। এই উৎসবে এসে দেখলেন কর্ষিত ভূমির উপর মৃত ও জীবিত অগণিত কীট পতঙ্গ। উড়ন্ত পাখীগুলো সে সব কীট পতঙ্গ ধরে ধরে খাচ্ছে, ভেকের (ব্যাঙ) দল খাচ্ছে কীট পতঙ্গ, গর্ত থেকে সাপ বেরিয়ে এসে খাচ্ছে সে সব ভেক আবার গরুড় পাখী উড়ে এসে ধরে নিয়ে যাচ্ছে সাপগুলোকে। জীবের কাছে জীবিকার জন্য জীবের বিনাশ। জীবের এই ব্যর্থ প্রয়াস দেখে উদ্বেল হয়ে উঠল তাঁর প্রাণ।[৬১] এখানে সিদ্ধার্থ গৌতম খুব অল্প বয়সে এসে প্রকৃতি প্রেম, জীববৈচিত্র্য রক্ষা, কৃষি সংস্কৃতির পাশাপাশি নৈতিকতার মেলবন্ধকে দেখতে পান। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত Buddhadasa তাঁর *Hand Book for Mankind* গ্রন্থে কৃষিকাজে অহিংসা মনোভাব এবং স্থিতিশীলতাভাব বজায় রাখাকে প্রকৃত ধর্মচর্চা বলে জানান।[৬২]

৯. জাতক সাহিত্যে প্রকৃতি ও পরিবেশ

'ত্রিপিটক' গ্রন্থের অন্তর্গত জাতক সাহিত্য শুধু পালি সাহিত্যে কিংবা বৌদ্ধ সাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্যের ভান্ডারে এক অমূল্যসম্পদ। অর্থাৎ, গৌতম বুদ্ধের অতীত জীবনের বিচিত্র কাহিনিগুলো জাতকাকারে লিপিবদ্ধ। গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বজন্মের কাহিনিসমূহ 'জাতক' গ্রন্থে সন্নিবেশিত রয়েছে। পালিসাহিত্যের বর্ণনায় দেখা যায় বুদ্ধ কীভাবে দশটি পারমী[৬৩] পূর্ণ করে অসংখ্যবার জন্মগ্রহণ করেন। পারমী পূর্ণকালীন সময়ে মহামানব গৌতম বুদ্ধ বিভিন্ন কূলে জন্মগ্রহণ করে এক একটি আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। কখনো প্রভৃতির ভিন্ন রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। যেখানে পাওয়া যায় জীববৈচিত্র্যেও নানা উপাদান। জাতক সাহিত্যের[৬৪] বিভিন্ন জাতকে উল্লেখ আছে বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব রূপে পরিবেশ এর সাথে যেন জড়িয়ে ছিলেন। জাতক সাহিত্য হলো বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন ইতিহাসসমৃদ্ধ কাহিনিসংগ্রহ, যেখানে গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত অতি চমৎকার করে উপস্থাপিত হয়েছে। এই সাহিত্যটি হাজার বছরের শিক্ষা, সভ্যতা, ইতিহাস, অর্থনীতি, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মানবিক মূল্যবোধ, মানব সভ্যতা বিকাশের অসাধারণ

ভূমিকা পালন করে চলেছে। ফলে এই সাহিত্যের গুরুত্ব পালি সাহিত্যের পাশাপাশি সামগ্রিক সাহিত্যের অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য কর্মটি বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ *'ত্রিপিটক'* -এর তিনটি খণ্ডের (বিনয়পিটক, সুত্তপিটক ও অভিধর্ম পিটক) মধ্যে *'সুত্তপিটক'* -এর অন্তর্গত *'খুদ্দক নিকায়'* -এর ষোলটি গ্রন্থের মধ্যে দশম গ্রন্থ হলো 'জাতক'। নিম্নে জাতক গ্রন্থের উৎস ধারার পরিচিতি প্রদান করা হলো:

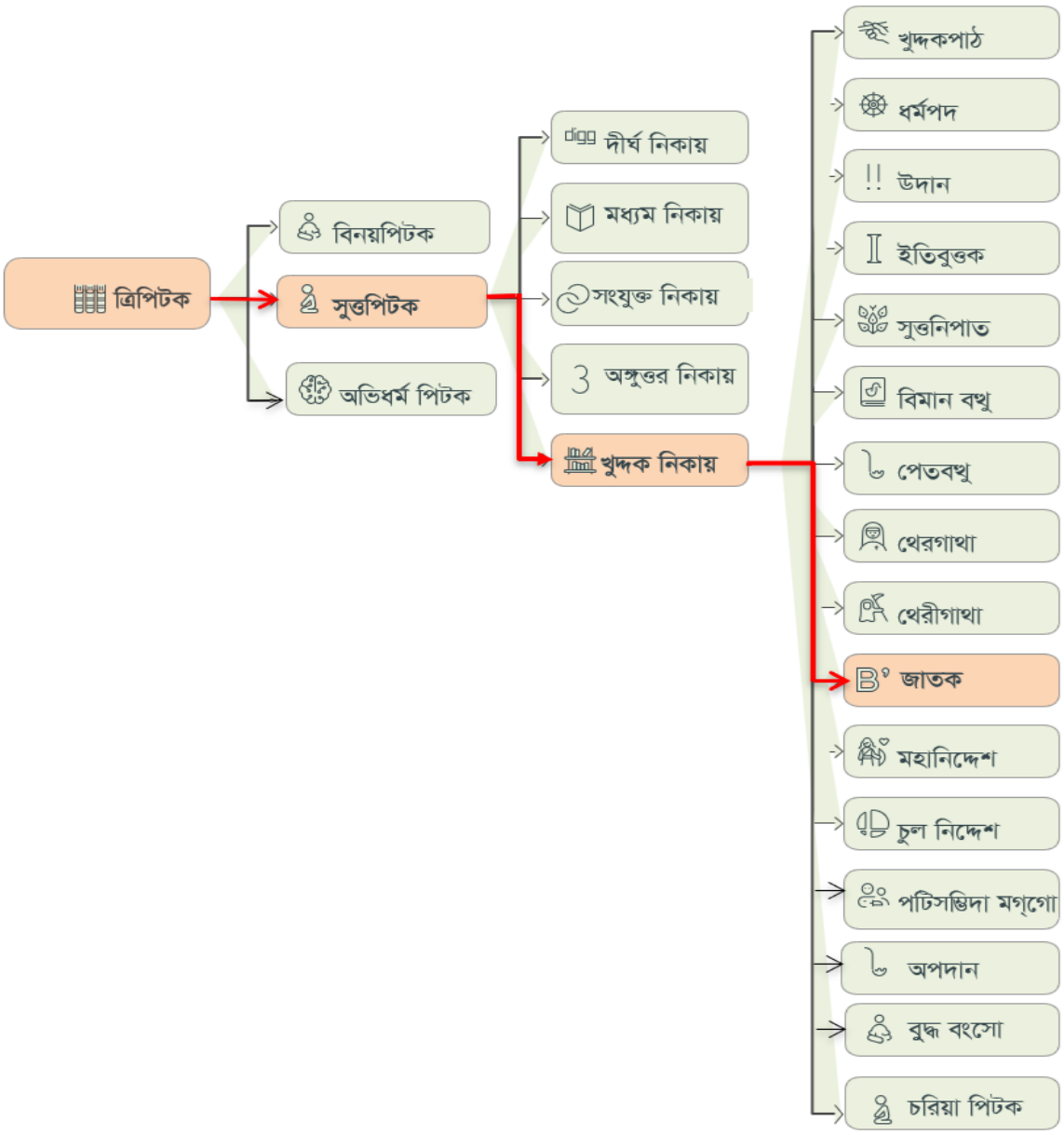

চিত্র ১৩ : জাতকের উৎস

'জাতক' - এর গুরুত্ব অত্যন্ত ব্যাপক। এই কাহিনিগুলিতে প্রকৃতি ও পরিবেশের একটি গভীর সম্পর্ক, যা নৈতিক শিক্ষা, প্রতীকী অর্থ ও মনুষ্য-প্রকৃতি সম্পর্ককে ফুটিয়ে তোলে। জাতক কাহিনিতে প্রকৃতিকে প্রায়শই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার বাহক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে বোধিসত্ত্বরূপে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপে কখনো মানুষ, পশু, পাখি, **বণিক, শ্রেষ্ঠী কুলে, রাজপুত্র, রাজা, প্রজা, ব্রাহ্মণ, প্রাণী কুলে, অমাত্য, রাজপুরোহিত, জমিদার, ধনী কুলে, বৃক্ষদেবতা** প্রভৃতি বহু রূপে জন্মগ্রহণ করেন। এর মধ্যে তিনি পরিবেশ এর যে উপাদান রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন তা নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	বোধিসত্ত্ব রূপ	জন্মের সংখ্যা	জাতকের নাম ও সংখ্যা
১	বৃক্ষদেবতা	৩০ বার	কণ্ডিন মৃগ জাতক (১৩), মৃতক ভক্ত জাতক (১৮), আয়াচিত ভক্ত জাতক (১৯), বক জাতক (৩৮), বৃক্ষধর্ম জাতক (৭৪), পর্ণিক জাতক (১০২), দুব্বল কাষ্ঠ জাতক (১০৫), কুণ্ডকপূপ জাতক (১০৯), শৃগাল জাতক (১১৩), উভতোভ্রষ্ট জাতক (১৩৯), চতুমৃষ্ট জাতক (১৮৭), গাঙ্গেয় জাতক (২০৫), কক্কর জাতক (২০৯), সেগৃগু জাতক (২১৭), গ্রোথ প্রাণ জাতক (২২৭), বাঘ জাতক (২৭২), বদ্ধকি শূকর জাতক (২৮৩), জম্বু খাদক জাতক (২৯৪), অন্ত জাতক (২৯৫), উড়ুম্বর জাতক (২৯৮), পলাশ জাতক (৩০৭), পিচুমন্দ জাতক (৩১১), বর্ণারোহ জাতক (৩৬১), দণ্ডপুষ্প জাতক (৪০০), কোটিশাল্মলি জাতক (৪১২), সুলসা জাতক (৪১৯), পুতিমাংস জাতক (৪৩৭), স্পন্দন জাতক (৪৭৫) এবং তক্ষকশূকর জাতক (৪৯২), গণ্ডতিন্দু জাতক (৫২০)
২	বানর	১৩ বার	নলপান জাতক (২০), নলপান জাতক (২০), বানরেন্দ্র জাতক (৫৭), এয়োধর্ম্ম জাতক (৫৮), তিন্দুক জাতক (১৭৭), শিশুমার জাতক (২০৮), গর্হিত জাতক (২১৯), চুলনন্দিক জাতক (২২২), বানর জাতক (৩৪২), কপি জাতক (৪০৪), মহাকপি জাতক

			(৪০৭), মহাকপি জাতক (৫১৬), কুম্ভীর জাতক (২২৪)
৩	মৃগ	১১ বার	লক্ষণ জাতক (১১), ন্যগ্রোধমৃগ জাতক (১২), খরাদিয়া জাতক (১৫), ত্রিপর্য্যন্তমৃগ জাতক (১৬), কুরুঙ্গমৃগ জাতক (২১), কুরঙ্গমৃগ জাতক (২০৬), সুবর্ণমৃগ জাতক (৩৫৯), নন্দিকমৃগ জাতক (৩৮৫), রুরু জাতক (৪৮২), শরভমৃগ জাতক (৪৮৩), রোহন্তমৃগ জাতক (৫০১)
৪	সিংহ	১০ বার	বিরোচন জাতক (১৪৩), শৃগাল জাতক (১৫২), শূকর জাতক (১৫৩), গুণ জাতক (১৫৭), দর্দ্দর জাতক (১৭২), সিংহক্রোষ্টুক জাতক (১৮৮), দদ্দভ জাতক (৩২২), জম্বুক জাতক (৩৩৫), মনোজ জাতক (৩৯৭), মহোৎক্রোশ জাতক (৪৮৬)
৫	রাজহংস	৭ বার	নৃত্য জাকত (৩২), উলূক জাতক (২৭০), পলাশ জাতক (৩৭০), মেরু জাতক (৩৭৯), জবনহংস জাতক (৪৭৬), হংস জাতক (৫০২), খুল্লহংস জাতক (৫৩৩),
৬	বর্ত্তক	৫ বার	সম্মোদমান জাতক (৩৩), বর্ত্তক জাতক (৩৫), বর্ত্তক জাতক (১১৮), শকুনঘ্নী জাতক (১৬৮), বর্ত্তক জাতক (৩৯৪)
৭	হস্তি	৭ বার	কীলবন-নাগ জাতক (৭২), দুর্মেধা জাতক (১২২), কাষার জাতক (২২১), কর্কট জাতক (২৬৭), লট্বকা জাতক (৩৫৭), মাতৃপোষক জাতক (৪৫৫), ষড়দন্ত জাতক (৫১৪)
৭	কুক্কুট(ডিম্বজ পাখি)	২ বার	কুক্কুট জাতক (৩৮৩), কুক্কুট জাতক (৪৪৮)
৮	গৃধ্র(শকুন)	৫ বার	গৃধ্র জাতক (১৬৪), মৃগালোপ জাতক (৩৮১), ধর্ম্মধ্বজ জাতক (৩৮৪), গৃধ্র জাতক (৩৯৯), গৃধ্র জাতক

			(৪২৭),
৯	অশ্ব (ঘোটক)	৪ বার	ভোজাজানেয় জাতক (২৩), আজন্ন জাতক (২৪), বালাহাশ্ব জাতক (১৯৬), বাতাগ্রসৈন্ধব জাতক (২৬৬)
১০	গরু	৪ বার	নন্দিবিলাস জাতক (২৮), কৃষ্ণজাতক (২৯), মুনিক জাতক (৩০), শালূক জাতক (২৮৬)
১১	ময়ূর	২ বার	ময়ূর জাতক (১৫৯), বাবেরু জাতক (৩৩৯)
১২	সর্প (নাগ)	৪ বার	দর্দ্দর জাতক (৩০৪), চাম্পেয় জাতক (৫০৬), সুশ্রোণি জাতক (৩৬০), পান্ডর জাতক (৫১৮)
১৩	মৎস	৩ বার	মৎস্য জাতক (৭৫), মিতচিন্তি জাতক (১১৪), বক জাতক (২৩৬)
১৪	মূষিক(ইদুর)	২ বার	বিড়াল জাতক (১২৮), অগ্নিক জাতক (১২৯),
১৫	শৃগাল	২ বার	শৃগাল জাতক (১৪২), শৃগাল জাতক (১৪৮)
১৬	কাক	৩ বার	কাক জাতক(১৪০), বীরক জাতক(২০৪), সুপত্র জাতক (২৯২)
১৭	শূকর	১ বার	তুণ্ডিল জাতক (৩৮৮)
১৮	কুকুর	১ বার	কুক্কুর জাতক (২২)
১৯	পারাবত (কবুতর)	৬ বার	কপোত জাতক (৪২), লোল জাতক (২৭৪), রুচির জাতক (২৭৫), রোমক জাতক (২৭৭), কপোত জাতক (৩৭৫), কাক জাতক (৩৯৫)
২০	পক্ষি	৪ বার	শকুন জাতক (৩৬), তিত্তির জাতক (৩৭), অনুশাসক জাতক (১১৫), ঘৃতাশন জাতক (১৩৩)
২১	কুশগুচ্ছ দেবতা	১ বার	কুশনালী জাতক (১২১)
২২	গাধা	৩ বার	গোধা জাতক (১৩৮), গোধা জাতক (১৪১), গোধা জাতক (৩২৫)
২৩	শুক পাখি	৮ বার	রাধ জাতক (১৪৫), রাধ জাতক (১৯৮), শুক জাতক (২৫৫), কালবাহু জাতক (৩২৯), মহাশুক জাতক (৪২৯), খুল্লশুক (৪৩০), শালিকেদার জাতক (৪৮৪),

			শক্তিগুল্ম জাতক (৫০৩)
২৪	সমুদ্র দেবতা	২ বার	কাক জাতক (১৪৬), সমুদ্র জাতক (২৯৬)
২৫	আকাশ দেবতা	১ বার	পুষ্পরক্ত জাতক (১৪৭)
২৬	কাষ্টকূট	২ বার	কন্দগলক জাতক (২১০), জবশকুন জাতক (৩০৮)
২৭	ব্যাঙ	১ বার	হরিতমাত জাতক (২৩৯)
২৮	মহিষ	১ বার	মহিষ জাতক (২৭৮),
২৯	শৃঙ্গিল বিহঙ্গ	১ বার	কুটী-দূষক জাতক (৩২১)
৩০	তিত্তির পাখি	১ বার	তিত্তির জাতক (৪৩৮)

সারণি : ৬

উপরি-উক্ত সারণি থেকে দেখা যায় বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব হয়ে প্রকৃতিতে বিভিন্নরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় বোধিসত্ত্বরূপেও প্রকৃতির সাথে নিবিড় সম্পর্ক ছিল। কীভাবে পশুদের রক্ষা করা দরকার তার একটি ধারণা *'নন্দিবিশাল জাতকে'* দেখা যায়।[৬৫] বলা বাহুল্য, বুদ্ধ তাঁর শিক্ষা দর্শনে মৈত্রীকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। মৈত্রীর দ্বারা বনের হিংস্র পশুদেরকে পোষ মানানো সম্ভব। *'খুল্লহংস জাতকে'* বর্ণিত আছে যে, একসময় বুদ্ধের প্রাণনাশের জন্য দেবদত্ত একটি হস্তী প্রেরণ করলে বুদ্ধ সেই হস্তীকে মৈত্রী দ্বারা পোষ মানিয়েছিলেন।[৬৬] আবার *'মচ্ছুদান'* জাতক হতে জানা যায় যে, বোধিসত্ত্ব তাঁর খাদ্যের একটি অংশ মাছের জন্য নদীতে নিক্ষেপ করতেন।[৬৭] *'উম্মাদয়ন্তি জাতকে'* উল্লেখ আছে, ক্ষত্রিয় রাজা পশু-পাখিদের প্রতি মৈত্রীপরায়ণ ছিলেন।[৬৮]

১০. পরিবেশ ও বুদ্ধের ভৈষজ দ্রব্যের ব্যবহার

পরিবেশ এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বৃক্ষ। আর বিবিধ বৃক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রকার ওষুধ তৈরি করা হয়, যা *'ত্রিপিটক'* -এর *'বিনয় পিটক-* এর অর্ন্তগত মহাবর্গের ভৈষজ্য স্কন্ধে উল্লেখ রয়েছে।[৬৯] অধ্যায়টিতে বৌদ্ধ ভিক্ষু-শ্রমণদের ব্যবহার্য ওষুধ-পত্রর বিধিনিষেধ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এখানে বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের বিভিন্ন রোগের জন্য বনজ তথা প্রাকৃতিক ঔষধের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন এবং সেগুলোর যথাযথ সংরক্ষণের বিষয়ে তাগিদ দিয়েছেন। বুদ্ধের চিকিৎসক ছিলেন বিখ্যাত ভৈষজবিশারদ জীবক। ভৈষজজ্ঞান পরীক্ষা করার জন্যে জীবককে একদিন তাঁর গুরু চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয় না এমন গাছ নিয়ে আসার কথা বলেন। জীবক তাঁর গুরুর কথা মতো তক্ষশীলার চারদিকে বিচরণ করে চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয় না এমন কোনো গাছ-গাছালি, লতা-গুল্ম কিছুই দেখতে পাননি। বনের মধ্যে যে সমস্ত গাছ-পালা, লতা-পাতা-গুল্ম রয়েছে সবই ওষুধি যা সবই ভৈষজ।[৭০] সুতরাং জানতে হবে বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষরাজি ফলমূল, লতা-পাতা জীবনরক্ষাকারী ভৈষজও বটে। বুদ্ধের *'বিনয়পিটক'* এর ভৈষজ স্কন্ধ প্রাচীন ভারতের চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কে এটি একটি মূল্যবান দলিল বলা যায়। ভৈষজ স্কন্ধ অধ্যায়ে

ভিক্ষু-শ্রমণদের ব্যবহার্য ঔষধ-পথ্যের বিধিনিষেধ এবং নানা প্রকার চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যার মূল উৎস প্রকৃতি ও পরিবেশ। ভিক্ষুসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রাককালে ভিক্ষুদের বিভিন্ন রোগ হলে বুদ্ধ এসব বিধিনিষেধ এবং চিকিৎসা পদ্ধতির প্রবর্তন করেন, যা বর্তমান সমাজের চিকিৎসা পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে এ চিকিৎসাকে আয়ুর্বেদ বলা হয়েছে যা পরিবেশ থেকে প্রাপ্ত অমূল্য সম্পদ। আর এই চিকিৎসার জনপ্রিয়তা দিনদিন যেন বেড়ে চলেছে।

১১.১. পঞ্চবিধ ভৈষজ গ্রহণের বিধি-বিধান

একসময় বুদ্ধ জেতবনে অনাথপিন্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। সেসময় ভিক্ষুগণ শারদীয় রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাদের ভুক্ত যবাগূ এবং অন্ন বমি হয়ে যেত এবং তাঁরা কৃশ, রুগ্ন, দুর্বল, পান্ডুবর্ণ হয়ে যান এবং তাঁদের শরীর ধমনিজালে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। বুদ্ধের প্রধান সেবক আনন্দ বুদ্ধকে এসব জ্ঞাত করলে বুদ্ধ এমন এক ঔষধের ব্যবস্থা করেন যা ঔষধ, ঔষুধের মধ্যে গণ্য হয় এবং আহার কার্যও সম্পন্ন করে। যেগুলো পঞ্চ ভৈষজ। পঞ্চবিধ[৭১] ভৈষজ হলো :

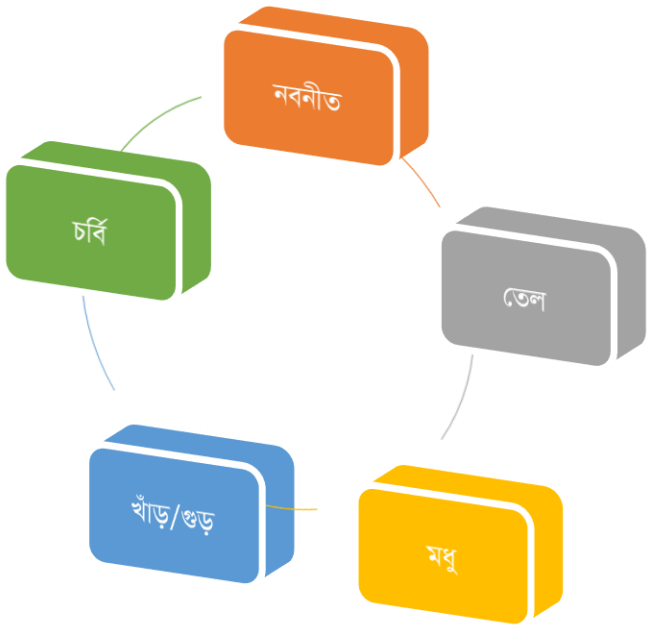

চিত্র ১৪ : পঞ্চবিধ ভৈষজ

উল্লেখ থাকে যে, ভৈষজ-র প্রত্যেকটি উপাদানকে পরিবেশের অকৃত্রিম দান বলা যায়। বুদ্ধ প্রথমে পঞ্চবিধ ভৈষজ সকালে আহার করার অনুমতি দিলে ভিক্ষুদের শরীরের উন্নতি না হয়ে বরং আরও খারাপ হতে লাগলো। অতঃপর বুদ্ধ তাঁদের এসকল ভৈষজ সকাল ও বিকালে সেবন করার আদেশ দেন এবং ফলে তারা রোগমুক্ত হন।[৭২] তাছাড়া পরিবেশের যে উপাদানসমূহ ব্যবহৃত হতো তা সারণির[৭৩] মাধ্যমে নিম্নে তুলে ধরা হলো :

প্রকৃতি প্রাপ্ত ভৈষজরূপ	উপাদান
চর্বি সংযুক্ত ভৈষজ	ভিক্ষুদের আরোগ্য লাভের জন্য চর্বিমিশ্রিত ভৈষজের প্রয়োজন হলে বুদ্ধ ভাল্লুক, মৎস্য, শিশুমার, শূকর ও গর্দ্দভের চর্বি সংমিশ্রিত করে সেবন করার আদেশ দেন।
মূল-সংযুক্ত ভৈষজ	মূল (শিকড়) সংমিশ্রিত ভৈষজের প্রয়োজন হলে বুদ্ধ হরিদ্রা, আর্দ্রক, বচ, বচস্থ, অতিবিষ, কুঁকরোহিণি, উশীর (বেনারমূল) ভদ্রমুস্তক (নাগর মোথা) সেবন করার আদেশ দেন।
কষায় সংযুক্ত ভৈষজ	ভিক্ষুদের আরোগ্য লাভের জন্য কষায় সংমিশ্রিত ভৈষজের প্রয়োজন হলে বুদ্ধ নিম্বের কষায়, গিরিমল্লিকা কষায়, পটোলের কষায়, পগ্‌গবের কষায়, নস্তমালের কষায় সেবন করার আদেশ দেন।
পত্র-ভৈষজ	ভিক্ষুদের আরোগ্য লাভের জন্য পত্র সংমিশ্রিত ভৈষজের প্রয়োজন হলে বুদ্ধ নিম্বপত্র, গিরিমল্লিকাপত্র, পটোলপত্র, তুলসীপত্র, কার্পাসপত্র সেবন করার আদেশ দেন।
ফল-ভৈষজ	রুগ্ন ভিক্ষুদের আরোগ্য লাভের জন্য ফল সংমিশ্রিত ভৈষজের প্রয়োজন হলে বুদ্ধ বিড়ঙ্গ, পিপুঁল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, গোষ্ঠফল সেবন করার আদেশ দেন।
জু- ভৈষজ	রুগ্ন ভিক্ষুদের আরোগ্য লাভের জন্য জু সংমিশ্রিত ভৈষজের প্রয়োজন হলে বুদ্ধ হিঙ্গু, হিঙ্গুজতু, হিঙ্গুসিপাটিক, তক, তকপত্তি, তশপর্ণী, সর্জ্জরস সেবন করার আদেশ দেন।
লবণের ভৈষজ্য	রুগ্ন ভিক্ষুদের আরোগ্য লাভের জন্য লবণ সংমিশ্রিত ভৈষজের প্রয়োজন হলে বুদ্ধ সামুদ্রি লবণ, কাললবণ, সৈন্ধবলবণ, বানস্পতিকলবণ, বিটলবণ সেবন করার আদেশ দেন।

সারণি : ৭

১১. বৃক্ষ ছেদন প্রতিরোধে বুদ্ধের শিক্ষা

একসময় অরণ্যবিহারী বৌদ্ধ ভিক্ষুরা নবকর্ম করার সময় নিজেরা বৃক্ষ ছেদন করছিলেন এবং অন্যদেরকে দিয়েও বৃক্ষ ছেদন করাছিলেন। বিষয়টি সম্পর্কে বুদ্ধ যথাযথ অবগত হলে তিনি বৃক্ষ ছেদন (কাটা) বা বৃক্ষ নষ্ট না করার জন্য অনুজ্ঞা প্রদান করেন। তাছাড়াও উদ্ভিদ জাতীয় বৃক্ষ-লতাদি ছেদন করলে কিংবা নষ্ট করলে পাচিত্তিয়া (প্রায়শ্চিত্তিক) অপরাধে অপরাধগ্রস্থ হয় বলে তিনি জানান।[৭৪] পরিবেশ রক্ষায় বুদ্ধের শিক্ষায় বিভিন্ন অনুশাসন

দেখতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে এটি অন্যতম হিসেবে পরিগণিত কেননা বর্তমান সময়ে এসেও মানুষ নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন করছে প্রয়োজনের চেয়ে অপ্রয়োজনেই বেশি। আড়াই হাজার বছর পূর্বে বৃক্ষ নিধন থেকে দূরে থাকার বিষয়ে সচেতনতা প্রদান করে গেছেন যা বর্তমান সময়ে এসেও সমান ভাবে গুরুত্ব বহন করে। এক্ষেত্রে বুদ্ধ বিশেষ করে পাঁচ প্রকারের বৃক্ষকে কর্তন কিংবা বিনষ্ট করা থেকে বিরত থাকার কথা বলেন।[৭৫]

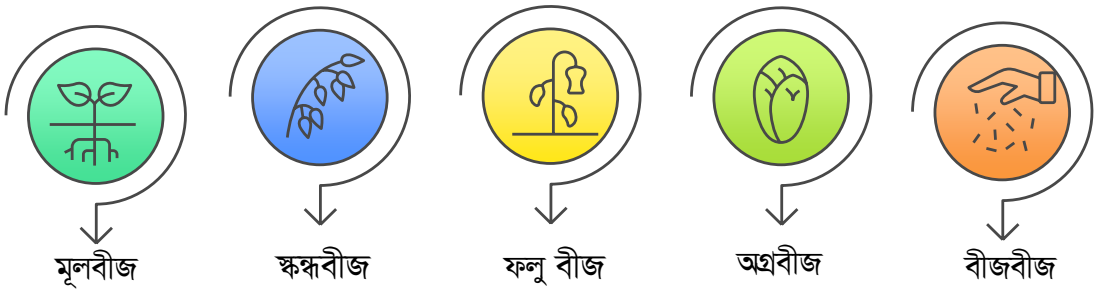

চিত্র ১৫ : পঞ্চবীজ

বুদ্ধ উপকারী বৃক্ষকে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের ভিত্তিতে বিভাজন করে দেখিয়েছেন।[৭৬] যথা :

মূলবীজ
যেগুলো মূল বা শিকর হতে উৎপন্ন হয় সেগুলোকে বলা হয় মূলবীজ। মূলবীজগুলো হলো যথাক্রমে হরিদ্রা, আদা, বচা (এক জাতীয় সুগন্ধ জাতীয় ওষুধি গাছ), অতিবিষ (এক জাতীয় সুগন্ধ জাতীয় ওষুধি গাছ), কূটকরোহিণী উসরী (এক জাতীয় জালি গাছ), ভদ্রমুত্তক ইত্যাদি।
স্কন্ধবীজ
স্কন্ধ বা ডাল হতে যে সমস্ত বীজ অঙ্কুরিত বা উৎপন্ন হয় তাকে বলা হয় স্কন্ধবীজ। স্কন্ধ বীজগুলোর মধ্যে রয়েছে অশ্বত্থ, নিগ্রোধ, পিলক্ষো (এক জাতীয় ডুমুর গাছ), উরুম্বও (এক জাতীয় ডুমুর গাছ), কপিত্থনো (এক জাতীয় বন্য ফল) ইত্যাদি।
ফলু বীজ
পর্ব বা কাণ্ডের গ্রন্থি হতে যে সমস্ত বীজ অঙ্কুরিত বা উৎপন্ন হয় সেগুলোকে ফলুবীজ বলে। ফলু বীজগুলো হলো ইক্ষু, বাঁশ, নল ইত্যাদি।
অগ্রবীজ
অগ্র বা শিকর হতে যে সমস্ত বীজ উৎপন্ন হয় তাকে বলা হয় অগ্রবীজ। অজ্জুক (এক জাতীয় তুলসী গাছ) ও হ্রীবের ইত্যাদি।
বীজবীজ
যেগুলো বীজ হতে উৎপন্ন বা অঙ্কুরিত হয় তাকে বলা হয় বীজবীজ। ধান, গম, মুগ, সরিষা, সীম, বরবটি, ঢেড়স ইত্যাদি।

সারণি : ৮

উপরি-উক্ত আলোচ্য বিষয় থেকে বোঝা যায় যে, প্রাকৃতিক পরিবেশের বনাঞ্চলের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার গুরুত্বপূর্ণ গাছ-পালা-লতা-গুল্মাদি যা কিনা ছেদন কিংবা নষ্ট করা থেকে বুদ্ধের নির্দেশনা ছিল। বনাঞ্চল থেকেই পরিবেশ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। বনজ সম্পদ থাকার কারণেই মানবসমাজ পরিবেশ থেকে বহুবিধ উপায়ে উপকার লাভ করে। বুদ্ধের সবুজায়নকে রক্ষার জন্য যে অনুজ্ঞা প্রদান করেন তার মমার্থ ছিল সুদূর প্রসারি। যেহেতু মানব সমাজের প্রয়োজনের পাশাপাশি সবুজ ঘাস পশু-পাখিদের খাদ্য সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং সকলের উচিত ঘাসকে দূষিত না করা। অর্থাৎ, সবুজকে রক্ষা করা। *'ত্রিপিটক'* -এর অর্ন্তগত *'সুত্ত পিটক'* এ *'দীর্ঘ নিকায়'*- নামক গ্রন্থের *'কূটদন্ত সূত্রে'* দেখা যায় বুদ্ধের নির্দেশনায় রাজ কূটদন্ত কর্তৃক নানাবিধ প্রাণীর জীবন নষ্ট হলো না। যূপকাষ্ঠের জন্য কোনো বৃক্ষকে ছেদন করতে হলো না।[৭৭] তাছাড়া *'দীর্ঘ নিকায়'* গ্রন্থের *'চক্রবর্তী সিংহনাদ সূত্রে'* একজন দায়িত্ববান সুশাসক হওয়ার ক্ষেত্রে রাজার অনেকগুলো গুণাবলীর বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে যার মধ্যে একটি গুণ হলো পশু-পাখিদের হত্যা না করে তাদের রক্ষা করা।[৭৮]

১২. বৃক্ষের মাধ্যমে মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

অঙ্গুত্তর নিকায়ের *'রুক্খ সুত্তে'* অর্থাৎ, 'বৃক্ষ সূত্রে' চার প্রকার বৃক্ষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বৃক্ষের মাধ্যমে বুদ্ধ মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে উপস্থাপন করেন।[৭৯]

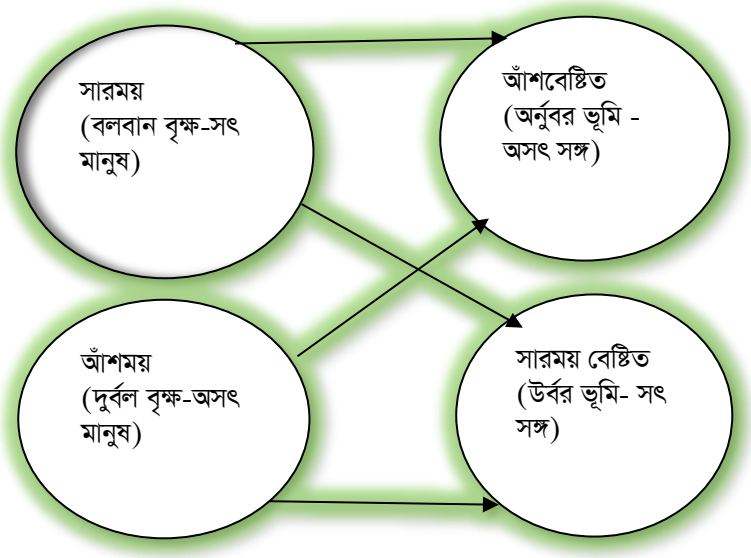

চিত্র ১৬ : মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

উপরি-উক্ত চার রকমের বৃক্ষের সাথে বুদ্ধ চার প্রকার মানবের অস্তিত্বের কথা তুলে ধরেন যা প্রচলিত সমাজব্যবস্থাপনায় পরিলক্ষিত হয়। উর্বরভূমিতে যেমন ফসলাদি ভালো হয়, তেমনিভাবে সৎ মানুষের জীবনও সুন্দর হয়ে উঠে। বুদ্ধ জগতে চার প্রকার পুদ্গল বা ব্যক্তির কথা বলেছেন। তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো[৮০] :

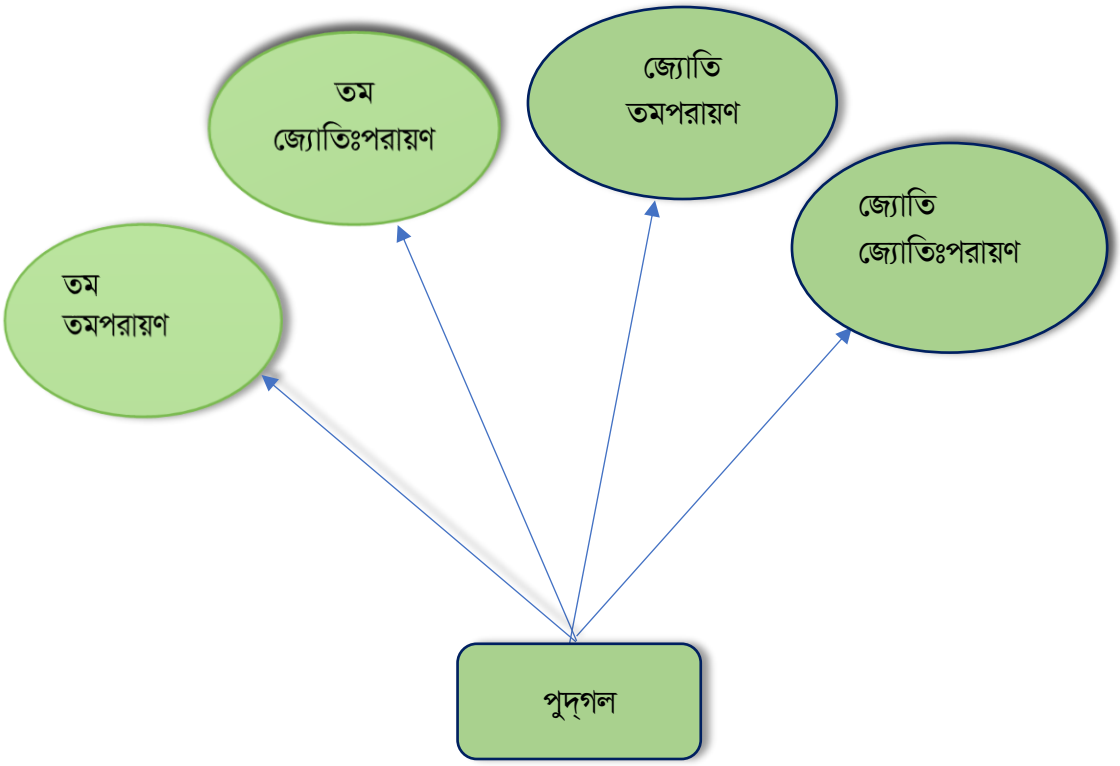

চিত্র ১৭ : পুদ্‌গল বা ব্যক্তির স্বরূপ

১. তম তমপরায়ণ

তম তমপরায়ণ বলতে অন্ধকার থেকে অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যাওয়াকে বোঝায়। সমাজে কিছু ব্যক্তি আছে যারা অজ্ঞানতা, কামনা-বাসনা, হিংসা, লোভ, কায়ে দুশ্চরিত্র আচরণ, বাক্যে দুশ্চরিত্র, মনে দুশ্চরিত্র ইত্যাদি অন্ধকারময় গুণাবলির দ্বারা আচ্ছন্ন। তারা আরও বেশি নেতিবাচকতা, ধ্বংসাত্মক কাজ ও পাপের দিকে আকৃষ্ট হয়। যারা মাদকাসক্তি, হিংসা বা অনৈতিক কাজে লিপ্ত হয় এবং তা থেকে বের হতে চায় না। তারা সমাজের জন্য অশুভকর।

২. তম জ্যোতিঃপরায়ণ

তম জ্যোতিঃপরায়ণ অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এগিয়ে যাওয়া বোঝায়। এই শ্রেণির ব্যক্তিরা আদিতে অন্ধকার বা নেতিবাচকতায় আবদ্ধ থাকলেও ধীরে ধীরে জ্ঞান, ধর্ম ও আধ্যাত্মিক আলোর দিকে ঝুঁকছে। তারা পাপ বা অজ্ঞানতা থেকে মুক্তির পথ খোঁজে। কোনো অপরাধী বা পাপী যখন নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ করে সৎপথে ফিরে আসে। এরা কল্যাণে কাজ করে।

৩. জ্যোতি তমপরায়ণ

আলো থেকে অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যাওয়াই হলো জ্যোতি তমপরায়ণ। সমাজের এই ব্যক্তিদের প্রথম ভালো ও জ্ঞানালোকিত পথে ছিল, কিন্তু পরে মোহ, লোভ বা কুপ্রবৃত্তির কারণে অন্ধকারের দিকে চলে যায়। কোনো নীতি আদর্শসম্পন্ন ব্যক্তি যদি পরে অর্থ বা ক্ষমতার লোভে পড়ে অসৎ হয়ে যায়। এরা সমাজে এমনভাবে অবস্থান করে যে তাদের অন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করার নিরন্তন চেষ্টা করেন।

৪. জ্যোতি জ্যোতিঃপরায়ণ

জ্যোতি জ্যোতিঃপরায়ণ হলো আলোতে আলোর দিকে এগিয়ে যাওয়া। এই ব্যক্তিরা জ্ঞান, ধ্যান, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অবিচল থাকে। মানবমুক্তি ও কল্যাণের কথা চিন্তা করেন। যারা সারাজীবন সত্য ও জ্ঞানের পথে চলেন। বুদ্ধের শিক্ষা অনুযায়ী এটি সর্বোত্তম। এরা সমাজের জন্য আর্শিবাদস্বরূপ। আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

বুদ্ধ কঠোর সাধনার দ্বারা লব্ধ বোধিজ্ঞান অর্জনের পর বিভিন্ন জায়গায় পরিভ্রমণ করে মানব কল্যাণে মানবমুক্তির লক্ষ্যে ধর্মবাণী প্রচার করেন, যা পিটকীয় অনেক গ্রন্থের মধ্যে বর্ণিত আছে। এ সময় তিনি কোলাহল মুক্ত, শান্ত, নির্জন গভীর বনে নির্মিত বিহারে অবস্থান করে ধ্যান-সমাধি এবং সকলকে বহু বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ প্রদান করতেন। কেননা, ধ্যান (Meditation)-এর জন্য বন ও শান্ত পরিবেশ উত্তম। আর এই পরিবেশ কেন্দ্রিক ভাবনার পরিচয় বুদ্ধেও শিক্ষায় লক্ষণীয়। এর ফলস্বরূপ বুদ্ধের সময়েও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপণের প্রবণতা দেখা যায়। বিভিন্ন রাজা ও শ্রেষ্ঠিগণ নানা বিহার ও আবাস নির্মাণ করেছিলেন ছায়াঘেরা নির্জন বন-বনাঞ্চলে। আর এই পর্যায়ে বুদ্ধ যে সমস্ত বিহারে অবস্থান করেন, তার একটি ধারণা উপস্থাপন করা হলো :

বিহারের নাম	অবস্থান	সূত্রের নাম	উৎস
জীবক কৌমারভৃত্যের আম্রবণ	রাজগৃহ	সামঞ্ঞফল সূত্র	রাজগুরু শ্রীমৎ ধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির, *দীর্ঘ নিকায়*, প্রথম খণ্ড (পূর্ব পাকিস্তান: ১৯৬২, রাজানগর, রাঙ্গুনীয়া), পৃ. ৪১
পাবারিকের আম্রবণ	নালন্দা	কেবট্ট সূত্র	*দীর্ঘ নিকায়*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২
অম্বপালির আম্রবণ	বৈশালি	মহাপরিনির্বান সূত্র, দ্বিতীয় অধ্যায়	ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, *দীর্ঘ নিকায়*, দ্বিতীয় খণ্ড (কলিকাতা : ১৯৫৪, মহাবোধি সোসাইটি), পৃ. ৮৬
উপবর্তন মল্লদিগের শালবন	হিরণ্যবতী নদীর অপর পার্শ্বস্থিত	মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পঞ্চম অধ্যায়	*দীর্ঘ নিকায়*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১২৫

	কুশিনারা		
মোরিয়গণের পিপফল বন	পিপফল	মহাপরিনির্বান সূত্র, ষষ্ঠ অধ্যায়	*দীর্ঘ নিকায়*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৫৬
শিংশপা বন	সেতব্যার উত্তরে স্থিত	পায়াসি সূত্র	*দীর্ঘ নিকায়*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৭৯
জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরাম	শ্রাবস্তী	আকাঙ্ক্ষণীয় সূত্র	বেণীমাধব বড়ুয়া অনূদিত, *মধ্যম নিকায়*, প্রথম খণ্ড (তাইওয়ান: সন অনুল্লিখিত, করপর‍্যাট বডি অব দি বুদ্ধ এডুকেশনাল ফাউন্ডেশন), পৃ. ৩৪
জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরাম	শ্রাবস্তী	বনপ্রস্থ সূত্র	*মধ্যম নিকায়*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১১৫
বেণুবনে কলন্দক নিবাপ	রাজগৃহ	রথবিনীত সূত্র	*মধ্যম নিকায়*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৫৯
এক ইষ্টক নির্মিত গৃহে সেই সময় আয়ুষ্মান্ অনুরুদ্ধ, নন্দিয় এবং আয়ুষ্মান কিম্বিল গোশৃঙ্গ শালবন দাব (অরণ্য) অবস্থান করেছিলেন	নাদিক বৃজিরাষ্ট্রে (বৈশালী রাজ্যে) অবস্থিত গ্রাম	ক্ষুদ্র-গোশৃঙ্গ-সূত্র	*মধ্যম নিকায়*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২২৫
গোশৃঙ্গ শালবন দাব (অরণ্য)	বৈশালী	মহাগোশৃঙ্গ-সূত্র	*মধ্যম নিকায়*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৩১
মহাবনে কূটাগারালয়	বৈশালী	মহাসত্যক সূত্র	*মধ্যম নিকায়*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৫৭
ভেসকলাবন মৃগদাব	ভর্গরাজ্য	মারতর্জন সূত্র	*মধ্যম নিকায়*, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৫৪
কোমারভচ্চ জীবকের আম্রবণ	রাজগৃহ	জীবক সূত্র	পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত, *মধ্যম নিকায়*, দ্বিতীয় খণ্ড (কলিকাতা: ১৯৯৪, ধর্মাধার বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশনী), পৃ. ৬৫
পাবারিক শ্রেষ্ঠির আম্রবন	নালন্দায়	উপালী সূত্র	*মধ্যম নিকায়*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩১
আমলকী বন	চাতুমায়	চাতুম সূত্র	*মধ্যম নিকায়*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬৫
নলকপানের পলাশবন	কোশল প্রদেশ	নলকপান সূত্র	*মধ্যম নিকায়*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১০৩
কুরুজঙ্গল		মাগন্দিয় সূত্র	*মধ্যম নিকায়*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৩১

মখাদেব আম্রবণ	মিথিলার	মখাদেব সূত্র	*মধ্যম নিকায়*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২০০
গুন্দাবন	মথুরায়	মধুর সূত্র	*মধ্যম নিকায়*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২০৪
সমীপে বলিহরণ বনখণ্ড	কুশীনগর	কিন্তি সূত্র	বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী অনূদিত, *মধ্যম নিকায়*, তৃতীয় খণ্ড (কলিকাতা: ১৯৯৩), পৃ. ১৭

সারণি : ৯

উপরি -উক্ত আলোচনা প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, নির্মল প্রকৃতি ও পরিবেশকে কেন্দ্র করে বুদ্ধ ধর্ম দেশনার পাশাপাশি চিত্তের প্রসন্নতার ক্ষেত্রে পরিবেশকে অধিক প্রধান্য দিয়েছিলেন। এটি লক্ষণীয় যে মানসিক শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শান্ত পরিবেশ মানসিক স্থিরতা আনয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ফলে চির চঞ্চল মনের চাঞ্চল্যভাব সহজে বিদূরিত হয়ে যায়। নানারকম পাখির কলতান ব্যক্তির ভিতরের সত্ত্বাকে জাগ্রত করে তোলে। আজও মানুষ কর্মব্যস্ত জীবনে ক্ষণিকের প্রশান্তির জন্য বিভিন্ন বনাঞ্চলে ভ্রমণ করতে যায়। যান্ত্রিক কোলাহল থেকে কিছু সময়ের জন্য মনকে পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করে মানসিক শান্তি খুঁজে বেড়ায়। তারজন্য অরণ্যের যথাযথ পরিচর্যা করতে হবে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত বিশ্বের অন্যতম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জীববৈচিত্র্যেও অন্যতম পীঠস্থান সুন্দরবন, মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জে অবস্থিত ১২৫০ হেক্টর আয়তনের লউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, টাঙ্গাইলের মধুপুর জাতীয় উদ্যান কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যা কিনা সেই বৌদ্ধ সাহিত্যের মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। এরমধ্যে *'মধ্যম নিকায়'* গ্রন্থে চারটি অরণ্যে সম্পর্কে একটি অসাধারণ পরিচয় পাওয়া যায়।[৮১] সেগুলো হলো :

চিত্র ১৮ : চারি মহা অরণ্য

১৩. পরিবেশ ও শব্দদূষণ

আধুনিক জীবনের একটি অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে পরিবেশের শব্দদূষণ। এটি মানবজীবনের স্বাস্থ্য এবং সামগ্রিক জীবনযাত্রার মানকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে তোলে। শব্দদূষণ বর্তমান সময়ে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। ফলশ্রুতিতে এর প্রভাবে দিন দিন মানুষের শ্রবণেন্দ্রিয় ছিদ্র হয়ে যাচ্ছে, কানে কম শোনছে ফলে মানসিক চাপ বেড়ে যাচ্ছে। আর এর জন্য মন-মানসিকতা খিটখিটে হয়ে যায়। বুদ্ধ উচ্চ শব্দে গীত-গান-বাজনার শব্দ থেকে বিরত থাকতে বলেছিলেন। তিনি কোলাহলের বিরূদ্ধে ছিলেন।[৮২] *'ত্রিপিটক'* -এর *'মধ্যম নিকায়'* গ্রন্থে বুদ্ধ কোলাহলপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি না করে অবস্থান করার অনুজ্ঞা প্রদান করেছিলেন।[৮৩] বিশুদ্ধ নির্মল বায়ু সুস্থ জীবনের জন্য অন্যতম উপাদান। যেহেতু বায়ু থেকেই প্রতিনিয়ত শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করা হয়। নির্মল বাতাসে ব্যক্তির মন শান্ত, শীতল, স্নিগ্ধ আনন্দিত হয়। অপর দিকে আবার দুর্গন্ধযুক্ত বাতাসে মন খারাপ, নিরান্দময় ও বিষাদগ্রস্ত হয়। বুদ্ধ শতত নির্মল ও বিশুদ্ধ বায়ু সর্বদা পছন্দ করতেন। গৃহত্যাগের পর বুদ্ধ উরুবেলায় উপস্থিত হোন। তিনি নৈরঞ্জনা নদীর সুরম্য তীর এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখে আনন্দলাভ করেন। তারপর তিনি নৈরঞ্জনা নদীর তীরকে সমাধি অর্জনের জন্য খুবই উপযুক্ত মনে করেন। উক্ত স্থানটির ভূয়সী প্রশংসা করে বুদ্ধ বলেছেন : এই স্থান অতীব মনোরম এবং মনোময়। নদীর তীরাঞ্চল সমুজ্জ্বল এবং মনোরম। নদীর স্বচ্ছ জলধারা কলকল শব্দে প্রবাহিত। আর পাখির চির-চেনা ডাক অঞ্চলকে করে তোলে মুখরিত। নদীর তীরের পাশে ছিল গ্রাম, যেখানে ভিক্ষান্ন লাভ করা সহজ। এজন্য স্থানটি ধ্যান-সমাধির জন্য উপযুক্ত বলে তিনি মনে করেন।[৮৪] বুদ্ধ বিভিন্ন সময় বিচরণের সময় বিভিন্ন বন, জঙ্গল, পাহাড়. পর্বতসহ সুরম্য নদীর তীরে এবং পুকুরের সমীপবর্তী স্থানে অবস্থান করতেন। এমনকি তিনি যে বিহারে অবস্থান করতেন ওই বিহার এলাকায় থাকতো নানা প্রজাতির গাছপালা, পশু, পাখিসহ বহু জীবজন্তু।

১৪. পরিবেশ সংরক্ষণে সম্রাট অশোকের ভূমিকা

জীববৈচিত্র্য রক্ষা, বনভূমি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা, এবং সমাজ জীবনযাত্রার মান-উন্নয়নের জন্য বর্তমান সময়েও পরিবেশবাদীরা বনাঞ্চল সৃষ্টি ও নানা উপায়ে তা রক্ষায় ব্যবস্থাগ্রহণের উপর খুবই জোর প্রদান করেন। পরিবেশ ও প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার চিন্তা-চেতনা কিংবা ধ্যান-ধারণা বুদ্ধের সময়েও যেমন ছিল, তেমনভাবে পরবর্তী বিভিন্ন বৌদ্ধ রাজণ্যবর্গের মধ্যে তা লক্ষ করা যায়। এখানে উল্লেখ্য বৌদ্ধ দর্শনে অনুগত্য মহান সম্রাট অশোক বনাঞ্চল সংরক্ষণের উপর খুবই গুরুত্বারোপ করেছিলেন। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান কিংবা তথ্য-প্রযুক্তিময় বিশ্ব প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য যথাযথ ভাবে সংরক্ষণে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন রকম সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। অথচ খ্রি. পূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোক পরিবেশ সংরক্ষণ কিংবা জীববৈচিত্র্য রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নিবির ও গভীরভাবে উপলব্ধি করে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ প্রদান করেন।[৮৫] সেই সময় ছিল এতদঞ্চলে পরিবেশ সংরক্ষণের স্বর্ণযুগ। সম্রাট অশোক মানুষ ও পশুদের ছায়া

প্রদান করার জন্য রাস্তার দুই পাশে বটবৃক্ষ এবং আমগাছের বাটিকা রোপণ করিয়েছিলেন।[৮৬] যেখানে মানুষ এবং পশুর উপযোগী কোনো ভৈষজ ছিল না, সেখানে তিনি তরু-লতা-গুল্ম রোপণ করান। আবার যেখানে কোনো ফলমূল ছিল না, সেখানে তিনি তা বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করে রোপণ করান।[৮৭] সম্রাট অশোকের কন্যা সংঘমিত্রা সিংহলে (শ্রীলঙ্কায়) বোধিবৃক্ষের একটি শাখা নিয়ে যান, যা সিংহল রাজ তিষ্য মহাসমারোহে অনুরাধাপুরে রোপণ করেন।[৮৮] সম্রাট মানুষ ও পশুদের বিশ্রামের জন্যে বিশ্রামাগার নির্মাণ করেন। তাছাড়া তিনি পাশাপাশি তাদের চিকিৎসা-সেবা প্রদান করারও ব্যবস্থা করেন।[৮৯] সম্রাট অশোক বছরের নির্দিষ্ট দিনে মাছ ধরাও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং হাতীর জন্য অভয়ারণ্যেরও ব্যবস্থা করেন।[৯০] পরিবেশকে সংক্ষরণ করার ক্ষেত্রে তিনি খুবই যত্নবান ছিলেন। তিনি তাঁর এক অনুশাসনে বনাঞ্চলকে নষ্ট কিংবা পোড়ানো যাবে না বলে এক বিধি-বিধান বা নিয়ম-প্রণালী প্রবর্তন করেন। আগেই বলেছি, বুদ্ধ বৃক্ষকে এক ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট প্রাণী বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বুদ্ধের শিক্ষায় উজ্জীবিত হয়ে মানুষের পাশাপাশি পরিবেশকে আপন করে নিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের বহু ব্যবস্থাও তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করেন। পরিবেশ সংরক্ষণ বা জীব-বৈচিত্র্যময়তা বৃদ্ধিকরণে মহামতি সম্রাট অশোকের প্রাণী সংরক্ষণ পদ্ধতি খুবই প্রশংসার দাবীদার। তিনি যে সমস্ত প্রাণী সংরক্ষণের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করেন তার একটি তালিকা[৯১] নিম্নে উপস্থাপন করা হলো। যথা :

Parrots (শুকজাতীয় পাখি)	Nandimukhas (জলচর একপ্রকার পাখি)	River tortoise (নদীর বিভিন্ন প্রজাতির কচ্ছপ
Starlings (এক জাতীয় পাখি)	Bats-Queen (রানি পিপীলিকা)	Procupine (গণ্ডার)
Adjutants (হাড়গিলা পাখি)	Female tortoise (মা - কচ্ছপ)	Tree squirrels (কাঠবিড়ালী)
Brahmany ducks (একপ্রকার হাঁস)	Boneless fish (চিংড়িজাতীয় মাছ)	Barahsingha stags (একপ্রকার হরিণ)
Geeses (রাজহাঁস)	Vedaveyakas (একপ্রকার মাছ),	Brahmany bulls (একপ্রকার ষাঁড়)
Skate (সামুদ্রিক বৃহদাকার মাছ)	Gangapuputakas (একধরনের মাছ)	Monkeys (বিভিন্ন প্রজাতির বানর)
Rhinoceros (গণ্ডার)	Grey doves (শ্বেত কপোত)	Pigeons (বিভিন্ন প্রজাতির পায়রা
All four-footed animals (সকল প্রকার চতুষ্পদী প্রাণী)		

সারণি : ১০

বুদ্ধের জীবদ্দশায় শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক, বিশাখা, রাজা বিম্বিসার, রাজা প্রসেনজিৎ প্রমুখ বুদ্ধকে তাঁর মহান ভিক্ষু-সঙ্ঘের জন্য বিহারনির্মাণ করে দান করেন। এই বিহার শুধু বিহার নয়, এখানে আছে সভার স্থান, প্রার্থনা করার

স্থান, চক্রমণ করার জন্য নির্দিষ্ট জায়গা, পুকুর, পানীয় জলের কূপ। অধিকন্তু বিহারের চারপাশে নানারকম গাছপালা ছিল। প্রার্থনাস্থলের সামনে বৈচিত্র্যময় নানা প্রজাতির ফুলের গাছ রোপণ করার প্রবণতা সেই সময়ও লক্ষ্য করা যায়।[৯২]

১৫. পরিবেশ ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা

পর্যটন ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে থাইল্যান্ড/শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধ ইকো-ট্যুরিজম প্রকৃতির সৌন্দর্য রক্ষা করে বার্ষিক বিলিয়ন ডলার আয় করে। আজও থেরবাদী (শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড) ও মহাযানী (চীন, জাপান) বৌদ্ধ সম্প্রদায় বর্ষাবাস পালন করে। এটি বৌদ্ধ সংঘের শৃঙ্খলা ও আধ্যাত্মিক সাধনার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। থাইল্যান্ড-এর বৌদ্ধ ভিক্ষুরা প্রকৃতি ও পরিবেশকে সংরক্ষণ করার জন্য বনের ভিতরে ধ্যান সাধনা করেন। এ বিষয়ে Daniel H. Henning বলেন: 'Buddhist forest Monks in Thailand, with their strong concerns for nature and all living beings, are the strongest voices for protection of tropical forests in these areas'.[৯৩]

বর্ষাবাস প্রকৃতি-প্রেম, শৃঙ্খলা ও আত্মানুসন্ধানের মূর্ত প্রতীক। এটি বুদ্ধের প্রকৃতিবাদী ও মানবিক দর্শনেরই স্বাক্ষর বহন করে। আধুনিক যুগে পরিবেশ বিপর্যয় ও জলবায়ু পরিবর্তন যখন বিশ্বব্যাপী হুমকি, তখন বর্ষাবাসের দর্শন আরও বেশি প্রাসঙ্গিক। টেকসই জীবনযাপন বর্ষাবাস ভোগবাদিতা হ্রাস করে সাধারণ ও সংযত জীবন-যাপনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে। জীববৈচিত্র্য বা প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় সহায়ক। প্রকৃতি-ভিত্তিক ধর্মচর্চা থাইল্যান্ড, মিয়ানমার ও শ্রীলঙ্কায় আজও ভিক্ষুরা অরণ্য বা পাহাড়ে বর্ষাবাস কাটান, যা ইকো-ধর্ম চর্চার আদর্শ উদাহরণ। বুদ্ধের বিনয়ে বর্ষাবাসের অগ্রাধিকার প্রমাণ করে যে, ধর্ম ও পরিবেশ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আজকের বিশ্বে, যেখানে প্রকৃতির শোষণ চলছে, সেখানে বর্ষাবাসের এই দর্শন টেকসই উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণের পথ দেখাতে পারে। যে প্রকৃতিকে শ্রদ্ধা করে, সে নিজেকেই শ্রদ্ধা করে। গৌতম বুদ্ধের দর্শনের সারমর্ম এই যে বর্ষাবাসের মাধ্যমে বুদ্ধ শিখিয়েছেন প্রকৃতির সেবাই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। বুদ্ধের প্রবর্তিত বর্ষাবাস বা বর্ষাব্রত কেবল একটি ধর্মীয় রীতি নয় এটি প্রকৃতি সংরক্ষণ, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং আধ্যাত্মিক উন্নয়নের এক অনন্য সমন্বয়। এই প্রথা বৌদ্ধ দর্শনের গভীর পরিবেশ-সচেতনতা এবং সামষ্টিক কল্যাণের প্রতিফলন ঘটায়। তাই সকলের উচিত পরিবেশকে সংরক্ষণ করা। এ বিষয় ভিয়েতনামের প্রসিদ্ধ গবেষক Nhat, P. C.- কে উদ্ধৃতি করছি : 'On a personal, local, national and global level environmental protection is needed for the good of every species and organism present on this planet.' The Role of Buddhism in Environmental Protection and Sustainable Development in Vietnam Today'.[৯৪] COVID-19 ও শ্বাসযন্ত্রের রোগ থুথুর মাধ্যমে করোনা ভাইরাস ছড়ায়।[৯৫] বুদ্ধের শিক্ষা-দর্শনে বর্ণিত নির্দেশনার মধ্যে থুথু মাটিতে পুঁতে ফেলার নির্দেশ আজও খুবই প্রাসঙ্গিক। বুদ্ধের ২,৫৬৯ বছরের পুরানো এই শিক্ষা আজ জলবায়ু সংকট, মহামারি ও সামাজিক অসমতার যুগে একটি টেকসই রোডম্যাপ প্রদান করে। এটি শুধু ধর্মীয় অনুশাসন নয় এটি একটি বৈজ্ঞানিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মডেল যা

ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রয়োগযোগ্য। প্রকৃতির সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থানই টেকসই ভবিষ্যৎ গড়ার মূল চাবিকাঠি।

১৬. টেকসই পরিবেশ সংরক্ষণে করণীয়

টেকসই পরিবেশ সংরক্ষণে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র সর্বোপরি সাধারণ মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার একান্ত প্রয়োজন। পরিবেশ সংরক্ষণে বৌদ্ধদর্শন ও সংস্কৃতি টেকসই সমাজ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বুদ্ধের শিক্ষাকে ধারণ ও পরিপালন করে এখনও ভিয়েতনামে পরিবেশ সংরক্ষণ করে চলেছে। এ বিষয়ে Pham Cong Nhat বলেন: 'Studying philosophical ideas about environmental protection and sustainable development in Buddhist philosophy is of great importance not only in theory but also in practice, especially in enhancing the role of Buddhism in the career of environmental protection and sustainable development in Vietnam today'.[৯৬]

টেকসই পরিবেশ সংরক্ষণে অহিংসা মনোভাব প্রদর্শন, বন্য প্রাণী সংরক্ষণ রাসায়নিকমুক্ত কৃষি চর্চা, জলাশয় সংরক্ষণ, সৌরশক্তির ব্যবহার। তাছাড়া বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় দিবসে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি পালন করা। এমতাবস্থায় প্রযুক্তি ও ঐতিহ্যের সমন্বয় সাধন করা আবশ্যক। তাছাড়া নির্দিষ্ট স্থানে পরিবেশবান্ধব ডাস্টবিন ব্যবহার করা। নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা আবর্জনা ফেলে পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করা।

চিত্র ১৯ : পরিবেশ বান্ধব ডাস্টবিন

উপরি-উক্ত চিত্রে পরিবেশ সংরক্ষণে প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থা দেখা যাচ্ছে। পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বৌদ্ধধর্মের মৌলিক নীতিগুলো টেকসই পরিবেশ সংরক্ষণের সাথে ওতোপ্রেতভাবে জড়িত। সর্বস্তরে এই নীতিগুলো একটি ভারসাম্য পরিবেশ গড়ে তুলতে খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

১৭. পরিবেশ সংকট থেকে উত্তরণে বুদ্ধের শিক্ষা দর্শনের উৎস বিশ্লেষণ

মানুষের এই বর্তমান পৃথিবীতে প্রাকৃতিক সম্পদ বা বন ধ্বংস পরিবেশদূষণ, জীববৈচিত্র্য হ্রাস-এর মতো বহুমাত্রিক সংকট মোকাবেলায় বুদ্ধের শিক্ষা ও নীতিগুলো খুবই প্রাসঙ্গিক। মানুষ স্বভাবত লোভ, দ্বেষ বা হিংসা এবং মোহ বা অজ্ঞানতা দ্বারা প্রভাবিত। লোভ, দ্বেষ বা হিংসা এবং মোহ বা অজ্ঞানতা শুধু মানসিক দুঃখ সৃষ্টি করে না বরঞ্চ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে। এখানে লোভ প্রাকৃতিক সম্পদের অধিক শোষন করে। দ্বেষ বা হিংসা প্রাণীকুল ও বনাঞ্চল উজার করে। মোহ বা অজ্ঞানতা প্রকৃতির সাথে আন্তঃনির্ভরশীলতা বুঝতে দেয় না। লোভ, দ্বেষ বা হিংসা এবং মোহ বা অজ্ঞানতা ব্যক্তিকে অন্ধ করে রাখে। ভালো-মন্দ বুঝতে দেয় না। এ বিষয়ে উক্ত হয়েছে :

> 'The gravity of greed, and hatred is also perpetuated by egoistic visions and opinions (*ditthi*) which creates the problem more difficult to solve.[৯৭]

বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত Payutto, P. A. তাঁর *Buddhist solutions* গ্রন্থে এ বিষয়ে বলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান অগ্রগতির মাধ্যমে যাপিত জীবনের মানুষের চাহিদা ও লোভের সমস্যাগুলোর খুব কমই সমাধান করা সম্ভব। কারণ বিজ্ঞান মানুষের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা খুব কম।[৯৮] মানুষের এই আচরণ কখনো পরিবর্তন করা সম্ভবপর নয় বলে P. A. Payutto, জানান[৯৯]। এখানে বুদ্ধের শিক্ষা বেশ জোড়ালো ভূমিকা রাখতে পারে। বৌদ্ধিক দৃষ্টি থেকে বলা যায় পরিবেশ সংরক্ষণে ৫টি ধারা বিশেষ ভাবে অনুসরণযোগ্য। যা পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুতপূর্ণ্ব অবদান রাখতে পারে। মানুষ সচেতনভাবে কিছু ভাবনা করলে বা চাইলে তা থেকে সফলতা আসবে। সচেতন চিন্তা, জাগ্রত ভাবনা ব্যক্তিতে তার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই বিষয় যদি হয় পরিবেশ রক্ষায় তাহলে আরো বেশি সচেতন হতে হবে। কেননা পরিবেশ বিরূপ হলে তার প্রভাব সবাইকে ভোগ করতে হয়। কেই যদি পরিবেশ ধ্বংসের কাজ করে তবে সে এককভাবে তা ভোগ করবে না বরং সবাইকে ভোগ করতে হয়। বর্তমান সময়ে পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে তা কিন্তু একটি সমাজের সবাইকে সমানভাবে ভোগ করতে হচ্ছে। ঠিক তেমনি পরিবেশ যথাযথ রক্ষিত হলে এর সুফলও সবাই পাবে। সর্বোপরি পরিবেশকে কেন্দ্র করে ব্যক্তি সমাজে সুস্থ, সুন্দর, পরিশীলিত জীবন যাপন করতে পারে। আর তাই পরিবেশ সংরক্ষণে একটি সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করা হলো বৌদ্ধধর্মের চারটি মূলবিষয়কে ভিত্তি করে। এ সম্পর্কে চিত্রের মাধ্যমে একটি ধারণা নিচে প্রদান করা হলো।

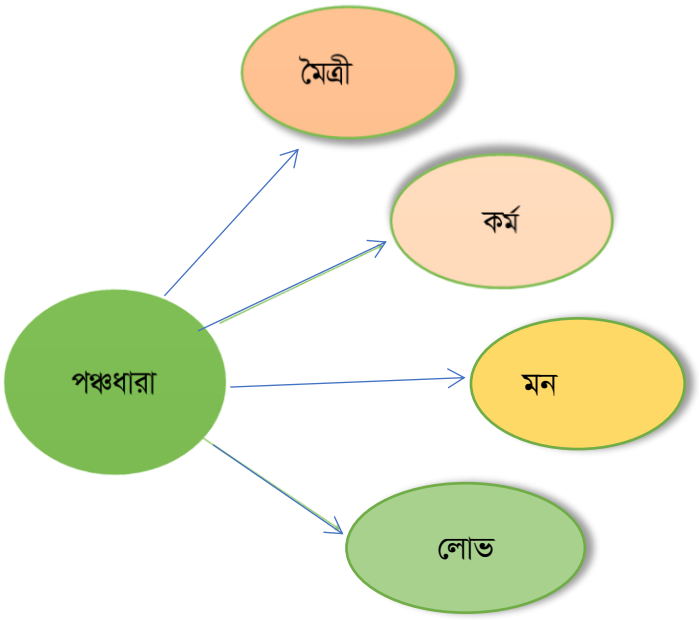

চিত্র ২০ : পরিবেশ সংরক্ষেণের ধারা

১৭.১. মৈত্রী

'অহিংসা' শব্দটি গভীর অর্থবোধক একটি শব্দ। অর্থাৎ, কায়-বাক্য-মনে পরপীড়া বর্জন, কারও অনিষ্ট না করা, মানবতা, করুণা, কোমলতা, দয়া ইত্যাদি। বুদ্ধের শিক্ষা-দর্শনের মূলমন্ত্র 'অহিংসা' যাকে বিশ্বমৈত্রীও বলা হয়। মৈত্রীর প্রকৃত প্রতিশব্দসমূহ হলো পরোপকারিতা, শুভেচ্ছা, সৌহার্দ্য, হিতচিন্তা, হিতাকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি গুণযুক্ত শব্দ। মৈত্রীর প্রতি বিপরীত শব্দগুলো হলো-লোভ-দ্বেষ-মোহ এবং ক্রোধ এবং অশুভ চিন্তা-চেতনা । অন্যভাবে বললে বলা যায়, মৈত্রী অর্থাৎ, মিত্রতা বা বন্ধুত্ব যেখানে প্রেম বা ভালোবাসার স্পর্শ বা নির্মল প্রেম থাকে। এটি এমন একটি মহৌষধ যার মাধ্যমে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা প্রভৃতি জয় করা যায়। ইংরেজিতে মৈত্রীকে Loving-kindness বলা হয়। K. sri Dhammananda এ বিষয়ে বলেন :

> 'Metta or Loving-kindness is the most effective way to continue purify of mind to purity the mentally unclean atmosphere.'[১০০]

এই মৈত্রী সম্পর্কে আরো উল্লেখ রয়েছে :

> 'Metta is not a superman's love- it is the very normal aptitude to just be sympathetic not dwells in hatred towards something or someone.'[101]

মৈত্রীর লক্ষণ হলো নিঃস্বার্থ পরোপকার আর মিত্রতা। এটির দয়ালু ভাব প্রদর্শন করা মৈত্রীর স্বভাব বলা হয়। দেশ ও কালের সীমারেখার উর্দ্ধে এটির অবস্থান। সকলের প্রতি সমভাবে আচরণ প্রদর্শণ করাই হলো মৈত্রী।

বুদ্ধের মৈত্রী সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা-দর্শন হলো :

যে কেচি পাণভুতত্থি তসা বা থাবরা বা অনবসেসা
দীঘা বা যেব মহন্তা বা মজ্ঝিমরস্সকা অনুকথুলা।
দিট্ঠা বা যেব অদি্টঠা যে ব দূরে বসন্তি অবিদূরে
ভূতা সম্ভবেসী বা সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা।[১০২]

অর্থাৎ, যে সকল প্রাণী ভীত বা অভীত, ছোটো, মাঝারি, বড়, মধ্যম, সুক্ষ্ম বা স্থুল, দৃশ্য ও অদৃশ্য, যারা দূরে-নিকটে, জন্মেছে বা জন্ম নিবে তারা সকলেই সুখী হোক।

'মৈত্রী' শুধুমাত্র মানুষ নয়, প্রকৃতি ও পরিবেশের জন্য প্রযোজ্য। বুদ্ধের এই মৈত্রীতে সকল প্রাণী সুখী হবার কথা রয়েছে। এই মৈত্রীতে সকল প্রাণীর প্রতি অকৃত্রিম বন্ধুত্বের কথা পরিলক্ষিত হয়। কেননা, মৈত্রী হলো এমন এক প্রকার বীজ যেখান থেকে পরিবেশ সংরক্ষণের দৃঢ়তার জন্ম নেয়। সুতরাং প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণেও মৈত্রীর প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং প্রকৃতি ও পরিবেশকে রক্ষা করা সকলের দায়িত্ব। পরিবেশ সংরক্ষণে বুদ্ধের মৈত্রী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বুদ্ধের দৃষ্টিতে প্রাণী ভীত বা অভীত, ছোটো, মাঝারি, বড়, মধ্যম, সুক্ষ্ম বা স্থুল, দৃশ্য ও অদৃশ্য সবাইকে সংরক্ষণ করতে হবে। এর মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ হয়। বুদ্ধ বলেন :

মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং, মানসং ভাবযে অপরিমাণং।
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।[১০৩]

অর্থাৎ, জগতে সকল দিকে উপরে, নীচে, পার্শ্বে চারিদিকে যে সকল প্রাণী সমূহ আছে, তারা বাঁধাহীন ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী অর্থাৎ, শত্রুতা বর্জিত হোক। স্বীয় চিত্তে সর্বদা প্রাণীর প্রতি অপরিমেয় মৈত্রীভাব প্রদর্শন করবে।

বুদ্ধের উপরি-উক্ত উপদেশটি প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণে বেশ প্রভাব রাখবে এমনটিই আশা করা যায়। মানুষ এখন প্রতিনিয়ত কারণে-অকারণে, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে প্রকৃতি ও পরিবেশকে ধ্বংস করে চলেছে। পরিবেশ সংরক্ষণে ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণের জোড়ালো ভূমিকা আবশ্যক। আধ্যাত্মিক বৌদ্ধধর্মীয় গুরু দালাই লামা- পরিবেশ সংরক্ষণ উপলক্ষ্যে ২০২০ সালের ২২ এপ্রিল একটি শুভেচ্ছা বার্তা প্রদান করেন। এই শুভেচ্ছা বার্তায় তিনি পরিবেশকে মায়ের সাথে তুলে ধরেছেন। এখানে তিনি বলেন :

> 'The earth is our only home acts like another to us all, as her children we are dependent on her. So that, protect her with the same love you would give your mother.'[104]

১৭.২. কর্ম

কর্ম মানুষকে মহান করে তুলে যেমন করে তেমনি আবার বিবেকবর্জিত অমানুষও করে তোলে। এখানে কর্ম বলতে ব্যক্তির আচরণকে বোঝানো হয়। এই ক্ষেত্রে বুদ্ধ প্রদর্শিত পঞ্চশীল[১০৫] (প্রাণী হত্যা না করা, চুরি না করা, মিথ্যা না বলা, কামাচারে লিপ্ত না হওয়া, মাদক বর্জন) ব্যাপক প্রভাব রাখতে পারে। পরিবেশকে নষ্ট করলে ব্যক্তিকে চরম দুঃখ-কষ্ট পেতে হয়। তাই দুঃখ থেকে মুক্তি জন্য বুদ্ধ কুশল কর্ম সম্পাদন করার উপদেশ দিয়েছেন।[১০৬] বৌদ্ধধর্মে কর্মের তিনটি পর্যায়ের উল্লেখ রয়েছে।[১০৭] এই সম্পর্কে একটি ধারণা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

কায়িক স্তর	
কুশল কর্ম	অকুশল কর্ম
অহিংসা পোষণ করা	হিংসা পোষ করা
অপরের দ্রব্য গ্রহণ না করা	অপরের দ্রব্য গ্রহণ করা
মিথ্যা কামাচার বা ব্যভিচার না করা	মিথ্যা কামাচার বা ব্যভিচার করা

বাচনিক স্তর	
কুশল কর্ম	অকুশল কর্ম
মিথ্যা কথা না বলা	মিথ্যা কথা বলা
কর্কশ কথা না বলা	কর্কশ কথা বলা
কটু কথা না বলা	কটু কথা বলা
তুচ্ছ বা নিরর্থক কথা বা আলাপ-আলোচনা না করা	তুচ্ছ বা নিরর্থক কথা বা আলাপ-আলোচনা করা

মানসিক স্তর	
কুশল কর্ম	অকুশল কর্ম
অপরের সম্পদ বা সম্পত্তিতে লোভ না করা	অপরের সম্পদ বা সম্পত্তিতে লোভ করা
অপরের প্রতি হিংসাত্মক মনোভাব না দেখানো	অপরের প্রতি হিংসাত্মক মনোভাব দেখানো
ভুল বা ভ্রান্ত ধারণা থেকে নিজেকে সংযত রাখা	ভুল বা ভ্রান্ত ধারণা থেকে নিজেকে সংযত না রাখা

সারণি : ১১

নিম্নে একটি শরীরের সাথে এই কায়িক, বাচনিক এবং মানসিক স্তরে সম্পাদিত কুশল এবং অকুশল কর্মের একটি চিত্র সর্বসাধারণের জন্য তুলে ধরা হলো।

চিত্র ২১ : দশবিধ কুশল ও অকুশল

Source : https://www.namchak.org/community/blog/ten-virtues-and-non-virtues/

উপরি-উক্ত কায়িক স্তরের কর্মে দেহ দ্বারা সম্পাদিত কর্ম বোঝায়। এর মাধ্যমে গাছ-গাছালি যেমন রোপন করা যায় তেমনি আবার কাটাও যায়। এমন কি বন একেবারে উজাড় করে দেওয়া যায়। আর বাচনিক স্তরের কর্মে কথার মাধ্যমে ব্যক্তির আচার-আচরণের প্রভাব জানা যায়। এখানে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানে অধিকর্তা প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ করতে যেমন পারে তেমনি আবার এ বিষয়ে অস্বীকারও করতে পারে। আর মানসিক স্তরের কর্মে ব্যক্তি বা সমষ্টির চিন্তা-ধারণার অভিপ্রায় প্রকাশ পায়। এই স্তরে প্রকৃতির প্রতি মানুষের মৈত্রী বা করুণা যেমন প্রর্দশন করতে পারে তেমনি আবার পরিবেশ সংরক্ষণে উদাসীনভাব প্রদর্শন করতে পারে। পরিবেশ ব্যক্তিকে সর্বক্ষেত্রে রক্ষা করে। সুতরাং সকলের দায়িত্ব পরিবেশকে রক্ষা করা। কর্ম করলে ফল অবশ্যম্ভাবী যা বুদ্ধের শিক্ষা-দর্শনে উল্লেখ রয়েছে। পরিবেশ নষ্ট করলে তার ফল প্রত্যেককে ভোগ করতে হবে। পরিবেশ সংরক্ষণ করলে এক রকমের ফল আর না করলে এক রকমের ফল। এ বিষয়ে জানা পরও মানুষ পরিবেশ ধ্বংস করে। কর্মকে মানুষের প্রকৃত পরিচয় বলা হয়। কর্মের মধ্য দিয়ে আচরণ পরিবর্তন করলেই নিঃসন্দেহে পৃথিবী বদলে যাবে। তাই বুদ্ধ প্রদর্শিত কায়, বাক্য এবং মনে সংযত হওয়া আবশ্যক।[১০৮] বুদ্ধ আরও বলেন যারা কায় দ্বারা অকুশল কর্ম বা দুষ্কর্ম সম্পাদন, বাক্য দ্বারা দুর্বাক্য সম্পাদন এবং মনের দ্বারা দুশ্চিন্তা করলে পাপ সৃষ্টি হয়। এখানে দেখা যায় কায়-বাক্য এবং মনে খারাপ কাজ করলে তার ফল সবাইকে ভোগ করতে হয়।[১০৯] তাই বুদ্ধের শিক্ষা সতত সুন্দর পুত-পবিত্র বিশুদ্ধ জীবনযাপনে উৎসাহী করে তোলে। এ বিষয়ে তিনি বলেন :

অকতং দুক্কতং সেয্যো পচ্ছা তপতি দুক্কতং
কতঞ্চ সুকতং সেয্যো যংকত্বা নানু তপ্পতি।[১১০]

অর্থাৎ, অকুশল কর্ম বা দুষ্কর্ম পরিণামে অনুতপ্ত করে। এমতাবস্থায় কোনো রকম অপকর্ম না করাই উত্তম। যে কাজ সম্পাদন করে পরিশেষে অনুতাপ বা অনুমোচনা করতে হয় সেরূপ না করাই উত্তম।

১৭.৩. মন

মন এবং কর্ম একে অপরে পরিপূরক। কেননা মনের মাধ্যমে সকল কর্ম সম্পন্ন করা হয়। সচরাচর কর্ম বলতে কোনো কিছু সম্পাদন করাকে বুঝি। তবে বৌদ্ধ দৃষ্টিকোণে কুশলাকুশল প্রবৃত্তিকেই কর্ম বলা হয়। বুদ্ধ কর্মকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি চেতনাকেই কর্ম বলে অভিহিত করেন। কেননা, চেতনার মাধ্যমে সকল সত্ত্বা কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা কর্ম সম্পাদিত করে। সুতরাং কর্ম নিজের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। 'চেতনা' হং ভিক্খবে কম্মং বদামি। চেতয়িত্বা কম্মং করোতি কাযেন বাচা মনসা'পি।[১১১] সুতরাং স্বেচ্ছা প্রণোদিত কর্মই বুদ্ধ মতে কর্ম। কর্মফলের স্বরূপ সম্পর্কে *'অঙ্গুত্তর নিকায়'* গ্রন্থে উক্ত হয়েছে : "কর্মই জীবের সব। কর্মই উত্তরাধিকারী। কর্মই পুনর্জন্মের কারণ। কর্মই বন্ধু ও কর্মই আশ্রয়। কুশল-অকুশল কর্ম যেরূপ কর্মই সম্পাদিত করুক না কেন তাকে ফল ভোগ করতে হবে।[১১২] *'খুদ্দক নিকায়'* গ্রন্থেও অন্তর্গত *'সুত্তনিপাত'* গ্রন্থে কারও কর্ম কখনো বিনাশ হয় না। কর্তার সাথে তার যোগসূত্র থাকবেই।[১১৩] এ বিষয়ে বুদ্ধ আরও বলেন : 'কর্মের মাধ্যমে পৃথিবীর প্রবর্তন, কর্মে মাধ্যমেই সকল সত্ত্বার সৃষ্টি। রথের চাকার ন্যায় সকলেই কর্মেই আবদ্ধ'।[১১৪]

মনই সকল কর্মের উৎপত্তিস্থল। বুদ্ধ কর্মকে দুইভাগে ভাগ করে দেখিয়েছেন। যথা : ক. হ্যাঁ বোধক সদর্থক এবং খ, না বোধক । এ বিষয়ে *'ধর্মপদ'* গ্রন্থ থেকে দুটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি।

"মনোপুব্বংগমা ধম্মা মনোসেট্ঠা মনোময়া
মনসা চে পদুটঠেন ভাসতি বা করোতি বা
ততো নং দুক্খমন্বেতি চক্কং'ব বহতো পদং।[১১৫]

অর্থাৎ, ধর্মসমূহের মধ্যে মন পূর্বগামী। মনই শ্রেষ্ঠ এবং ইহা মনোময়। যদি কেউ খারাপ মনে কোনো কথা বলে বা কাজ সম্পাদন করে তবে শকটবাহী বলদের চক্রের ন্যায় দুঃখ তাকে অনুসরণ করে।

আরও উল্লেখ রয়েছে :

মনোপুব্বংগমা ধম্মা মনোসেট্ঠা মনোময়া
মনসা চে পসন্নেন ভাসতি বা করোতি বা
তনো নং সুখমন্বোতি ছাযাব অনপাযিনী।[১১৬]

আবার ধর্মসমূহের মন পূর্বগামী। মন শ্রেষ্ঠ এবং মনোময়। যদি কেহ বিশুদ্ধ মনে কোনো কথা বলে বা কাজ সম্পাাদন করে তবে মানব ছায়ার ন্যায় সুখ তাকে অনুসরণ করে।

মনই সকল কর্মের অগ্রদূত। পরিবেশ নষ্টও এই মনের মাধ্যমে হয়। লোভী মনই পরিবেশ বন-গাছ-পালা ও নদ-নদী নষ্ট করে। মনের দ্বারা পরিবেশ নষ্ট করে প্রকৃতিকে মানুষ অসন্তুষ্ট করে তোলে। প্রকৃতি মাতা-পিতার মতো। তাই তাদের প্রতি মায়া-মমত্ব থাকতে হবে। মাতা-পিতাকে যেমন আঘাত বা হত্যা করতে পারি না তেমনি প্রকৃতি-পরিবেশকেও আঘাত করে কেউ কখনো সুখী হতে পারেনি এবং পারবেও না। পরিবেশ সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব কমাতে মানুষের মনই যথেষ্ট। এই ক্ষেত্রে Kongsak Thathong কে-এর মন্তব্যটি খুবই প্রাসঙ্গিক ও যুক্তিযুক্ত। তিনি বলেন :

> 'The notion of doing moral deeds and living in harmony with all other living things on earth needs to be reintroduced into people's minds in order to lessen the negative effects of environmental destruction'.[১১৭]

১৭.৪. লোভ

লোভ মারাত্মক ক্ষতি করে। নিজের বিপদ এবং অপরের বিপদ ডেকে নিয়ে আসতে পারে। এটি ব্যক্তিগত কোনো সমস্যা নয় বরঞ্চ পুরো পৃথিবীর সমস্যা এই লোভ। বুদ্ধ বলেন : তৃণ হলো ক্ষেতের অনিষ্টকারী। আর লোভ হলো ব্যক্তির অনিষ্টকারী।[১১৮] এখানে তিনি বোঝোতে চেয়েছেন লোভ ধ্বংস নিয়ে আসে। লোভ নিয়ন্ত্রণে বুদ্ধ নির্দেশিত চারি আর্য সত্য সঠিক পথ প্রর্দশন করে। *'ইতিবুত্তক'* গ্রন্থের মৈত্রী সূত্রে বুদ্ধ তিন প্রকার কর্ম অর্থাৎ, দান, দম (আত্মদমন) এবং সংযম-এর কথা বলেন।[১১৯] তিন প্রকার কর্মের মধ্যে সংযম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে পরিবেশ বাঁচাতে হলে, প্রাণীকুল, লতা-গুল্ম ইত্যাদি সংরক্ষণ করতে হলে দরকার লোভকে দমন। Buddhadasa বলেন

> 'The greedy and selfish are destroying nature... . Our whole environment has been poisoned—prisons everywhere, hospitals filled with the physically ill, and we can't build enough facilities to take care of all the mentally ill. This is the consequence of utter selfishness [Thai, khwam hen kae tua]. . . . And in the face of all of this greed and selfishness continues to increase. Is there no end to this madness??!'[১২০]

লোভ কি শুধুমাত্র প্রকৃতি ও পরিবেশ নষ্ট করে, না। লোভের কারণেই রাজা রাজার সাথে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের সাথে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের সাথে, গৃহপতি গৃহপতির সাথে, মাতা পুত্রের সাথে, পুত্র মাতার সাথে, পিতা পুত্রের সাথে, পুত্র পিতার সাথে, ভাই ভাইয়ের সাথে, ভাই বোনের সাথে, বন্ধু বন্ধুর সাথে পরস্পর ঝগড়া করে।[১২১] বুদ্ধ লোভকে অনন্ত দুঃখের আধার বলেছেন। যাবতীয় কামনা-বাসনা এই লোভের অন্তর্গত। পরিবেশের দিকে তাকালেই বোঝা যায় মানুষের অপরিমিত লোভই আজকের সর্বনাশের মূলকারণ।

১৮. সুপারিশসমূহ

সমৃদ্ধ ও টেকসই সমাজ বিনির্মাণে পরিবেশের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ পরিবেশ সংরক্ষণে নিম্নের সুপারিশগুলো বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে।

- পরিবেশ, প্রকৃতি, স্থান, সময়, কাল অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃক্ষরোপণ করা
- যথাযথভাবে বৃক্ষের সঠিক পরিচর্যা করা
- সম্পূর্ণভবিে বৃক্ষ নিধন বন্ধ করা
- বর্জ্য অপসারণে সচেতনতা বৃদ্ধি করা
- ব্যক্তি সচেতনতা বৃদ্ধি
- সামাজিক দায়বদ্ধতা বিবেচনা করা
- রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারে যথার্থ জ্ঞান রাখা
- মাটির উর্বতা রক্ষায় পলিথিন ও প্লাস্টিক সর্বক্ষেত্রে ব্যবহার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও বিকল্প ব্যবহার রাখা
- পলিথিন ও প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার ও পুনঃব্যবহার -এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা
- নদী ও জলাশয় দূষণ রোধে যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করা
- যথাযথভাবে শিল্পবর্জ্য ও গৃহস্থালি বর্জ্য নিষ্কাশন করা
- পরিবেশ উপযোগী জ্বালানির ব্যবহার করা
- বায়ুশক্তি, সৌরশক্তি ব্যবহারে প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা
- কৃষিতে জৈব সারের ব্যবহার বাড়ানো এবং রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমানো
- বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা
- অবৈধ শিকার ও বন উজাড় প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করা
- সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে পরিবেশবান্ধব নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা
- সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলা
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক কর্মসূচি গ্রহণ করা
- গণমাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচি পালন করা
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা
- থেড পেইজ এর সচেতনতা বৃদ্ধি করা
- সার্বিকভাবে কার্বন নিঃসরণ কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা
- যানবাহনে সীমিত ব্যবহার, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ও সাইকেল ব্যবহারে উৎসাহ করা

- স্থানীয় ও বৈশ্বিক পরিবেশ সংরক্ষণ প্রকল্পে অংশগ্রহণ ও সমর্থন দেওয়া
- জল, মাটি, খনিজ অপব্যবহার রোধে আইন প্রয়োগ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা
- জলদূষণ, বায়ুদূষণ ও শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা
- প্লাস্টিক ব্যাগের পরিবর্তে কাপড়, পাট বা কাগজের ব্যাগ ব্যবহার
- পর্যটনস্থলে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য উদ্বুদ্ধ করা
- নতুন প্রজন্মকে পরিবেশ সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া ও পরিবেশবান্ধব জীবনধারার চর্চা শেখানোর পাশাপাশি নৈতিক জীবনযাপনের চর্চা অব্যহত রাখা

উপরি -উক্ত সুপারিশের পাশাপাশি প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসারে শাস্তির ব্যবস্থাও জোড়ালো করতে হবে।

১৯. উপসংহার

পরিবেশের সুরক্ষা মানবজীবনের অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য। বুদ্ধ জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সংরক্ষণে নানা উপদেশ দিয়েছেন। সমাজের সকলেরই উচিত তাঁর নির্দেশিত নির্দেশনা অনুসারে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় সচেতনভাবে জীবনযাপন করা এবং পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও নীতি গ্রহণ করা। টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে একটি সুস্থ ও সমৃদ্ধ পৃথিবী গড়ে তুলা অসম্ভব কিছু নয়। তাই পরিবেশ সংরক্ষণের বনায়ন বৃদ্ধি করতে হবে গাছ কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে ও অক্সিজেন সরবরাহ করে। সচেতনতা সৃষ্টি করে পরিবেশবান্ধব জীবনযাপন করতে হবে। শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সবুজ পরিবেশ মানসিক চাপ কমায় ও সুস্থ থাকতে সাহায্য করে। আবার অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় প্রাকৃতিক সম্পদ কৃষি, শিল্প ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিরাপত্তার পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বসবাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তোলা যায়। আর পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সমাজের সকলকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

তথ্য নির্দেশ ও টীকা

১. *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, সপ্তদশ পুনর্মুদ্রণ (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০১৪), পৃ. ৭২৭

২. সুব্রতকুমার সাহা, *পরিবেশবিজ্ঞান*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৭), পৃ. ১

৩. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Sixth edition (Oxford : Oxford University Press, 2000), P. 421

৪. উদ্ধৃত, করুণানন্দ ভিক্ষু, *পালিসাহিত্যে নগরবিন্যাস ও নগরজীবন*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪), পৃ. ৪৬

৫. Edited by Mary Evelyn Tucker and Duncan Rytken Williams, *Buddhism and Ecology-The Interconnection of Dharma and Deeds*, (Cambridge : Massachusetts, 1997), p. xvi

৬. Celia E.Deane-Drummond, *The Ethics of Nature* (Oxford : Blackwell, 2004), p. 66

৭. *পরিবেশবিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২; Savindra Singh, *Environmental Geography*, Revised Edition (Allahabad: 2004, Prayag Pustak Bhawan), p. 357

৮. প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত, *মহাবর্গ* (তাইওয়ান: সন অনুল্লেখিত, করপর‍্যাট বডি অব দি বুদ্ধ এডুকেশনাল ফাউন্ডেশন), পৃ. ২

৯. ভদন্ত ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, ভদন্ত সুমন স্থবির, ভদন্ত বঙ্গিস ভিক্ষু, ভদন্ত অজিত ভিক্ষু, ভদন্ত সীবক ভিক্ষু, *অঙ্গুত্তর নিকায়*, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় প্রকাশ (রাঙ্গামাটি : বনভান্তে প্রকাশনী, ২০১৫), পৃ. ১৮৬

১০. শ্রীমৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ভিক্ষু অনূদিত, *বিভঙ্গ* (চট্রগ্রাম : ২০১২), পৃ. ২০৫

১১. অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া অনূদিত, *অঙ্গুত্তর নিকায়*, চতুর্থ খণ্ড (রাঙ্গামাটি : ২০০৫), পৃ. ২১২

১২. অঙ্গুত্তর নিকায়, প্রাগুপ্ত, পৃ. ২১৩-২১৪

১৩. J. Baird Callicott, *Earth's Insights: A Survey of Ecological Ethics from the Mediterranean Basin to the Australian Outback* (Berkeley: University of California Press, 1994)

১৪. *Buddhism and Ecology-The Interconnection of Dharma and Deeds*, ibid, p. 352

১৫. Shann. Davies (Ed.), *An ethical approach to environmental education- Buddhism and Protection of nature*, Tree of life (Geneva: Buddhist Perception of Nature, 1987), p. 22

১৬. Kabilsingh, C, Chankaew, J. & Kabilsingh, P. *Buddhism for preservation of nature,* (Bangkok: Thammasart University Press, 1991), p. 34

১৭. সোলায়মান আলী সরকার, *ভারতের দর্শনপরিচিতি* (ঢাকা: ২০০৪, বাংলা একাডেমী), পৃ. ৬২

১৮. শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, *সংযুক্ত নিকায়*, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ (কলিকাতা : ১৪০০), পৃ. ১২৬

১৯. Chatsumarn Kabilsingh, Quoted in Buddhism and Ecology- The Interconnection of Dharma and Deeds, (Cambridge : Massachusetts, 1997), edited by Mary Evelyn Tucker and Duncan Rytken Williams, p. 33-34

২০. শ্রীমৎ ধর্মতিলক স্থবির অনূদিত, *বুদ্ধবংশ* (চট্টগ্রাম : ত্রিপিটক রির্সাচ সোসাইটি, ২০১৯), পৃ. ২৯-১২৭।

২১. *মহাবর্গ*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৪৭৫

২২. প্রেমময় দাশগুপ্ত সংকলিত, *ফ-হিয়েনের দেখা ভারত* (কলিকাতা : ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৬), পৃ. ৬৯-৭০

২৩. প্রেমময় দাশগুপ্ত সংকলিত, *হিউয়েন সাঙের দেখা ভারত* (কলিকাতা : ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৭), পৃ. ১১৯ ও ১২১

২৪. অধ্যাপক রণধীর বড়ুয়া, *মহামানব বুদ্ধ*, দ্বিতীয় সংস্করণ (চট্টগ্রাম : ১৯৮৫), পৃ. ২৭

২৫. *ফ-হিয়েনের দেখা ভারত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

২৬. *মহামানব বুদ্ধ*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৫৫

২৭. শ্রী শীলালঙ্কার মহাস্থবির অনূদিত, *ধম্মপদট্ঠকথা*, প্রথম খণ্ড (কোলকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সী), পৃ. ১২১-১৪৪

২৮. গিরিশচন্দ্র বরুয়া, *ধম্মপদ*, দ্বিতীয় প্রকাশ (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৭৭) পৃ. ১৮০

২৯. প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৮১

৩০. প্রাগুপ্ত, পৃ. ৬২

৩১. সাধনান্দ মহাস্থবির অনূদিত, *সুত্ত নিপাত* (রাঙ্গামটি: ২০০৭), পৃ. ১৮

৩২. শ্রীমৎ বঙ্গীশ ভিক্ষু, শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু, শ্রীমৎ প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু, অনূদিত, *সংযুক্ত নিকায়*, মহাবর্গ (রাঙ্গামাটি : ২০১১), পৃ. ১৯৩

৩৩. *Buddhism and Ecology-The Interconnection of Dharma and Deeds*, ibid, p. 24-25

৩৪. *মহাবর্গ*, প্রাগুপ্ত পৃ. ১৭৯

৩৫. Kabilsingh, *A Cry from the Forest* (Bangkok : Printing House Co Ltd, 1987), p. 24

৩৬. রাজগুরু ধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির অনূদিত, *মহাপরিনিব্বানং সূত্ত* (তাইওয়ান: সন অনুল্লেখিত, করপর‍্যাট বডি অব দি বুদ্ধ এডুকেশনাল ফাউন্ডেশন), ভূমিকা দ্রষ্টব্য

৩৭. পঞ্চবর্গীয় শিষ্য : বুদ্ধ তার নবআবিষ্কৃত দর্শন যাদের প্রথম দেশনা করেছেন তারা বৌদ্ধ সাহিত্যে পঞ্চবর্গীয় শিষ্য হিসেবে পরিচিত। এই পঞ্চবর্গীয় শিষ্য হলেন সেই পাঁচজন সন্ন্যাসী যারা বুদ্ধের প্রথম ধর্মদেশনা শুনেছিলেন এবং তাঁর প্রথম শিষ্য হিসেবে দীক্ষিত হয়েছিলেন। এঁরা বুদ্ধের প্রাথমিক শিক্ষার সাক্ষী এবং বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। বুদ্ধ বোধিজ্ঞান লাভের পর প্রথমে এই

পাঁচজন সন্ন্যাসীর সন্ধানে যান, যারা পূর্বে তাঁর সঙ্গে তপস্যা করেছিলেন। ধর্মচক্রপ্রবর্তন সূত্র বুদ্ধের প্রথম শিক্ষা, যা তিনি এই পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের দেন। এদেরকে নিয়ে প্রথম বৌদ্ধ সংঘের প্রতিষ্ঠিত হয়। পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের ভূমিকা বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে অপরিসীম। বুদ্ধের প্রথম ধর্মদেশনা ও সংঘ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ধর্মপ্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে এঁরা ধর্মের ভিত্তি রচনা করেন। অর্থাৎ, পঞ্চবর্গীয় শিষ্যের মাধ্যমেই বৌদ্ধ ধর্মের প্রাথমিক প্রচার শুরু হয়, যা আজও বিশ্বজুড়ে প্রাসঙ্গিক।

৩৮. *মহাবর্গ*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৪, ১৬, ১৯, ২১, ২৪ ৩৭, ৪১

৩৯. প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৭৯

৪০. ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু, *পাচিত্তিয়*, প্রথম প্রকাশ (রাঙ্গামাটি : বনভন্তে-প্রজ্ঞাবংশ একাডেমি, ২০০৭), পৃ. ৩৯৫-৩৯৬

৪১. বিনয়াচার্য ভদন্ত সত্যপ্রিয় মহাথের, *চূল্লবর্গ* (রাঙ্গামাটি : বনভান্তে প্রকাশনী, ২০০৩), পৃ. ৩৮০-৩৮৩

৪২. প্রাগুপ্ত পৃ. ৩৭৯-৩৮০

৪৩. *মহাবর্গ*, প্রাগুপ্ত পৃ. ১৭৯-১৮০

৪৪. *Buddhism and Ecology- The Interconnection of Dharma and Deeds*, ibid, p. 29

৪৫. Darlington, S. M., *The Ordination of a Tree: The Thai Buddhist Environmental Movement* (2nd ed.) (Albany : State University of New York Press, 2018). P. 89, 153

৪৬. Kemper, S., *Rescuing the Buddha: Buddhism, Monks, and the Forest in Sri Lanka,* In *Theravada Buddhism in Colonial Contexts* (Routledge :2020), p. 145–168

৪৭. Schober, J., *Buddhist Activism and Climate Justice in Myanmar,* In *Routledge Handbook of Religion and Ecology* (Routledge : 2019)p. 235–238

৪৮. *চূল্লবর্গ*, প্রাগুপ্ত, পৃ.

৪৯. *মহাবগ্গ*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ২৬১

৫০. https://www.artaqua.co/who-80-of-deadly-diseases-from-unsafe-water/

৫১. *চূল্লবর্গ*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৩৮১

৫২. প্রাগুপ্ত, পৃ. ৩৮০-৩৮৩

৫৩. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/43840/9789241596435_eng.pdf?sequence=1, Report Title: *"Safer water, better health: Cost, benefits and sustainability of interventions to protect and promote health"*

৫৪. লক্ষ্য ৬ (পরিষ্কার জল ও স্যানিটেশন) এবং লক্ষ্য ১৫ (স্থলজ জীবন) প্রথম অধ্যায় দেখার জন্য অনুরোধ করছি

৫৫. https://www.adb.org/sites/default/files/publication/150136/review-compendium-environmental-policies-and-laws-bhutan.pdf, Review and Compendium of Environmental Policies and Laws in Bhutan Input to the Asian Judges Network on Environment Prepared by Antonia Gawel and Irum Ahsan

৫৬. ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু অনূদিত, *পাচিত্তিয়া*, দ্বিতীয় প্রকাশ (চট্টগ্রাম : ২০০৭, সদ্ধর্মপ্রাণ দায়ক-দায়িকা), পৃ. ৯৪

৫৭. *পাচিত্তিয়া*, পূর্বোক্ত পৃ. ৯৪

৫৮. *মহামানব বুদ্ধ*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৩০-৩১

৫৯. সাধনান্দ মহাস্থবির অনূদিত, *সুত্ত নিপাত* (রাঙ্গামটি : ২০০৭), পৃ. ১৮

৬০. হলকর্ষণ উৎসব :

হলকর্ষণ উৎসব বা হালকর্ষণ পর্ব বৌদ্ধ ঐতিহ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কৃষিভিত্তিক উৎসব, যা মূলত বুদ্ধের জীবনদর্শন ও কৃষিকাজের সাথে সম্পর্কিত। একবার নগরে হলকর্ষণোৎসব হচ্ছে, রাজা শুদ্ধোধন নিজে সুবর্ণ লাঙ্গলে হাল চাষ করে-পোরহিত্য করবেন এই উৎসবে। সেখানে তিনি পুত্র সিদ্ধার্থকে নিয়ে যান। কুমার সিদ্ধার্থকে এক জম্বুবৃক্ষের ছায়ায় বসিয়ে রেখে, রাজা এই কর্ষণোৎসবের পৌরহিত্য করলেন। সেইসময় সিদ্ধার্থ লক্ষ্য করল কর্ষিত ভূমির উপর মৃত ও জীবিত অসংখ্য কীট পতঙ্গ। উয়ন্ত পাখীগুলো সেসব কীট পতঙ্গ ধরে ধরে খাচ্ছে। বিস্ময়ের সাতে তিনি দেখলেন ভেকের দল খাচ্ছে কীট পতঙ্গ, গর্ত থেকে সাপ বেরিয়ে এসে খাচ্ছে সে সব ভেক, আবার গরুড় পাখী উড়ে এসে ধওে নিয়ে যাচ্ছে সাপগুলি, নি:সন্দেহে খাবার জন্যই। জীব কাছে জীবিকার জন্যে জীবনের বিনাশ। জীবনের এই ব্যর্থ প্রয়াস দেখে উদ্বেল হয়ে উঠল কুমার সিদ্ধার্থের প্রাণ। এত উৎসব এত আমোদ-প্রমোদ কিন্তু সিদ্ধার্থের কাছে হয়ে গেল অর্থহীন।

৬১. *মহামানব বুদ্ধ*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ২৭

৬২. Buddhadasa Bhikkhu, *Hand Book for Mankind*, (Bangkok : Thammasapa, 2002), p. 20-41

৬৩. পারমী : বৌদ্ধ দর্শনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুশীলন পদ্ধতি হলো "পারমী"। পারমী শব্দের অর্থ হলো পরিপূর্ণতা বা চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর গুণ। এটি এমন গুণাবলি বা সাধনাকে বোঝায় যা দুঃখমুক্তির ব্রতে বোধিসত্ত্ব আচরিত জীবন প্রণালী। অর্থাৎ, একজন সাধককে সংসারের দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে বোধিলাভ বা নির্বাণ অর্জনে সহায়তা করে। পারমীগুলি অনুশীলনে মূলত মহাযান ও থেরবাদ অনুসারে আলাদাভাবে বর্ণিত হয়েছে। থেরবাদ অনুসারে পারমী দশ প্রকার। যথা : ১. দান পারমী (দানশীলতাশীল), ২. শীল পারমী (কায়িম, বাচনিক ও মানসিক সংযমতা), ৩. নৈষ্ক্রম্য পারমী (বন্ধন ত্যাগ), ৪. প্রজ্ঞা পারমী (বিষেশ

জ্ঞান), ৫. বীর্য পারমী (কর্মোদ্দীপনা), ৬. খন্তী পারমী (ক্ষমা), ৭. সচ্চ পারমী (সত্যবাদিতা), ৮. অধিট্ঠান পারমী (চিত্তের একাগ্রতা), ৯. মেত্তা পারমী (পরোপকারিতা), ১০. উপেক্ষা পারমী (চিত্তের নিরপেক্ষ সাম্য অবস্থা)। অপরদিকে মহাযান দর্শনে পরমীকে পারমিতা বলা হয়। এক্ষেত্রে পারমিতা ছয় প্রকার। যথা: ১. দান পারমিতা (চিত্তের উদারতা), ২. শীল পারমিতা (নীতি-নৈতিকতা), ৩. ক্ষান্তি পারমিতা (ক্ষমাশীলতার সাধনা), ৪. বীর্য পারমিতা (চিত্তের দৃড়তা), ৫. ধ্যান পারমিতা (চিত্তের সমাধি ভাব), ৬. প্রজ্ঞা পারমিতা (মুক্তির জন্য জ্ঞান উদয়)। থেরবাদে পারমীগুলি মূলত বোধিসত্ত্বের দীর্ঘ সাধনার পথকে নির্দেশ করে। মহাযানে পারমিতাগুলি বোধিচিত্ত বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় গুণ। এই পারমী/পারমিতাগুলি বৌদ্ধধর্মের আধ্যাত্মিক পথে মুক্তির মূল স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত হয়।

৬৪. জাতক : পালি সাহিত্যের যে অংশে মহামানব গৌতম বুদ্ধের জন্ম-জন্মান্তরের পারমী পূরণের মাধ্যমে বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন সেই জন্মের কাহিনি নিয়ে রচিত গ্রন্থ হলো জাতক। এতে বুদ্ধ জীবনের আলোকে বহু উপদেশ বর্ণিত আছে। এটি ত্রিপিটক গ্রন্থের সুত্তপিটকের অন্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের দশম গ্রন্থ । উল্লেখ্য বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে ৫৪৭ বার জন্ম গ্রহণ করেছিলেন সেগুলো জাতক সাহিত্যে লিপিবদ্ধ আছে। বুদ্ধের এই অতীত জন্মের কাহিনি ছয়টি খণ্ডের মধ্যে বিভক্ত করে বর্ণিত আছে। তার মধ্যে ১ম খণ্ডে (১-১৫০) জাতক, ২য় খণ্ডে (১৫১-৩০০) জাতক, ৩য় খণ্ডে (৩০১-৪৩৮) জাতক, ৪র্থ খণ্ডে (৪৩৯-৫১০) জাতক, ৫ম খণ্ডে (৫১১-৫৩৭) জাতক, ৬ষ্ঠ খণ্ডে (৫৩৮-৫৪৭) জাতক বর্ণিত আছে।

৬৫. ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত, *জাতক*, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ (কলিকাতা : ১৩৮৪, করুণা প্রকাশনী), পৃ. ৬১-৬২

৬৬. ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত, *জাতক*, পঞ্চম খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ (কলিকাতা : ১৩৯৮, করুণা প্রকাশনী), পৃ.২০৭-২০৯

৬৭. *জাতক*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৭৪-৭৫

৬৮. *জাতক*, পঞ্চম খণ্ড, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১২৮

৬৯. *মহাবর্গ*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ২৬১

৭০. প্রাগুপ্ত, পৃ. ৩৫৬

৭১. প্রাগুপ্ত, পৃ. ২৬১

৭২. প্রাগুপ্ত, পৃ. ২৬২

৭৩. প্রাগুপ্ত পৃ. ২৬৩- ২৬৫

৭৪. ভূতগামপাত্তব্রয পাচিতিয়'ন্তি । *পাচিত্তিয়া*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৬৮

৭৫. রাজগুরু শ্রীমৎ ধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির, *দীর্ঘ নিকায়*, প্রথম খণ্ড (পূর্ব পাকিস্তান : ১৯৬২, রাজানগর, রাঙ্গুনীয়া), পৃ. ৬

৭৬. *পাচিত্তিয়া*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৬৮-৬৯

৭৭. *দীর্ঘ নিকায়*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১১১

৭৮. ভিক্ষু শীলভদ্র, *দীর্ঘ নিকায়*, তৃতীয় খণ্ড, তৃতীয় প্রকাশ (রাঙ্গামাটি : ২০০৭, সদ্ধর্মপ্রাণ দায়ক-দায়িকা), পৃ. ৫২

৭৯. *অঙ্গুত্তর নিকায়*, দ্বিতীয় খণ্ড চতুর্থ নিপাত, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১০৯

৮০. প্রাগুপ্ত পৃ. ৮৫

৮১. পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত, *মধ্যম নিকায়*, দ্বিতীয় খণ্ড (কলিকাতা : ১৯৯৪, ধর্মাধার বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশনী), পৃ. ৩১

৮২. *দীর্ঘ নিকায়*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

৮৩. *মধ্যম নিকায়*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২-৬৩

৮৪. *মধ্যম নিকায়*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুপ্ত, পৃ. ২১৪

৮৫. হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী, *প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস* (কলিকাতা : ১৯৮৯), পৃ. ৩১২

৮৬. Vincent A Smith, Asoka-*The Buddhist Emperor of India*, Reprint (Delhi : Low Price Publication, 2013), p. 210

৮৭. অধ্যাপক বনশ্রী মহাথের, *প্রিয়দর্শী অশোক*, দ্বিতীয় প্রকাশ (চট্টগ্রাম : ২০১৬), পৃ. ৩

৮৮. উপ-সংঘনায়ক অধ্যাপক বনশ্রী মহাথের, প্রিয়দর্শী অশোক, দ্বিতীয় প্রকাশ ২০১৬, চট্টগ্রাম, পৃ. ২৮-২৯

৮৯. *Asoka-The Buddhist Emperor of India*, ibid, p. 210

৯০. Ibid, p. 204

৯১. Ibid, p. 204

৯২. উদ্ধৃত, সুকোমল বড়ুয়া এবং সুমন কান্তি বড়ুয়া, *ত্রিপিটক পরিচিতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০০), পৃ. ১৫৫

৯৩. Daniel H. Henning, *A Manual for Buddhism and Deep Ecology*, (World Buddhist University : 2006), p. 72 (1)

৯৪. Socio-economic and environmental issues in development, 692

৯৫. https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-for-infection-prevention-precautions

৯৬. The Role of Buddhism in Environmental Protection and Sustainable Development in Vietnam Today, Pham Cong Nhat, International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE), *Volume 6, Issue 5, May 2019, PP 74-82, http://dx.doi.org/10.20431/2349-0381.0605007, www.arcjournals.org*

৯৭. P. A. Payutto, *Buddhist solutions* (Bangkok : Buddhadhamma Foundation, 1994), p. 20

৯৮. Ibid, p. 20

৯৯. Payutto, P. A., *Toward sustainable science* (Bangkok : Buddhadhamma Foundation, 1995), p. 62

১০০. K. Sri Dhammapada, *What Buddhist Believe* (Taiwan : The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, 1996), p. 993

১০১. Ajaha Sumedho, *Teaching from the silent mind* (Taiwan : The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, 1996)

১০২. *সুত্তনিপাত*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৩৭

১০৩. *সুত্ত নিপাত*, পৃ. ১৮

১০৪. International Mother Earth Day 2020 accessed on 24 May 2025 His Holiness the Dalai Lama's Message for Earth Day 2020 .https://tibet.net/his-holiness-the-dalai-lamas-message-for-earth-day-2020/

১০৫. ভদন্ত প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু, অঙ্গুত্তর নিকায়, পঞ্চ নিপাত (রাঙ্গামাটি : রাজবন বিহার, ২০০৮), পৃ. ২০১

১০৬. চারুচন্দ্র বসু সম্পাদিত, *ধম্মপদ*, সপ্তম পুনমুর্দ্রণ (কোলকাতা: ২০১০, মহাবোধি বুক এজেন্সী), পৃ. ৯৩

১০৭. মলয় চট্টোপধ্যায় অনূদিত, *বৌদ্ধদর্শন* (কলকাতা : ১৯৯৭), পৃ. ২৭

১০৮. *ধম্মপদ*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৫৫

১০৯. ভদন্ত মেত্তাবংশ স্থবির অনূদিত, *ইতিবুত্তক*, রাঙ্গামাটি, ২০১২ পৃ. ৫৩

১১০. *ধম্মপদ*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৬৮

১১১. সুকোমল চৌধুরী সম্পাদিত, *গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন* (কলিকাতা : ২০০৮), পৃ. ১১০

১১২. ভদন্ত প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু, *অঙ্গুত্তর নিকায়*, দশক ও একাদশ নিপাত, (রাঙ্গামাটি : ২০১১), পৃ. ৩৫৯

১১৩. *সুত্তনিপাত*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৮৫

১১৪. *সুত্তনিপাত*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৭৭

১১৫. *ধম্মপদ*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৩৯

১১৬. *ধম্মপদ*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৩৯

১১৭. Kongsak Thathong,A spiritual dimension and environmental education: Buddhism and environmental crisis. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, *46*, 5063-5068. Procedia-Social and Behavioral Sciences 46 (2012) 5063 – 5068,
DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.06.386

১১৮. *ধম্মপদ*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৮৯

১১৯. *ইতিবুত্তক*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৬

১২০. Quoted in Buddhism and Ecology- The Interconnection of Dharma and Deeds, ibid, p. 29

১২১. *মধ্যম নিকায়*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৮৮

চতুর্থ অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

বুদ্ধের শিক্ষা-দর্শন ও সুশাসন : প্রায়োগিক বিশ্লেষণের রূপ-রূপান্তর

১. অবতরণিকা

মহামানব গৌতম বুদ্ধ বোধিজ্ঞান লাভ করার পর বিভিন্নভাবে বহুজনের সুখ ও কল্যাণের জন্য গঠনমূলক উপদেশ প্রদান করেন। তাঁর প্রচারিত ধর্ম-দর্শনের মূললক্ষ্য হলো অহিংসা, প্রেম, মানবতার বাণীর মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতিকে শৃঙ্খলিত ও মুক্তির পথ প্রদর্শন করা। বুদ্ধের শিক্ষা মানবজীবনের নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির শক্তিস্বরূপ। নীতি আদর্শ জীবজগতের সামগ্রিক কল্যাণময় ধর্ম। এই সর্বজনীন বাণী ও দর্শনে পৃথিবীকে সর্বতোভাবে সুখী ও শান্তিপূর্ণ করে গড়ে তোলার জন্য তিনি আজীবন সাম্য ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করে গিয়েছেন। তাঁর প্রচারিত ধর্ম বাণী সেই সময়কাল হতে শুরু করে বর্তমান সমাজ ও বিশ্ব পরিস্থিতিতে সুশাসনের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সমভাবে প্রযোজ্য। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বুদ্ধের নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। বুদ্ধের শিক্ষা ও দর্শন মানবতা, সহানুভূতি, শান্তি, এবং ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। বুদ্ধের নীতি, সহিংসতা ত্যাগ, সৎ পথ অবলম্বন, আত্মসংযম, সৎ চিন্তা এবং সৎ কাজ অনুসরণ করলে প্রশাসন এবং শাসন ব্যবস্থায় সততা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। বুদ্ধের শিক্ষা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্র পরিচালনা ও প্রশাসনিক দিক এর পাশাপাশি সমাজের প্রতিটি স্তরে মানবিক মর্যাদা ও ন্যায় নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেননা, বুদ্ধ রাজপুত্র হয়ে বাস্তব ও ব্যবহারিক জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গভীর অভিজ্ঞান লাভ করেছেন। তাঁর অর্জিত জ্ঞান জনগণের মধ্যে সম্পর্ক ও আস্থার সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন জাতিগত, সামাজিক, ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক অঙ্গনে শান্তি স্থাপনে সহায়তা করে।

২. সুশাসনের ধারণা

বর্তমান সময়ে বহুল আলোচিত শব্দের নাম 'সুশাসন' যার মাধ্যমে শাসন ব্যবস্থায় সততা ও ন্যায়-পরায়ণতার দ্বারা সুষ্ঠভাবে রাজ্য/দেশ প্রতিষ্ঠান পারিচালনা করা হয়। ইংরেজিতে যাকে 'Good Governance' বলা হয় বাংলায় তাকে বলা হয় সুশাসন। সুশাসনকে পালিতে 'ধম্মপ্পসন্ন' এবং সংস্কৃতে 'ধর্মপ্রসন্ন' বলে অভিহিত করা। '*বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*' গ্রন্থে সুশাসন বলতে ন্যায়-নীতি অনুযায়ী উত্তমরূপে রাজ্য শাসন বা নিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থাকে বোঝায়।[১] আদর্শ ও সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র/রাজ্য গঠনে সুশাসনের প্রয়োগ আবশ্যক। সুশাসন হলো অংশগ্রহণধর্মী ও গুণগত শাসনব্যবস্থার অসামান্য ধারণা। এটি দক্ষতা, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, আইনের শাসনব্যবস্থা, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এবং ন্যায্যতাকে সর্বাগ্রে নিশ্চিত করে। সুশাসন বাস্তবায়ন করা শুধু মাত্র স্ব-স্ব

দেশের সরকারের দায়িত্ব-কর্তব্য নয়। সকলের ঐকান্তিকভাবে প্রচেষ্টার মাধ্যমে এটি অর্জিত হয়। শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী, সুশীলসমাজ, নীতি নির্ধারক, স্থানীয় পর্যায়, জাতীয় পর্যায় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানবের উন্নয়নে সুশাসন বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা হয়।[২] সুশাসন একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের সর্বত্রে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। এই সুশাসনের মাধ্যমে শুধুমাত্র সরকারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় না বরঞ্চ নাগরিকদের যাপিতজীবনের মানন্নোয়নের পাশাপাশি এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতও করে। তাই সমৃদ্ধ রাজ্য বা দেশ গঠনের জন্য সুশাসনের প্রয়োজন রয়েছে। এ বিষয়ে *'Guidelines for Good Governence'* গ্রন্থ থেকে সুশাসনের ধারণা উপস্থাপন করছি। এখানে দেখা যায় :

> 'Good governance is also sound discoursed among the researchers, intellectuals, academicians, law makers, civil society, policy makers, local, national, and international level growth communities. Within a reasonable phase frame good governance is required by the institutions/organizations and developments in order to serve to all stakeholders.[৩]

এমতাবস্থায় বলা যায়, রাজা/শাসক কিংবা ব্যবস্থাপক সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে দেশ বা রাজ্য কিংবা প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। টেকসই সমাজ বিনির্মাণে সুশাসন বেশ কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এই সম্পর্কে বলা হয় :

> 'Good governance also trusts on an vigorous and well-versed citizen body. Active citizenship not only reinforces communal bonds, but also encourages accountability and transparency and keeps fundamental rights'.[৪]

সুশাসন হলো সর্বোত্তম সুনীতি যা শাসক বা রাজা সুন্দরভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা কিংবা ব্যবস্থাপনায় অসামান্য ভূমিকা পালন করে। ১৯৮৯ সালে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক সুশাসনের একটি সমৃদ্ধ ধারণা প্রকাশ করা হয়। পরবর্তী সময়কালে ১৯৯২ সালে এটি আবার পুনরায় প্রকাশিত হয়। সবশেষে ১৯৯৭ সালে বিশ্বব্যাংক সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের উন্নয়নে পুনরায় সুশাসনের গঠন ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে সংজ্ঞায়িত করে।[৫] সামগ্রিক ক্ষেত্রে সুশাসনের আটটি অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা ব্যক্তি থেকে শুরু করে রাষ্ট্র, রাজা, প্রশাসক এবং প্রতিষ্ঠান সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। এগুলো হলো: অংশগ্রহণ (Participation), আইনের শাসন (Rule of Law), স্বচ্ছতা (Transparency), সংবেদনশীলতা (Responsiveness), সমন্বিত সিদ্ধান্ত (Consensus orientation), সমতা ও অন্তর্ভুক্তি (Equity and inclusiveness), কার্যকারিতা ও দক্ষতা (Effectiveness and efficiency), এবং জবাবদিহিতা (Accountability)।[৬]

চিত্র ১ : সুশাসনের বৈশিষ্ট্য

https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf

অংশগ্রহণ (Participation) : অংশগ্রহণ হলো শাসনব্যবস্থায় সর্বস্তরের জনসাধারণ বা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় সভায় অংশগ্রহণ।

আইনের শাসন (Rules of Law) : আইনের শাসন বলতে শাসনব্যবস্থায় সর্বস্তরের জনসাধারণকে সমানভাবে ন্যায়বিচার ও আইনের সুযোগ দেওয়া।

স্বচ্ছতা (Transparency) : গৃহিত সিদ্ধান্ত ও কার্যাবলি জনগণের নিকট স্বচ্ছতার সাথে তুলে ধরা এবং সহজ লভ্য হওয়াই হচ্ছে শাসন ব্যবস্থার স্বচ্ছতা।

সংবেদনশীলতা (Responsiveness) : সংবেদনশীলতা শাসনব্যবস্থায় সেই গুণ যা সর্বস্তরের জনসাধারণের চাহিদা/অভিযোগ চিহ্নিতকরণ করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে নীতি-নির্দারণকে সর্বাগ্রে অগ্রাধিকার দেওয়া।

সমন্বিত সিদ্ধান্ত (Consensus orientation) : নানারকম স্বার্থ সংশ্লিষ্ট চিন্তা-চেতনা কিংবা মতবাদকে সমন্বয় করে উত্তম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই হলো শাসনব্যবস্থায় সমন্বিত সিদ্ধান্ত।

সমতা ও অন্তর্ভূক্তি (Equity and inclusiveness) : সমতা ও অন্তর্ভূক্তি বলতে শাসনব্যবস্থায় সেই গুণকে বোঝায় যেখানে দেশের সর্বস্তরের নাগরিকের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে সার্বিক উন্নয়নের সুফল লাভ করে।

কার্যকারিতা ও দক্ষতা (Effectiveness and efficiency) : এটির মাধ্যমে দেশের সর্বস্তরের জনগণের মতামত অনুযায়ী বিরাজিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করে উন্নয়নকে নিশ্চিত করা।

জবাবদিহিতা (Accountability) **:** জবাবদিহিতা বলতে রাজা/প্রশাসক কিংবা সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রম অবহিতকরণের জন্য একান্তভাবে বাধ্যবাধকতা থাকাকে বোঝায়।

সুশাসন কী ধরনের হবে তা নির্ভর করে রাজা/শাসকের উপর। রাজ্য/রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য শাসকের সততা, বিবেকবোধ, মানবিকতা, প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, নৈতিকতা একান্ত আবশ্যক। সুশাসক কখনো কারও প্রতি অন্যায় আচার-আচরণ করবেন না। তিনি নাগরিকের সুযোগ সুবিধা প্রদান করবেন। সকলের প্রতি সমাচরণ করবেন। সকল প্রকার মতানৈক্যের উর্দ্ধে গিয়ে ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকলের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখবেন। সিদ্ধান্তগ্রহণে সকলের মতামতকে প্রাধান্য দিতে হবে। বুদ্ধ প্রদর্শিত নৈতিক শিক্ষা নির্মোহ সমাজ বিনির্মাণের পথ প্রদর্শন করে। তাঁর শিক্ষা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

৩. বুদ্ধের শিক্ষা-দর্শনে সুশাসনের প্রেক্ষাপটের উৎসবিচার

বর্তমান সময়ে সুশাসন ব্যাপকভাবে আলোচিত একটি বিষয়ের নাম। সুশাসনের উপর বুদ্ধ খুবই গুরুত্ব আরোপ করেছেন আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছরেরও অনেক আগে। তিনি মানবিক ও ন্যায়-পরায়ণতার সাথে রাজ্য পরিচালনা করার উপদেশ দিয়েছিলেন। শাসক অসৎ, অত্যাচারী, অমানবিক ও দুর্নীতিবাজ হলে রাজ্য/রাষ্ট্রে অশান্তি নেমে আসে। রাষ্ট্র বা রাজ্যের সর্বস্তরে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পায়। বিচারহীনতার সংস্কৃতি বৃদ্ধি পায়। জনগণ অসৎ হয়। নানাবিধ অপরাধ সংগঠিত হয়। এ বিষয়ে বুদ্ধের চমৎকার একটি নির্দেশনা দেখতে পাওয়া যায়। নির্দেশনাটি নিম্নরূপ : 'রাজ্যের রাজারা অধার্মিক হলে উপরাজারাও অধার্মিক হয়। উপরাজারা অধার্মিক হলে ব্রাহ্মণ-গৃহপতিরাও অধার্মিক হয়। ব্রাহ্মণ-গৃহপতিরা অধার্মিক হলে গ্রামবাসী-নগরবাসীও অধার্মিক হয়। গ্রামবাসী-নগরবাসী অধার্মিক হলে চন্দ্র-সূর্য নিজস্ব কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে না। চন্দ্র-সূর্য নিজস্ব কক্ষপথে পরিভ্রমণ না করলে নক্ষত্র-তারকারাও নিজস্ব কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে না। নক্ষত্র-তারকারা নিজস্ব কক্ষপথে পরিভ্রমণ না করলে সঠিক সময়ে দিনরাত হয় না। সঠিক সময়ে দিন-রাত হয় না হলে সঠিক সময়ে পক্ষ-মাস হয় না। সঠিক সময়ে পক্ষ-মাস হয় না হলে সঠিক সময়ে ঋতু-বছর হয় না। সঠিক সময়ে ঋতু-বছর না হবার কারণে অসময়ে-অনিয়মিতভাবে বায়ু প্রবাহিত হয়। অসময়ে-অনিয়মিতভাবে বায়ু প্রবাহিত হবার কারণে দেবতারা অসন্তুষ্ট হয়। দেবতারা অসন্তুষ্ট হবার কারণে যথাসময়ে বৃষ্টি বর্ষিত হয় না। যথাসময়ে বৃষ্টি বর্ষিত হয় না হবার কারণে অল্প সময়ে শষ্য পরিপক্ক হয়। অল্প সময়ে পরিপক্ক শষ্য পরিভোগ করে মানুষ অল্পায়ু, কুৎসিৎ এবং নানাবিধ কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়।'[৭]

আবার সঠিক সময়ে পক্ষ, মাস হবার কারণে সঠিক সময়ে ঋতু ও বছর হয়। সঠিক সময়ে ঋতু ও বছর হবার কারণে যথাসময়ে, নিয়মিতভাবে বায়ু প্রবাহিত হয়। যথাসময়ে নিয়মিত ভাবে বায়ু প্রবাহিত হওয়ার কারণে দেবতারা সন্তুষ্টি প্রকাশ করে। দেততাগণ সন্তুষ্টি প্রকাশ করার কারণে যথাসময়ে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। যথাসময়ে বৃষ্টি হবার কারণে

নির্দিষ্ট সময়ে শষ্য পরিপক্ক হয়। নিদিষ্ট সময়ে পরিপক্ক শষ্য পরিভোগ করে মানুষ দীর্ঘজীবন লাভ কওে, সুন্দও দেহের অধিকারী হয়, বলবান ও কমরোগে আক্রান্ত হয়।

রাজ্যে বা রাষ্ট্রের রাজা বা শাসক যদি মানবিক, সৎ, প্রজাদরদী, উদার, ন্যায়-পরায়ণ এবং নীতিবান হয় তবে সর্বস্তরের জনসাধারণ তাঁর গুণগান করে, যশঃ-খ্যাতি প্রচার করে, সর্বোপরি তাঁকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসে। শুধু তাই নয়, সর্বস্তরের জনসাধারণ তাঁকে মানে, শোনে এবং তাঁর কথা মেনে জীবন যাপন করে। বুদ্ধ বলেন:

গমনকালে প্রধান ষাঁড় চরে যদি এঁকেবেঁকে
অন্য গো সবও চলে বেঁকে, অনুসরণ তাকে।
মনুষ্যশ্রেষ্ঠ নৃপতি যদি চলেন অধর্ম পথে,
প্রজা সব হয় অধার্মিক, দুর্বল রাজকার্য তটে;
বিরাজে সমস্ত রাজ্যে দুঃখ, রাজার অধর্মতে।
গমনকালে প্রধান ষাঁড় চলে যদি সোজাভাবে,
অন্য গো সবও চলে সোজা, নহে অন্যভাবে।
মনুষ্যশ্রেষ্ঠ নৃপতি যদি চলেন ধর্মপথে,
প্রজা সব হয় ধার্মিক, রাজার আদর্শতে,
বিরাজে সমস্ত রাজ্যে সুখ, রাজার ধর্মেতে।[৮]

এখানে রাজা বা শাসকের আচার-আচরণের স্বরূপ অতি চমৎকার ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। রাজা বা শাসককে যেন মানবতাবাদী, পরোপকারী, উদার, সংযমী, ন্যায়-পরায়ণ, নির্লোভী, নিরঙ্কারী, ক্ষান্তিপরায়ণ, নিঃস্বার্থপরায়ণ, কল্যাণমিত্র, শাসককে সুরাজা বা সুশাসক হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

বুদ্ধের শিক্ষা-দর্শনে শাসনব্যবস্থার মুলবিষয় হলো 'ধম্ম' বা 'ধর্ম' যার মাধ্যমে ন্যায়-নীতি, সততা-নিয়ম-কানুনকে বোঝায়। এ বিষয়ে ত্রিপিটকে প্রচুর তথ্য-উপাত্ত রয়েছে। পালি সাহিত্যের মাধ্যমে অতীতে রাজপদ/রাজা কখনো বংশগত ছিল বলে জানা যায় না। রাজ্য পরিচালনা করার জন্য রাজ্যের সর্বস্তরের জনগণ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে বিশপতি বা বিশম্পতি বা রাজা রূপে নির্বাচন করতো।[৯] *'দীর্ঘ নিকায়'* গ্রন্থের *'অগ্গঞ্ঞসূত্রে'* আদি শাসক বা রাজার একটি অসাধারণ তথ্য রয়েছে। এখানে দেখা যায়: 'সৃষ্টির শুরুর দিকে কোনো রাজা/প্রশাসক ছিল না। এমতাব্স্থায় মানুষের মধ্যে প্রকটভাবে লোভ-দ্বেষ-মোহের আবির্ভাব হয়। ফলশ্রুতিতে মিথ্যাবলা, চুরি, হত্যা ও ব্যভিচারসহ নানবিধ গর্হিত অপরাধ বৃদ্ধি পায়। একে-অপরের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ জন্মাতে শুরু করে। অবিশ্বাস করতে শুরু করে। অশ্রদ্ধা আর অসম্মান শুরু করে। ক্রোধভাব প্রদর্শন করে আর কোনো উপায় না দেখে সকলে একত্রিত হয়ে এই অবস্থা থেকে বের হয়ে আসার পথ খুঁজতে লাগলো। তারা এমন একজন মহান ব্যক্তিকে এই আসনে দেখতে চান যিনি হবেন সুদর্শন, সুদক্ষ, নিরপেক্ষ, নীতিবান, গুণবান, প্রজাদরদী এবং যিনি সকলের সর্বোত্তম

উন্নয়নের জন্য নিজেকে নিবেদিত রাখবেন। তাই সকলে একত্রিত হয়ে রাজ্যে শান্তি স্থাপনে অধিকারী প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিকেই সুশাসক বা রাজা হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। রাজ্যের সর্বস্তরের জনগণ মিলে রাজা নির্বাচিত করে বলেই সেই নির্বাচিত রাজার নাম রাখা হয় 'মহাসম্মত'।[১০]

সকলের ঐক্যমত্য এবং সম্মতিতে নির্বাচিত শাসক বা রাজার নামই হলো মহাসম্মত যিনি সততা, ন্যায়-পরায়ণতা ও ধর্মানুসারে রাজ্য শাসন করে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। তিনি চক্রবর্তী রাজা নামেও খ্যাত। বুদ্ধের শিক্ষা-দর্শনে সুশাসনকে খুবই জোড় দেওয়া হয়েছে। তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপলক্ষ্যে ভিক্ষু-সংঘ ও গৃহীদের মধ্যে উপদেশ প্রদান করেন যেখানে সুশাসন সম্পর্কে ধারণা দেখতে পাওয়া যায়।

'*দীর্ঘ নিকায়*' গ্রন্থে '*চক্কবত্তী সিংহনাদ সূত্র*' সুশাসকের দশবিধ গুণের কথা জানা যায়।[১১] এগুলো হলো :

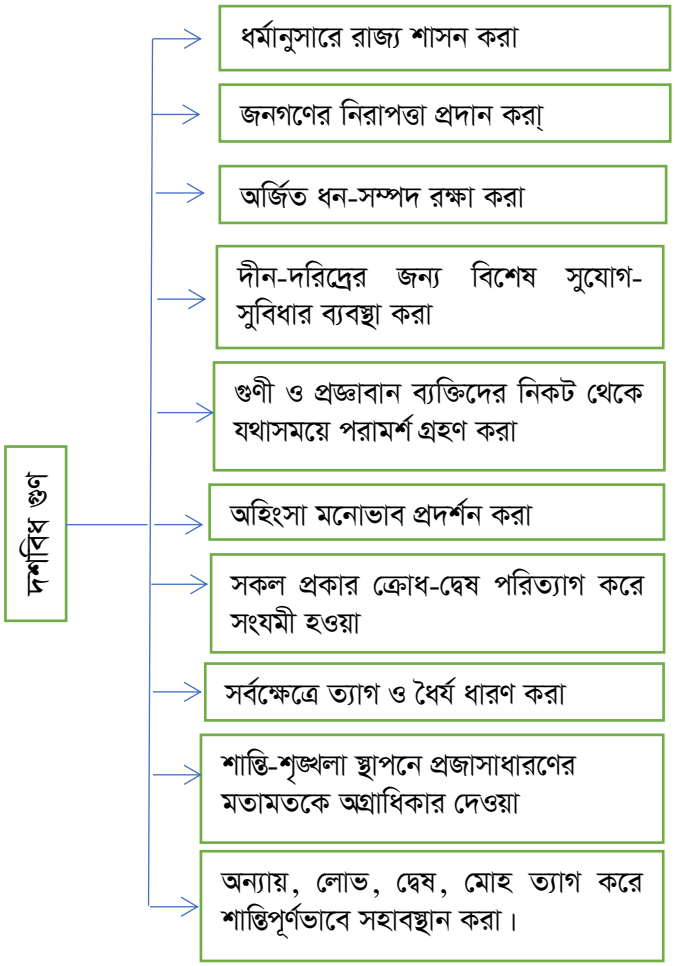

সারণি : ১

রাজা/শাসক বা চক্রবর্তী রাজা ন্যায়-পরায়ণতার সাথে রাজ্যশাসন করেন বলেও উল্লেখ রয়েছে।[১২] বুদ্ধ সুন্দর, শৃঙ্খলিত ও উন্নত সমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠায় শাসকের দায়িত্ব-কর্তব্যের পাশাপাশি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি অনন্যসাধারণ ধারণা প্রদান করেন। যথা :

রাজা/প্রশাসক সততার সাথে বিধি-বিধান মেনে রাজ্য/রাষ্ট্র শাসন করেন। সকলের মঙ্গল, সুখ, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করেন। পণ্ডিত ও সুধীজনদের যথাযথ সম্মান-শ্রদ্ধা করেন। সর্বতোভাবে রাজ্য/রাষ্ট্রের জনসাধারণকে নিজের ন্যায় রক্ষা করেন। জীববৈচিত্র্য রক্ষায় পশু-পাখিদের সুরক্ষা করেন। যথাযথভাবে সৈন্যবাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণ করেন। অধীন্থ অপরাপর সামন্তরাজাদের সার্বক্ষণিক দেখা-শোনা করেন। পূজনীয়দের সেবা-ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করেন।
রাজ্যে কোনো রকমের যেন অপরাধ না হয় সেদিকে খুবই মনোযোগ দেন এবং সচেতন থাকেন।
প্রয়োজনে দুঃখী-দীন-দরিদ্রদেরকে ধন দিয়ে সাহায্য-সহায়তা করেন।
রাজ্যের জন্য যা কিছু অকুশল, মন্দ, গর্হিত তা বর্জন করেন এবং যা কিছু কল্যাণকর এবং সুখকর আগ্রহ সহকারে তা গ্রহণ করেন।

সারণি : ২

উপরি-উক্ত দায়িত্ব-কর্তব্য বা আচরণগুলো রাজা/শাসকরা বংশ পরম্পরায় অত্যন্ত সততার সাথে পালন করতেন। এখানে দেখা যায়, একজন ন্যায়-পরায়ণ রাজা/শাসককে সর্বস্তরের জনসাধারকে একই দৃষ্টিতে দেখার প্যাশাপশি জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সমভাবে পশু-পাখিদেরকে সুরক্ষা করার প্রদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

রাজ্যে প্রকৃত শান্তি ও সুখ অর্জনের জন্য সর্বপ্রথম মনের শুদ্ধি প্রয়োজন। কুশল ও অকুশল কিংবা ভালো-মন্দ সবই মনের উপর নির্ভরশীল। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য রাজা শাসকের মনের শুদ্ধিতার প্রয়োজন। এমতাবস্থায় দরকার কুশল চিত্ত এবং কুশল কর্মের অনুশীলন। *'ধর্মপদ'* গ্রন্থের *'বুদ্ধবর্গে'* কুশলকর্ম সম্পর্কে উল্লেখ আছে :

সব্ব পাপস্স অশরণং, কুসলস্স উপসম্পদা,
সচিত্তপরিযোদপনং, এতং বুদ্ধান সাসনং।[১৩]

অর্থাৎ, সর্বপ্রকার পাপ থেকে বিরতি (শীল), কুশল কর্মের পরিপূর্ণতা (প্রজ্ঞা) এবং আপন চিত্তের পবিত্রতা সাধন (সমাধি) –এটিই বুদ্ধগণের অনুশাসন।

বুদ্ধের শিক্ষা-দর্শন মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তি জাগ্রত করে স্বাবলম্বী করে গড়তে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। লোভ, ঘৃণা ও মোহ থেকে মুক্ত হয়ে ন্যায়নিষ্ঠা ও সহানুভূতিশীল হওয়া সুশাসকের কর্তব্য। 'জাতক' পাঠে বেশ্বান্তর রাজার দশবিধ গুণের কথা জানা যায়। যে গুণগুলো একজন সুশাসকের থাকা আবশ্যক। এই দশবিধ গুণগুলো হলো : দম, শম, ক্ষান্তি, সংবর, যম, নিয়ম, অক্রোধ, অহিংসা, সত্য ও শুদ্ধি।[১৪] এখানে রাজা বেশ্বান্তর এই দশবিধগুণের মাধ্যমে প্রজাসাধারণের সুখ-সমৃদ্ধি ও কল্যাণের কথা চিন্তা করতেন। *'মহাউম্মার্গ জাতকে'* একজন রাজার নাম মহৌষধ বলে জানা যায়।[১৫] জাতকটিতে মহৌষধকে নীতিবান, সংযমী উদার ও মানবিক রাজা হিসেবে

অভিহিত করা হয়েছে। পালি বহির্ভূত সাহিত্যে প্রসিদ্ধ *'মিলিন্দ প্রশ্ন'* গ্রন্থে রাজা মহৌষধের আটাশ প্রকার গুণের কথা উল্লেখ রয়েছে।[১৬] যথা :

শূর (বীর, সাহসী), পাপ কাজে লজ্জা, পাপের প্রতি সংকোচ হওয়া, দলবদ্ধ, বহুমিত্রের অধিকারী, সহিষ্ণু, নীতিবান, সত্যবাদী, পুত-পবিত্র, ক্রোধহীন, অনভিমানী, ঈর্ষাহীন, বীর্যবান, পুণ্যসঞ্চয়ী, পরোপকারী, সকলকে নিয়ে আহারে অভ্যস্থ, বন্ধু বাৎসল, চঞ্চলহীন, সহজ-সরল, শঠতা নয়, অমায়াবী, বুদ্ধিমান, কীর্তিমান, বিদ্ধান, সর্বহিতৈষী, সর্বস্তরের প্রার্থিত, ধন-সম্পদের অধিকারী ও যশস্বী।

সারণি : ৩

রাজপদ অতি উত্তম ও সম্মানীয় পদ। সুতরাং পদটিতে সর্বজন শ্রদ্ধেয় উত্তম লোককেই আসীন করা কর্তব্য। অযোগ্য, অদক্ষ নিষ্ঠুর, ক্রোধী, অমানবিক, মিথ্যাবাদী, অপরের ক্ষতিকারী কাউকে রাজপদে বসানো উচিত নয়। কেননা, এই ধরনের ব্যক্তি এই পদে পদায়িত হলে রাজ্যের সর্বস্তরে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, অস্থিতিশীলতা বজায় থাকবে। সর্বক্ষণ উচ্ছৃঙ্খলতা, মারামারি, দলাদলি এবং হানাহানিসহ বিভিন্ন অপরাধে লিপ্ত থাকবে জনগণ। তাই গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে সুশাসক বা রাজা করা আবশ্যক।

সুশাসক মাত্রই গুণী, ন্যায়-পরায়ণ, প্রজাদরদী, মানবিক, উদার এবং ধার্মিক হবে। রাজ্য পরিচালনায় বর্তমানে যাকে সুশাসক বলা হয় বুদ্ধের শিক্ষা-দর্শনে এটি চক্রবর্তী রাজা/শাসক নামেই ব্যাপক পরিচিত। একজন সৎ ও ন্যায়-পরায়ণ প্রজাবান্ধব রাজা কিংবা শাসক সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার, জুলুম, অত্যাচার এবং বৈষম্য বিদূরিত করে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন। পাশাপাশি সম-অধিকার সুশাসনের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে সমুন্নত রেখে উন্নত, সুখী, সমৃদ্ধ সমাজবিনির্মাণে অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করেন। পালি বহির্ভূত সাহিত্যের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থের নাম *'মিলিন্দ প্রশ্ন'*। এই গ্রন্থের মাধ্যমে অযোগ্য, অমানবিক, অনুপযুক্ত এবং অযোগ্য ব্যক্তিকে রাজপদে না বসানোর কথা জানা যায়।[১৭] সুশাসন প্রতিষ্ঠা কিংবা রাজ্যের সর্বত্রে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার সুশাসকই দরকার যাঁর যোগ্যতা ও সুদক্ষ নেতৃত্বে দেশ, সমাজ এগিয়ে যাবে। সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং রাজ্যে শান্তি, শৃঙ্খলা, সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য মনের নিয়ন্ত্রণ খুবই দরকার। শাসকের মনে সংযম ব্যতীত কখনো সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে 'Living Dhamma' গ্রন্থে বর্ণিত Ajahn Chah-এর উক্তিটি খুবই স্মরণযোগ্য। এখানে বলেন :

> 'Having cleared away impurities the mind is free of worries... peaceful... peaceful, kind and virtuous. When the mind is radiant and has given up evil there is ease at all times. The serene, calm, tranquil and peaceful mind is the true epitome of human success. The trick is to have sati taking control and surprising the mind. Once the mind is unified with a new kind of awareness will arise. Sati watches over and takes care of the mind'.[১৮]

৪. সুশাসনের জন্য বুদ্ধের নৈতিক শিক্ষা

বুদ্ধের ভাবনা ও সত্ত্বার মধ্যে জাগতিক সত্ত্বগণের হিত-সুখ-কল্যাণের বিষয়সমূহ বারবার উন্মোচিত হয়েছে। যেগুলো ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা প্রদান করে সামগ্রিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত। ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সমতা, সংবেদনশীলতা, অধিকার, ক্ষমতায়ন এই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে হয় সুশাসন। আর সুশাসন শব্দটির সাথে অন্তর্নিহিতভাবে জড়িয়ে আছে অনেকগুলো বিষয়বস্তু ব্যক্তি, সভ্যতা, সমাজ, সংস্কৃতি, পরিবেশ প্রভৃতি। সুশাসনের জন্য বুদ্ধের শিক্ষা-দর্শন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বুদ্ধের শিক্ষা মূলত নৈতিকতা, ন্যায়বিচার, সহানুভূতি এবং জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, যা সুশাসনের মূলভিত্তি হিসেবে কাজ করে। নিচে বুদ্ধের নৈতিক শিক্ষার কিছু মৌলিক দিক এবং সুশাসনে এর গুরুত্ব আলোচনা করা হলো।

৪.১. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বুদ্ধের পঞ্চশীল

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সর্বাগ্রে আসে ব্যক্তি যার মাধমে সমাজে সুশাসন পরিচালিত হয়। ফলে ব্যক্তি জীবনের শৃঙ্খলা, ন্যায়-পরায়ণতা ও নীতি-নৈতিকতা অপরিহার্য। বৌদ্ধধর্মে পঞ্চশীল হলো সৎভাবে জীবনযাপনের মূলভিত্তিপঞ্চশীলের নীতিগুলো[১৯] হলো:

চিত্র ২ : পঞ্চশীল ও সুশাসন

উপরি-উক্ত নীতিগুলো সমাজে শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে, যা সুশাসনের জন্য অপরিহার্য। একই সাথে নীতিগুলো শৃঙ্খলিত, নির্মোহ, নির্লোভ, ন্যায়-পরায়ণতার সাথে জীবনযাপন না মানুষ মহান করে তোলে। বুদ্ধ ব্যক্তির সততা, সহিষ্ণুতা, আত্মবিশ্বাস, ধৈর্যশীলতা, স্বচ্ছতা, প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা, সত্যবাদীতা, উদারতা, নৈতিকতা, ন্যায়বিচার, আত্ম-নিয়ন্ত্রণ, আত্ম-শৃঙ্খলা সুনিশ্চিতের জন্য দেশনা করে গেছেন। এটি ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে সমভাবে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সাহায্য করে। কারণ নীতিগুলো রাষ্ট্রীয় নেতা ও নাগরিকদের মধ্যে নৈতিকতা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে, যা একটি আদর্শ রাষ্ট্র বিনির্মাণের জন্য অপরিসীম ভূমিকা পালন করে। তাঁর শিক্ষায় পঞ্চশীল হলো নৈতিক জীবনগঠনের এক মহৌষধ। এটি ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে শান্তি, শৃঙ্খলা, শ্রদ্ধা-সম্মান এবং ন্যায়-পরায়ণতা বজায় রাখতে সাহায্য করে যা সমাজকে সর্বতোভাবে অরাজকতা থেকে মুক্ত রাখে। শুধু তাই নয়, উপরি-উক্ত পাঁচটি নীতিমালা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে সুন্দর পুত-পবিত্র রাখতে বেশ কার্যকর ভূমিকা পালন করে। পঞ্চশীলের গুরুত্ব সম্পর্কে Sunthorn এর মন্তব্যটি উপস্থাপন করছি। তিনি বলেন

> "These precepts are not commandments enforced on us, but are on the other hand, the ethical code that we willingly accept to perceive out of clear thoughtful and firm conviction that they are moral for ourselves as well as for our humanity. Our life would be a really happy and our society would become a much harmless more peaceful place to live in if these precepts are perceived in earnest."[২০]

৪.১.১. প্রাণিহত্যা না করা (পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি)

এই নীতি সকল প্রকার প্রাণিহত্যা করা থেকে বিরত থাকার শিক্ষা প্রদান করে। হত্যা মহাপাপ যা অহিংসার নীতির প্রধান শর্তপূরণে মূল শক্তিরূপে কাজ করে। *'খুদ্দক নিকায়'* এর অন্তর্গত *'ধর্মপদ'* গ্রন্থে এ বিষয়ে উক্ত হয়েছে :

ন তেন অরিযো হোতি যেন পানানি হিংসতি
অহিংস সব্বপাণানং অরিযো'তি পবুচ্চতি।[২১]

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি প্রাণী হিংসা করে, সে কখনো আর্য (মহৎ, নৈতিক ও জ্ঞানী) ব্যক্তি হতে পারে না। যিনি সর্বজীবের প্রতি হিংসা ত্যাগ করে মৈত্রীভাবাপন্ন হয়েছেন তিনিই আর্য নামে অভিহিত হন।

এতে সকল জীবের প্রতি কোমলতা, সহানুভূতি, উদারতা, মানবতা, স্নেহ, সহনশীলতা ও সমবেদনা প্রকাশ করে। এটি নৈতিকশিক্ষার একটি প্রধান সোপান হিসেবে বিবেচিত হয়। এটি নৈতিকতার পাশাপাশি সকল জীবের প্রতি শ্রদ্ধার প্রদর্শনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তিকে অহিংসা, কর্মফল, মৈত্রী করুণা অনুশীলনের সাহায্য করে। এই নীতি যথাযথ পালনের মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের মনে শান্তি ও সন্তুষ্টি লাভ করে। একই সাথে এটি সহিংসতা ও ক্রোধ কমাতে সাহায্য করে। বুদ্ধের উপদেশ প্রাণিহত্যা না করার পাশাপাশি সকল প্রাণীর প্রতি মমত্ববোধ জাগ্রত করা। কেননা বুদ্ধের শিক্ষা অনুসারে, যে ব্যক্তি কার্যকারণের নিয়মে বিশ্বাস করে, সে মানুষ, প্রাণী, এমনকি উদ্ভিদ

বা জগতের যেকোন ক্ষতি না করার ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি থাকবে, কারণ তাদের ক্ষতি করা একই সাথে নিজের ক্ষতি করার সমান। এ প্রসঙ্গে *'দীর্ঘ নিকায়'* গ্রন্থের *'মহাসুদর্শন সূত্র'*-এ রাজা মহাসুদর্শন বলেছেন, প্রাণিহত্যা করবে না।[২২] সামাজিক দিক থেকে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে এটি বিশেষভাবে সাহায্য করে। এটি সমাজের অবক্ষয় ও সংঘাত কমিয়ে একটি আদর্শ সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখে। পঞ্চশীলের প্রথম নীতি প্রাণিহত্যা না করে মানুষের পাশাপাশি প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতিও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে শিক্ষা দেয়। এটি পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রাণীজগতের প্রতি দায়িত্ববোধ বাড়ায়।

৪.১.২. চুরি না করা (অদিন্নাদানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি)

অন্যের জিনিসপত্র চুরি না করা, জালিয়াতি বা প্রতারণা থেকে দূরে থাকা, এমনকি অন্যের অনুমতি ব্যতিত কোন প্রকার জিনিস গ্রহণ বা ব্যবহার না করা, অন্যের সম্পদ অবৈধভাবে গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। পঞ্চশীলের দ্বিতীয় নীতি সততা, ন্যায়পরায়ণতা এবং অন্যের সম্পদের প্রতি শ্রদ্ধার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধ দ্বিতীয় পারাজিকায়[২৩] বলেছেন : 'যো পন ভিক্খু গামা বা অরঞ্ঞা বা অদিন্নং থেয্য সঙ্খাতং আদিযেয্য, যথারূপে অদিন্নাদানে রাজানো চোরং গহেত্বা হনেয্যুং বা বন্ধেয্যুং বা পব্বজেয্যু বা চোরোসি বালোসি মূলহোসি থেনোসীতি, তথারূপং ভিক্খু অদিন্নং আদিযমানো অযম্পি পারজিকো হোতি অসংবাসো'তি'। অর্থাৎ, যদি কোন ভিক্ষু গ্রাম বা অরণ্য হতে অপরের অধিকারভুক্ত কোন বস্তু চুরির করার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করেন-চুরির অপরাধগ্রস্থকে রাজাগন যেমন দণ্ড প্রদান করেন, সেরকম কোন ভিক্ষু পরদ্রব্যাদি গ্রহণ করলে ভিক্ষু বুদ্ধের শাসন হতে পরাজিত হন। এটি চারটি গুরুতর অপরাধের মধ্যে একটি যার ফলে সংঘ থেকে বহিঃষ্কার করে দেওয়া হয়। এই নীতির গভীরতা ব্যাপক। এখানে চুরি সংক্রান্ত ত্রিশটি স্থানের[২৪] উল্লেখ রয়েছে যা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

ক্রমিক	স্থান	বিশ্লেষণ
১	ভূমিস্থ বা মাটির নিচে	মাটির নিচে রক্ষিত সম্পদ চুরি করা। যেমন : পুরনো মাটির পাত্রে রাখা ধন চুরি।
২	স্থলস্থ বা স্থলে	সাধারণভাবে ভূমিতে রাখা জিনিস চুরি (ফসল, পাথর, ইট ইত্যাদি)।
৩	আকাশস্থ বা বায়ুতে	আকাশ/উচ্চস্থানে রাখা বস্তু (পাখির বাসা থেকে ডিম চুরি, ড্রোন দিয়ে চুরি)।
৪	শূণ্যস্থ বা উন্মুক্ত স্থানে	প্রকাশ্য স্থানে রাখা জিনিস হরণ। পড়ে থাকা দ্রব্য চুরি
৫	উদকস্থ বা জলে	নদী, সমুদ্র বা পুকুরে থাকা মাছ, মুক্তা, নৌকা ইত্যাদি চুরি।
৬	নাবাস্থ বা নৌকায়	নৌকায় রাখা মালামাল বা যাত্রীর জিনিসপত্র চুরি।
৭	যানস্থ বা যান-বাহনে	গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি ইত্যাদিতে রাখা দ্রব্য চুরি।

৮	ভারস্থ বা ভারে	বহনকারী ব্যক্তি বা পশুর (ঘোড়া, গাধা) পিঠে রাখা মাল চুরি।
৯	আরামস্থ বা আরাম বাগানে	বৌদ্ধ বিহার বা রাজপ্রাসাদের বাগানের ফুল-ফল চুরি।
১০	বিহারস্থ বা বিহারে	ভিক্ষুদের কুটির বা মন্দিরের জিনিসপত্র চুরি।
১১	ক্ষেত্রস্থ বা ক্ষেত্রে	কৃষিকাজের জমির ফসল বা সরঞ্জাম চুরি।
১২	বাস্তুস্থ বা বাস্তু বা ভিটায়	বাড়ির আঙ্গিনা বা ভিটামাটি জোরপূর্বক দখল করা।
১৩	গ্রামস্থ বা গ্রামে	গ্রামসমূহের সাধারণ সম্পদ (কূপ, পথের আলো) চুরি।
১৪	অরণ্যস্থ বা অরণ্যে	বনজ সম্পদ (কাঠ, ফলমূল, বন্যপ্রাণী) অবৈধভাবে সংগ্রহ।
১৫	উদক বা জল	পুকুর, কুয়ার জল বা মাছ চুরি।
১৬	দণ্ডকাষ্ঠ বা দণ্ডকাষ্ঠাদি	অন্যের কাঠ, বাঁশ বা নির্মাণ সামগ্রী চুরি।
১৭	বনস্পতি বা বৃক্ষ	গাছের ফল, পাতা, কাঠ চুরি করা।
১৮	হরণক বা হরণকৃত বস্তুতে	ইতিমধ্যে চুরি হওয়া জিনিস পুনরায় চুরি (ডাকাতের মাল লুট)।
১৯	উপনিধি বা বন্ধকী দ্রব্যে	বন্ধক রাখা জিনিস অসৎভাবে আত্মসাৎ করা।
২০	শুল্কঘাত বা সীমান্ত শুল্ক	কর ফাঁকি দিয়ে পণ্য আনা-নেওয়া (চোরাচালান)।
২১	প্রাণ বা প্রাণী	গৃহপালিত বা বন্য প্রাণী চুরি (গরু, মুরগি, হরিণ)।
২২	অপদ বা পদহীনে	সাপ, কেঁচো ইত্যাদি রূপান্তরিত প্রাণীর সম্পদ হরণ। (প্রাচীন ব্যাখ্যা)
২৩	দ্বিপদী	মানুষ বা পাখির সম্পদ চুরি (মানুষের গয়না, পাখির ডিম)।
২৪	চতুষ্পদী	গরু, ছাগল, হাতি ইত্যাদির সাথে জড়িত চুরি।
২৫	বহুপদী	পোকামাকড় বা কাঁকড়ার আবাস নষ্ট করে চুরি।
২৬	অবচরক বা গুপ্তচরবৃত্তি	গোপন তথ্য চুরি করে শত্রুকে প্রদান করা।
২৭	ওণিরক্খ বা দ্রব্যাদি রাখার বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি	আমানতকারীর জিনিস আত্মসাৎ করা বিশ্বাস ভঙ্গ করা।
২৮	গংবিদাবহরক বা চুরি করার মানসে পরামর্শকারী	চুরির পরিকল্পনায় সহায়তা করা।
২৯	সংকেত কর্ম	ইশারা বা সংকেত দিয়ে চুরি করতে সাহায্য করা।
৩০	নিমিত্ত কর্ম	চুরির সুযোগ তৈরি করা (তালা ভাঙা, পাহারা দেওয়া)

সারণি : ৪

সততা একটি মৌলিক নৈতিক মূল্যবোধ না, শুধু নৈতিক শক্তি। চুরি না করার মাধ্যমে ব্যক্তি সততা ও ন্যায়পরায়ণতার চর্চা করে, যা তার চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। অন্যের অধিকার সম্পর্কে ব্যক্তিকে সচেতন করে। পাশাপাশি অন্যের সম্পদ ও অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। অন্যের সম্পদ অবৈধভাবে গ্রহণ করা তার অধিকার লঙ্ঘনের শামিল। এই নীতি ব্যক্তি দুঃখ, লোভ ও অস্থিরতা কমাতে সাহায্য করে। এটি সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সাহায্য করে। সমাজে আস্থা ও ন্যায়বিচার সুপ্রতিষ্ঠা করে।

৪.১.৩. অবৈধ মিথ্যা কামাচার না করা (কামেসু মিচ্ছাচারা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি)

এটি পারিবারিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সাহায্য করে। বিবাহবহির্ভূত মিথ্যা সম্পর্ক থেকে দূরে থাকা, যৌন নৈতিকতা বজায় রাখা, সম্পর্কে স্থাপনে অন্যের সম্মতি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা আবশ্যক। বুদ্ধ বলেছেন,

চত্তারি ঠানানি নরো পমত্তো, আপজ্জতি পরদারূপ সেবী;
অপুঞ্ঞ লাভং ন নিকাম সেয্য, নিন্দং ততিযং নিরযং চতুত্থং।[২৫]

অর্থাৎ, পরদার গমনকারী ব্যক্তির প্রথমত অমঙ্গল, দ্বিতীয়ত অনিদ্রা, তৃতীয়ত নিন্দা, এবং চতুর্থত নরক গমন হয়। এটি শুধুমাত্র নৈতিকতা নয় বরং পারিবারিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতার ভারসাম্য বজায় রাখা এবং শৃঙ্খলিত সমাজবির্নিমাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। নীতিটিকে পারিবারিক জীবনে দৃঢ় বন্ধন বজায় রাখতে সাহায্য করে। সমাজজীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করে। শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপনে উৎসাহিত করে। বর্তমান সময়ে পারিবারিক বিচ্ছেদ ও অশান্তির একটি প্রধান কারণ হলো অবৈধ সম্পর্ক ও নিয়মবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পরা। যার নেতিবাচক প্রভাব পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি সন্তানদের উপর পড়ে। এতে ছোট থেকে নেতিবাচক পরিবেশে বড় হয়ে নিজে সংকীর্ণতায় ভোগে।

৪.১.৪. মিথ্যা কথা না বলা (মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি)

এটি সত্যবাদিতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার নীতি। সকল প্রকার মিথ্যা হোক তা ছোট বড়, কানকথা, গুজব বা প্রতারণামূলক কথা, অন্যের ক্ষতি করার জন্য মিথ্যা কথা প্রভৃতি বিষয়ে ব্যক্তিকে সংযত রাখা। মিথ্যাভাষণকে বর্তমান সমাজের একটি প্রতারণার ফাঁদও বলা যায়। যার দ্বারা মানুষ মানুষকে ব্যাপকভাবে বঞ্চনা করে। প্রতারিত করে এটি অনলাইন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে শুরু করে ব্যক্তি তথা সমাজের প্রতিটি পর্যায়ে মারাত্মক ব্যাধির আকার ধারণ করেছে। যা কিনা সত্য প্রচার প্রকাশের অন্তরায়। এই প্রসঙ্গে *'সুত্ত নিপাত'* গ্রন্থে উল্লেখ আছে:

সভগ্গতো বা পরিসগ্গতো বা, একস্স বেকো ন মুসা ভণেয্য;
ন ভাণযে ভণতং নানুজঞ্ঞা, সব্বং অভূতং পরিবজ্জযেয্য।[২৬]

অর্থাৎ, সভাগৃহ বা পরিষদ গৃহে কেউ কারও সাথে মিথ্যা বাক্য ভাষণ করবে না, কেউ কাউকে মিথ্যা কথা বলতে উৎসাহিত করবে না, মিথ্যার অনুমোদন করবে না। সকল প্রকার মিথ্যা পরিত্যাগ করবে।

এই নীতির গভীরতম দিকটি অন্যের আস্থা ভঙ্গ করা থেকে সচেতনতা সৃষ্টি করে ফলে সম্পর্কের মধ্যে বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়। *'অঙ্গুত্তর নিকায়'* গ্রন্থের 'সুচরিত সূত্র'[২৭] এবং *'সুত্ত নিপাত'* গ্রন্থের 'সুভাষিত সূত্রে'[২৮] চার প্রকার বাক্যের কথা উল্লেখ রয়েছে। এই চার প্রকার বাক্য পারস্পরিক শান্তি-সম্প্রীতি সদ্ভাব বৃদ্ধিতে বেশ সহায়তা করে। এগুলো হলো:

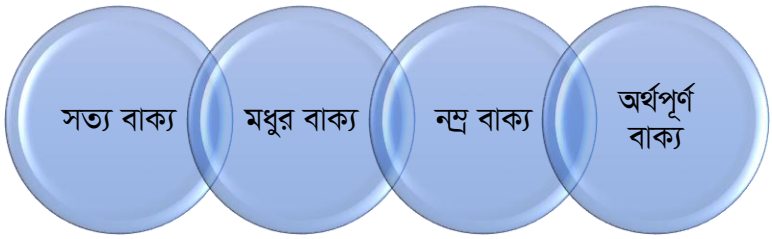

চিত্র ৩ : শান্তি-সম্প্রীতি জন্য বাক্য

বুদ্ধ নির্দেশিত উপরি-উক্ত চার প্রকার বাক্য শেখায় কীভাবে সংযত, ন্যায়-পরায়ণ, কল্যাণকর কর্ম সম্পাদন করা যায়, যা ব্যক্তি যাপিতজীবনে পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অসামান্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

৪.১.৫. নেশা করা থেকে বিরত থাকা (সুরামেরয মজ্জপমাদট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি)

এটি সচেতনতা ও জ্ঞানের নীতি, যা ব্যক্তিকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। সকল প্রকার নেশাজাতীয় মাদক দ্রব্য সেবন না করা। এরূপ মাধ্যমে ব্যক্তি সচেতনতা ও জ্ঞানের চর্চা করে, যা তার চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। এই নীতি জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার উপর গুরুত্ব দেয়। নেশা করা ব্যক্তির জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এবং তাকে ভুল পথে পরিচালিত করতে পারে।

সর্বোপরি, বলা যায় যে এই নীতিগুলো শুধুমাত্র ধর্মীয় অনুশাসন নয়, এর প্রত্যেকটি সার্বজনীন নৈতিক মূল্যবোধ রয়েছে, যা সকলের জন্য আজও প্রযোজ্য। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে নীতিগুলোর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। এর বিপরীতে রয়েছে ধ্বংস এ প্রসঙ্গে বুদ্ধ বলেছেন,

যো পাণোমতিপাতেতি মুসাবাদঞ্চ ভাসতি,
লোকে অদিন্নং আদিযতি পরনারঞ্চ গচ্ছতি।
সুরামেরযপানঞ্চ যো নরো অনুযুঞ্জতি,
ইধেহবমেসো লোকস্মিং মূলং খনতি অত্তনো।[২৯]

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি প্রাণীহত্যা করে, মিথ্যাকথা বলে, চুরি করে, পরদারগমন করে, সুরা, মদ প্রভৃতি মাদকদ্রব্য সেবন করে সে ইহ জগতে নিজেই নিজের ধ্বংসের কারণ হয়।

কেবল মাত্র যদি এই পাঁচটি নীতি সমাজে সুদৃঢ়তার সাথে অনুশীলন করা যায় তবে সমাজজীবনে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি বিরাজ করবে।

দুঃশীল ব্যক্তি ও শীলবান ব্যক্তির অনর্থ (মন্দ) ও আনিশংস (ভালো) সম্পর্কে পাঁচটি[৩০] বিধান নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ক্রমিক	দুঃশীল ব্যক্তির পাঁচটি অনর্থ (মন্দ)	শীলবান ব্যক্তির পাঁচটি আনিশংস (ভালো)
প্রথমত	মহাভোগ সম্পত্তি থাকলেও প্রমাদ বশতঃ তা বিনাশ হয়ে যায়। এমনকি ব্যবসা বানিজ্যে কৃষি কর্মে উন্নতি করতে পারেনা, মূলধন পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যায়।	অপ্রমত্ততার দ্বারা মহাভোগসম্পত্তি লাভ করে, ব্যবসা বানিজ্য, কৃষি যে কাজ করুক না কেন তাতে উন্নতি হয়ে থাকে।
দ্বিতীয়ত	পাপ, অযশ, অকীর্তি সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।	কল্যাণ কীর্তি যশ, সুনাম সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।
তৃতীয়ত	ব্যক্তি ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি ও শ্রমণ এই চার প্রকারের যে কোন সভা হোক না কেন নির্ভয়ে যেতে পাওে না।	ব্যক্তি ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি ও শ্রমণ এই চার প্রকারের যে কোন সভা হোক না কেন নিঃসঙ্কোচে যেতে পারে।
চতুর্থত	মৃত্যুকালে মুর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়ে অজ্ঞানে দেহ ত্যাগ করে।	মৃত্যুকালে স্বজ্ঞানে দেহ ত্যাগ করে।
পঞ্চমত	মৃত্যুর পর অপায় (নরক) দুর্গতি অধঃপাত নিরয় প্রাপ্ত হয়।	মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গ লোকে উৎপন্ন হয়।

সারণি : ৫

পঞ্চশীল বুদ্ধের শিক্ষা-দর্শনের একটি মৌলিক নৈতিক আচরণবিধি যা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে শান্তি, পারস্পরিক সম্পর্ক, শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে সাহায্য করে। সমাজে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ভিত্তি তৈরি করে। এটি ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ন্যায়পরায়ণতা, সততা ও দায়িত্ববোধের চর্চা করে। পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ককে মজবুত করে। সমাজে অপরাধ ও নেতিবাচক কর্মকাণ্ড হ্রাস করে। সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে। সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখে। সুস্থ, সুশৃঙ্খল ও উন্নত সমাজগঠনে পঞ্চশীল অপরিহার্য ভূমিকা রাখে। তাই সমাজে পঞ্চশীলের নীতিগুলো সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো একান্ত প্রয়োজন। সুশাসন প্রতিষ্ঠা হলে সামাজিক সম্প্রীতি, সদ্ভাব ও শান্তি আসবে। এ বিষয়ে নিচের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য:

> 'Practicing the Five Precepts —refraining from killing, stealing, sexual misconduct, lying, and consuming intoxicants —virtuously helps the mind become peaceful and reduces convicts and suffering'.[৩১]

৪.২. সুশাসন ও বুদ্ধ নির্দেশিত দশবিধ রাজধর্ম

বুদ্ধের শিক্ষায় রাজা বা শাসকের জন্য দশটি নৈতিক মূল্যবান গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা বৌদ্ধসাহিত্যে বা বৌদ্ধধর্মে "দশ রাজধর্ম" নামে পরিচিত। ধর্মীয়জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন এর সর্বত্র এই নীতিসমূহ শুদ্ধতম সুন্দর জীবন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দশবিধ গুণগুলো[৩২] হলো:

চিত্র ৪ : দশবিধ রাজধর্ম

উপরি-উক্ত দশবিধ গুণগুলো শাসকের চরিত্র গঠন ও রাষ্ট্র পরিচালনায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক স্থিতিশীলতায় সহায়ক হিসেবে কাজ করে। ব্যক্তি বিশুদ্ধির ক্ষেত্রেও এই নীতিগুলো বিশেষ ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ, এই গুণগুলো ব্যক্তির নৈতিক চরিত্র গঠন করার পাশাপাশি রাষ্ট্র পরিচালনায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। নিম্নে দশটি গুণের বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

৪.২.১. দান

'দান' উদারতা এবং নিঃস্বার্থপর মানবিক গুণাবলির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট। উদার বলতে ব্যক্তির মহৎ মনের গুণ, দানশীলতা, সংকীর্ণতাশূন্যর পরিচায়ক। এটি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সম্পর্ককে শক্তিশালী করে না, বরং সামাজিক সম্প্রীতিও বজায় রাখে। উদার হওয়ার অর্থ হলো অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া, ভালোবাসা তাদের প্রয়োজন ও অনুভূতিকে মূল্য দেওয়া। স্বার্থপরতা এড়ানো মানে নিজের সুবিধার চেয়ে অন্যের মঙ্গলকে প্রাধান্য দেওয়া। অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া অন্যের অবস্থা ও অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করা। তাদের সমস্যা বা সংগ্রামকে গুরুত্ব

দেওয়া। অন্যের সাথে জিনিস, সময় বা জ্ঞান ভাগাভাগি নেওয়া। ব্যক্তির আত্ম-সচেতনতা, মানসিক জ্ঞান, বোধশক্তি জাগ্রত হয় তখন সমস্ত মন্দচিন্তা, মন্দ ভাবনা দূর করে আত্ম সমৃদ্ধির মাধ্যমে জনকল্যাণে, সমাজের কাজে ব্রতী হতে পারে। এটি সম্পর্ককে গভীর করে এবং ঐক্য গঠনে সাহায্য করে। ব্যক্তির অহংবোধ নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যক্তির ইচ্ছা ও প্রয়োজনকে অন্যের চেয়ে বেশি গুরুত্ব না দেওয়ার চেষ্টা। ধৈর্য্য ও সহনশীলতাও উদারতার লক্ষণ। যা অন্যের ভুল বা ত্রুটিগুলো ক্ষমা করতে শিখায়। অন্যের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত না হয়ে তাদের জন্য আনন্দিত হওয়া। এটি স্বার্থপরতা কমাতে সাহায্য করে। কোনো প্রতিদান বা স্বীকৃতির আশা না করে অন্যের সাহায্যে এগিয়ে আসা। এর ফলে রাষ্ট্রের সমস্যা লাঘবের মাধ্যমে জনকল্যাণময় সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্রের উন্মেষ ঘটবে। কেননা ব্যক্তি বিশুদ্ধ হলে পরিবার বিশুদ্ধ হবে এর প্রভাব সমাজ পাবে, সমাজ থেকে রাষ্ট্রে ও বহি:বিশ্বে বিশ্বায়ন সৃষ্টি করবে। বুদ্ধ '*ধম্মপদ*'-এর '*অত্তবর্গে*' বলেছেন :

অত্তানবেম পঠমং পতিরূপে নিবেসযে,
অথহঞ্ঞমনুসাসেয্য ন কিলিস্সেয্য পণ্ডিতো।[৩৩]

অর্থাৎ, নিজেকে প্রথমে মঙ্গলজনক বা কল্যাণকর কাজে আত্মনিয়োগ করবে। অতঃপর অপরকে উপদেশ দেবে। তবেই জ্ঞানী ব্যক্তি দুঃখ পাবে না।

কেননা, প্রথমে নিজে সদগুণে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে অপরকে তারপর শাসন অনুশাসন করা উচিত। এতে ব্যক্তি সবার প্রশংসাভাজন হয়ে উঠে। সর্বত্রে পূজিত হোক। বুদ্ধ আরও বলেছেন :

অত্তানঞ্চে তথা কযিরা যথঞ্ঞমনুসাসতি,
সুদন্তো বত দম্মেথ, অত্তাহি কির দুদ্দমো।[৩৪]

অর্থাৎ, নিজে সংযত হয়ে অপরকে সংযত হওয়ার জন্য অনুশাসন করবে। আত্ম-শুদ্ধি হলে পরকে দমন করা যায়। বস্তুত আত্মই দুর্দমনীয়।

এটির অনুশীলনে সমাজে আসবে স্থিতিশীলতা, সমৃদ্ধি, উন্নয়ন, অগ্রগতি, ইতিবাচক পরিবর্তন। যার প্রভাব পড়বে সমাজের অর্থনীতি, পরিবেশ, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, শিক্ষাগত, প্রাকৃতিক পরিবেশ। এখানে জন হ্যামিল্টন হলওয়েলের অভিমতটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তিনি বলেন :

> 'Liberalism was a product of the climate of opinion that emerged at the time of the Renaissance and the Reformation. As the political expression of the new individualism, it was a political declaration of faith in the autonomy of human reason and the essential goodness of man. Both a mode of thought and a way of life it reflected the political, social, religious, and economic aspirations of the rising commercial class.'[৩৫]

যা ব্যক্তিকে আরও মানবিক এবং সংবেদনশীল করে তোলবে। আবার প্রয়োজনে জনগণের কল্যাণে সম্পদ বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত থাকবেন। দানের উদার মনোভাব এর মাধ্যমে শাসক জনগণের প্রতি তার দায়িত্ব ও ভালোবাসা প্রকাশ করেন। বুদ্ধের মতে, দান শুধু সম্পদ বিতরণ নয়, বরং এটি ন্যায়বিচার ও সমতা প্রতিষ্ঠার একটি মাধ্যম। দান সামাজিক দায়বদ্ধতা ও সম্প্রীতির প্রতীক। সুশাসনের জন্য নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও দায়বদ্ধতা অপরিহার্য।

৪.২.২. শীল

'শীল' শব্দের খুবই অর্থবোধক। *'পালি-বাংলা অভিধান'* গ্রন্থে শীল-এর অর্থ করা হয়েছে এরূপ: স্বভাব, চরিত্র, আচার-আচরণ ইত্যাদি।[৩৬] এখানে 'শীল' সদাচারণকে বোঝায়। *'শীলমীমাংসা জাতক'* -এ জাতি-গোত্র, কুল প্রভৃতি অতি তুচ্ছ এবং শীলকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে উপস্থাপন করা হয়েছে।[৩৭] ব্যক্তি তথা শাসককে নৈতিক চরিত্রবান হতে হবে। তিনি সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও নৈতিক মূল্যবোধের অধিকারী হবেন। শীল বা নৈতিকতা শাসকের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক জীবনের ভিত্তি যা আত্মসংযম ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। শীলের অন্তর্নিহিত স্বরূপ সম্পর্কে উক্ত হয়েছে :

> 'Sīla is a guide, a approach of anchoring yourself in refraining fron unkillful activities with your body, speech both in regard to yourself and to the other beings around you.'[38]

নৈতিক চারিত্রিক গুণাবলি উন্নত করা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি ব্যক্তিকে সৎ, দায়িত্বশীল এবং সম্মানিত হিসেবে গড়ে তোলে। উন্নত নৈতিক চারিত্রিক গুণাবলি শীল অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। কায়িক, বাচনিক, মানসিক সংযমতা পালন করাই শীল। বুদ্ধ বলেছেন,

সব্ব পাপস্স অকরণং, কুসলস্স উপসম্পদা,
সচিত্তপরিযোদপনং, এতং বুদ্ধান সাসনং।[৩৯]

অর্থাৎ, সর্বপ্রকার পাপ থেকে বিরতি, কুশল কর্মের পূর্ণতা সাধন এবং নিজ চিত্তকে বিশুদ্ধি সাধন এটাই বুদ্ধগনের উপদেশ।

কুশল কর্মের ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে বুদ্ধ দশটি কর্মপথের নিদের্শনা প্রদান করা হয়েছে। এগুলো মেনে চলা সকলের কর্তব্য। সেগুলো হলো:

কুশল হলো প্রাণিহত্যা হতে বিরত, অদত্তগ্রহণ হতে বিরত, ব্যভিচার হতে বিরত, মুষাবাদ হতে বিরত, পিশুন বাক্য, পরুষ, ও সম্প্রলাপ হতে বিরত বাক্য, অনভিধ্যা কুশল, অব্যাপাদ কুশল সম্যক দৃষ্টি কুশল। কুশল-মূল অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ।"[৪০] এই কুশল কর্মগুলো কায়িক, বাচনিক ও মানসিক পর্যায়ে অনুশীলন করতে হয়।

কায়িক কুশল কর্মপথ	বাচনিক কুশল কর্মপথ	মানসিক কুশল কর্মপথ
প্রাণীহত্যা না করা	মিথ্যা বাক্য না বলা	পরের সম্পত্তিতে লোভ ও তা নিজের আয়ত্তে আনার চেষ্টা না করা
চৌর্যচিত্তে কোনো বস্তু গ্রহণ না করা	পিশুন/কর্কশ বাক্য না বলা	পরের প্রতি হিংসা, ক্রোধ অর্থাৎ, অন্যের অনিষ্টচিন্তা না করা
মিথ্যা কামাচার/ব্যভিচার না করা	পরুষবাক্য না বলা	ভ্রান্ত ধারণা থেকে বিরত থাকা।
	সম্প্রলাপ/নিরর্থক বাক্য না করা	

সারণি : ৬

সব সময় সত্য কথা বলা এবং সৎভাবে কাজ করা। প্রতারণা বা মিথ্যা এড়িয়ে চলা। নিজের ও অন্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা। দায়িত্ববোধ থেকে নিজের ও অন্যের কাজের জন্য দায়িত্ব নেয়। ভুল স্বীকার করা এবং তা সংশোধনের চেষ্টা করা। অন্যের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করা। ন্যায়পরায়ণতা সবাইকে সমানভাবে মূল্য দেওয়া। অন্যায় বা পক্ষপাতিত্ব এড়িয়ে চলা। সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। সহানুভূতি ও সমবেদনা অন্যের অনুভূতি ও অবস্থা বোঝার চেষ্টা করা। অন্যের দুঃখ-কষ্টে পাশে থাকা। নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করা। শৃঙ্খলা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ নিজের ইচ্ছা ও আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করা সময়ানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা। লোভ বা প্রলোভন এড়িয়ে চলা। অন্যের মতামতকে শ্রদ্ধা ও অধিকারকে সম্মান করা। বড়দের শ্রদ্ধা এবং ছোটদের স্নেহ করা। সবাইকে সমানভাবে মূল্য দেওয়া। ধৈর্য্য ও সহনশীলতা সহকারে সমস্যার সমাধান করা। অন্যের ভুল বা ত্রুটিগুলো ক্ষমা করতে শিখা। ভিন্ন মত ও বিশ্বাসকে গুরুত্ব দেওয়া। নিঃস্বার্থ ভাবে অন্যের কল্যাণে নিজের সুবিধা ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকা। সমাজ ও পরিবারের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করা। সাহস ও ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানো অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা। ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানোর সাহস রাখা। ভয় বা চাপের কাছে নতি স্বীকার না করা। আত্মবিশ্লেষণ ও উন্নতির জন্য ব্যক্তিকে ভুল চিহ্নিত করে সেগুলো সংশোধনের চেষ্টা করা। নিয়মিত নিজেকে মূল্যায়ন করা এবং উন্নতির জন্য কাজ করা। পরোপকার অন্যের সাহায্যে এগিয়ে আসা। সমাজের জন্য কিছু করার মানসিকতা রাখা। বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করতে নিজের সাফল্য বা যোগ্যতা নিয়ে অহংকার না করা। বিনয়ী ও নম্র আচরণ করা।

বুদ্ধ নৈতিক পুত-পবিত্র সুন্দর জীবনযাপনে উৎসাহিত করেন। এক্ষেত্রে তাঁর প্রদর্শিত শীল পরিপালনের মাধ্যমে সমাজে সুখ-শান্তিতে বসবাস করা যায়। মন বা চিত্ত স্থির থাকে। সর্বদা সততার সাথে সকল কর্ম সম্পাদন করা যায়।[৪১] উন্নত নৈতিক চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এটি সময়, সাধনা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অর্জিত হয়। এই গুণাবলি ব্যক্তিগত জীবনে সুখ ও শান্তি আনে এবং সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন সৃষ্টি করে।

৪.২.৩. পরিচাগ

'পরি' ও 'চাগ' দুটি অর্থবোধক শব্দের সমন্বয়ে 'পরিচাগ' শব্দটি গঠিত। এখানে 'পরি' একটি উপসর্গ আর চাগ মানে ত্যাগ করাকে বোঝায়। অর্থাৎ, 'পরিচাগ' বলতে বিশেষভাবে পরিত্যাগ করাকে বোঝায়। Butr-Indr এটিকে self-sacrifice for mutual advantage বলে অভিহিত করেন।[৪২] ব্যক্তি বা শাসককে ব্যক্তিগত সুখ ত্যাগ করে জনকল্যাণে নিবেদিত হতে হবে। তিনি নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে জনগণের সুখ-শান্তি ও উন্নতির জন্য কাজ করবেন। এই ত্যাগের মাধ্যমে শাসক জনগণের আস্থা ও সম্মান অর্জন করেন। জনগণের হিত-সুখ-মঙ্গল প্রতিবিধানের জন্য আত্মসুখ বিসর্জন দেওয়া একটি মহান ও নিঃস্বার্থ মানসিকতার প্রকাশ। এটি সমাজসেবা, নেতৃত্ব এবং মানবিকতার উচ্চতম স্তর। এই দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তিকে সমাজে একজন আদর্শ ও অনুপ্রেরণাদায়ক ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলে। জনগণের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য কিছু মূলনীতি ও গুণাবলি প্রয়োজন।

নিঃস্বার্থতা অন্যের সুখ ও মঙ্গলের জন্য নিজের সুখ ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। ব্যক্তিগত লাভ বা স্বার্থের চেয়ে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণকে প্রাধান্য দেওয়া বাঞ্চনীয়। বুদ্ধ *'প্রকীর্ণ সূত্রে'* বলেছেন:

মত্তা সুখ পরিচ্চাগা পস্সে চ বিপুলং সুখং,
চজে মত্তা সুখং ধীরো সম্পস্সং বিপুলং সুখং।[৪৩]

অর্থাৎ, স্বল্প সুখ ত্যাগের ফলে যদি বিপুল সুখের সম্ভবনা লক্ষ্য করা যায়, তবে জ্ঞানী ব্যক্তি সেই বিপুল সুখের সম্ভাব্যতা দেখে সামান্যসুখ পরিত্যাগ করবেন।

সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করতে অপরের দুঃখ-কষ্ট বুঝতে পারা এবং তাদের পাশে দাঁড়ানো। অন্যের সমস্যা সমাধানে আন্তরিকভাবে কাজ করা। সমাজ ও দেশের প্রতি দায়িত্ববোধ অনুভব করা। জনগণের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসা এবং দায়িত্ব নেওয়া। সেবার মানসিকতা নিঃস্বার্থভাবে মানুষের সেবা। ক্ষমতা, সময় বা সম্পদ দিয়ে অন্যের সাহায্য করা। ধৈর্য্য ও সংযম জনগণের সমস্যা সমাধানে ধৈর্য্য ধরা। নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের জন্য কাজ করা। ন্যায়পরায়ণতা সবাইকে সমানভাবে সাহায্য করা। পক্ষপাতিত্ব বা বৈষম্য না করা। সাহস ও নিষ্ঠা সহকারে জনগণের কল্যাণে কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাহস রাখা। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও লক্ষ্যে অবিচল থাকা। বিনয় ও নম্রতা নিজের ত্যাগ বা অবদান নিয়ে গর্ব না করা। বিনয়ী ও নম্র আচরণ করা। দূরদর্শিতা জনগণের দীর্ঘমেয়াদী সুখ ও মঙ্গলের জন্য পরিকল্পনা করা। সমস্যার স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করা। আত্মবিশ্লেষণ ও উন্নতি নিজের কাজের মূল্যায়ন করা এবং আরও ভালোভাবে সেবা দেওয়ার চেষ্টা করা। নিজের সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো কাটিয়ে উঠা। পরোপকার অন্যের কল্যাণে নিজের সুখ ত্যাগ করা। সমাজের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করা। অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা সব মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ করা। তাদের মতামত ও প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেওয়া।

৪.২.৪. অজ্জব

'অজ্জব' হলো ব্যক্তির সততা, আন্তরিকতা, সরলতা, ঋজুতা গুণের বহিঃপ্রকাশ।[৪৪] যে বৈশিষ্ট্যের দ্বারা ব্যক্তি জীবন মহৎ সর্বোৎকৃষ্ট, অনুকরণীয় হয়ে ওঠে সেটা হলো সততা। শাসককের সত্যনিষ্ঠতা, আন্তরিকতা, সরলতা, ন্যায়নিষ্ঠা ও সৎ থাকার একান্ত প্রয়োজন। কেননা, এই সৎ গুণাবলীর মাধ্যমে একজন শাসক জনসাধারণের আস্থা, বিশ্বাস, ভরসা অর্জন করে। একজন সৎ শাসক কোনো প্রকার কূটকৌশল বা প্রতারণার আশ্রয় নেবেন না। সরলতা শাসকের চরিত্রে স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা আনে, যার দ্বারা মানবসমাজ সমৃদ্ধ হয়।[৪৫] এটি পরিবার, সমাজ সর্বোপরি রাষ্ট্রে সম্প্রীতি-সদ্ভাব ও শান্তি আনয়ন করে।[৪৬] বুদ্ধ এ সম্পর্কে বলেন :

অসাহসেন ধম্মেন সমেন নয়তী পরে,
অম্মস্স গুত্তো মেধাবী ধম্মট্ঠো পবুচ্চতি।[৪৭]

অর্থাৎ, যিনি ন্যায়, ধর্ম ও সাম্যের সাথে সকলকে পরিচালিত করেন তিনিই ধর্মের অভিভাবক, পণ্ডিত এবং সুবিচারক বলে কথিত হন।

এই বৈশিষ্ট্যের ব্যক্তিবর্গ সর্বদা একটি সমাজের প্রথা, ঐতিহ্য, আদর্শ, নীতি, মূল্যবোধ, জনগনের বিশ্বাস প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। একইসাথে সমাজের ন্যায়বিচার, নৈতিকতা, সাম্য, মৈত্রী ও পারস্পরিক কল্যান প্রতিষ্ঠায় কাজ করেন। এর প্রভাবে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় থেকে শুরু করে রাষ্ট্র একটি শৃঙ্খলায় আবদ্ধ হয়। অর্থাৎ, ব্যক্তির জনকল্যাণমুখী পরিকল্পনা, সততা, ন্যায়-পরায়ণতা রাষ্ট্রের উন্নতি ও অগ্রগতিকে বেগবান করে তোলে এবং সুখী সমৃদ্ধময় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

৪.২.৫. মজ্জব

'মজ্জব' শব্দের অর্থ গভীর ও অর্থবোধক। *Pali English Dictionary* গ্রন্থে অর্থ করা হয়েছে এভাবে: compassion, gentleness, and kindness.[৪৮] এমন একটি গুণ যা দ্বারা শাসকের দয়া ও বিনয় প্রকাশ পায়। এখানে দয়া হলো বদান্যতা, অপরের সাথে সহানুভূতিশীল হওয়া, অপরের ভালো ও মঙ্গল চিন্তা, অপরের কল্যাণে আনন্দ অনুভব করা। তিনি মানবসহ সকল জীবের প্রতি অহংকার ও উদ্ধত আচরণ পরিহার করবেন। সংযম, নম্রতা, ভদ্রতা, সৎ আচরণ হলো বিনয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই গুণগুলো ব্যক্তিকে আদর্শসম্পন্ন ব্যক্তিত্বে পরিণত করে। দয়া ও বিনয় শাসকের দুটি গুণ যা তাকে একজন আদর্শ নেতায় পরিণত করে জনগণের কাছাকাছি নিয়ে আসে এবং তাদের সকল সমস্যা ও চাহিদা বুঝতে সাহায্য করে। এটি সবাইকে সুন্দর জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে বলে জানা যায়।[৪৯] *'মধ্যম নিকায়'* গ্রন্থে বর্ণিত আছে, 'মহৎ গুণ সম্পন্ন ব্যক্তি শিক্ষা ও জীবিকা পরায়ণ হয়ে প্রাণীহত্যা চেতনা পরিহার করে, প্রাণী-হিংসা হতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, দণ্ড প্রদান থেকে বিরত হয়, হিংসায় লজ্জাশীল হয়, জীবের প্রতি দয়া পরায়ণ হয়ে সকল প্রাণী ও সর্বভূতের হিতসাধন করে জীবন যাপন করে।'[৫০]

৪.২.৬. তপ

'তপ' একটি গভীর অর্থবোধক শব্দ। *'বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান'* গ্রন্থে এট অর্থ করা হয়েছে কঠোর সাধনা এবং তপস্যা।[৫১] তপকে বলা হয় ইন্দ্রিয় সংযম ও কঠোর ন্যায়-পরায়ণতা।[৫২] তপকে বুদ্ধ শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করেন।[৫৩] *Pali English Dictionary* গ্রন্থে 'তপ'-এর অর্থ করা হয়েছে যথাক্রমে : mental devoutness, self-discipline, self-restraint, and exercise of morality.[৫৪] শাসকের কাজ হলো সর্বতোভাবে ইন্দ্রিয় সংযম করে প্রজাসাধারণের সুখ-শান্তি প্রদান করার পাশাপাশি নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা। শাসক নিজের সুখ সমৃদ্ধি, যশঃ-খ্যাতি, সম্পদ বৃদ্ধি, আত্মবিলাসে নিয়োজিত থাকলে প্রজাসাধারণের মনে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। ফলশ্রুতিতে বিক্ষোভ, অন্যায়, বিবাদ, স্বজনপ্রীতি, অনিয়ম, দুর্নীতি অশান্তি বৃদ্ধি পায়। তাই শাসকের উচিত রাজ্য পরিচালনায় তপব্রত পালন করা। তিনি সব সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে সততার মাধ্যমে পরিবেশ স্থিতিশীল রেখে রাজ্য/রাষ্ট্রের উন্নয়নে সর্বদা কাজ করে যাবেন। 'তপ'-এর মাধ্যমে শাসক তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্যকভাবে পালনে সক্ষম হন।[৫৫]

৪.২.৭. অক্কোধ

'অক্কোধ' পালি শব্দ যার বাংলা রূপ 'অক্রোধ'। শান্ত, প্রশমিত, অহিংস, ক্রোধ বা রাগহীন হওয়াকে অক্রোধ বোঝায়।[৫৬] একজন শাসককে সর্বদা ক্রোধ ও হিংসা পরিহার করতে হবে। তিনি ধৈর্যশীল ও শান্ত হবেন এবং কোনো অবস্থাতেই ক্রোধের বশবর্তী হবেন না। ক্রোধের বর্শবতী হয়ে কখনো কল্যাণকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। বুদ্ধ বলেছেন :

নত্থি রাগসমো অগ্গি নত্থি দোসসমো কলি
নত্থি খন্ধাসমা দুক্খ নত্থি সন্তিপরং সুখং।[৫৭]

অর্থাৎ, রাগের সমান অগ্নি নেই, দ্বেষের সমান পাপ নেই, পঞ্চস্কন্ধসদৃশ দুঃখ নেই, শান্তি অপেক্ষা উত্তম সুখ নেই। এখানে উল্লেখ্য অগ্নি সব কিছু পুড়িয়ে শেষ করে ফেলে। রাগের সমান অগ্নি নেই এর দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে রাগের ফলে ব্যক্তির হিংসা, ঘৃণা, বিদ্বেষ, অশান্তি তৈরি হয় ও হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে যা ব্যক্তিকে বিপথে পরিচালিত হয়। এই প্রসঙ্গে *'ধর্মপদ'* গ্রন্থে বর্ণিত আছে :

দিসো দিসং যং তং কযিরা বেরী বা পন বেরিনং
মিচ্ছাপনিহিতং চিত্তং পাপিযো নং ততো করে।[৫৮]

অর্থাৎ, একজন হিংসাকারী অপরের, কিংবা একজন শত্রু অপর শত্রুর যত ক্ষতি করে, বিপথে পরিচালিত চিত্ত তারচেয়ে অধিক ক্ষতি করে।

কেননা, রাগ তথা ক্রোধ অপরের বিনাশ ও অমঙ্গলের পাশাপাশি নিজের বিনাশ, অমঙ্গল ও ক্ষতি করে। ক্রোধ জীবনের সর্বনাশের সাথে উজ্জ্বল ভবিষৎকে বিনষ্ট করে ফেলে। *'অঙ্গুত্তর নিকায়'* গ্রন্থে ক্রোধের সাত প্রকার অনিষ্টের কথা উল্লেখ আছে। সেগুলো[৫৯] হলো :

- ❖ ক্রোধগ্রস্থ ব্যক্তির চেহারার কুৎসিত হয়
- ❖ ক্রোধাভিভূত হওয়ার কারণে দুঃখে শয়ন করে
- ❖ ক্রোধগ্রস্থ ব্যক্তি চঞ্চল বিধায় কোন বিষয়ে উন্নতি সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে না
- ❖ ক্রোধগ্রস্থ ব্যক্তি ভোগ্যবস্তুতে তৃপ্ত হতে পারেনা
- ❖ ক্রোধগ্রস্থ ব্যক্তি উপযুক্ত সঙ্গী পায় না
- ❖ ক্রোধগ্রস্থ ব্যক্তি কারো সাথে বন্ধুত্ব রক্ষা করে চলতে পারে না
- ❖ ক্রোধগ্রস্থ ব্যক্তি কায়-বাক্য-মনে দুশ্চরিত আচরণ করে কায় ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়।

এই প্রসঙ্গে বলা যায় ক্রোধহীনতা শাসককে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে এবং সমাজে শান্তি বজায় রাখে। *'সূত্রনিপাত'* গ্রন্থে বুদ্ধ বলেছেন :

যো উপ্পতিতং বিনেতি কোধং, বিসটং সপ্পবিসং ব ওসধেহি
সো ভিক্খু জহাতি ওরপারং, উরগো জিন্নমিবত্তচং পুরণং।[৬০]

অর্থাৎ, শরীরে সঞ্চারিত সর্প বিষ যেমন ঔষধে ধ্বংস হয়, তেমন রাগের উৎপত্তি হইলে যিনি উহার ধ্বংস সাধন করিতে পারেন, সেই ভিক্ষু, সর্প যেমন জীর্ণ পুরাতন খোলস বর্জ্জ ন করে, তেমনি সংসার বর্জ্জন করেন। এটি বুদ্ধের দার্শনিক শিক্ষার গভীর তাৎপর্য বহন করে, যা রাগ (দ্বেষ), সংসার ত্যাগ ও আধ্যাত্মিক মুক্তির সাথে সামাজিক জীবনে আসক্তি কমিয়ে রাগ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশনা দেয়। রাগ বা দ্বেষ ধ্বংসের উপমা হিসেবে সর্পবিষ ও ঔষধ এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। এখানে সর্পবিষ হলো রাগ, হিংসা ক্রোধ, ঘৃণা। ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় একাগ্রতার সাথে। ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করা প্রসঙ্গে বুদ্ধ বলেছেন :

অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে,
জিনে কদরিযং দানেন সচ্চেন অলিকবাদিনং।[৬১]

অর্থাৎ, মৈত্রী দিয়ে ক্রোধকে জয় করবে, সাধুতা দ্বারা অসাধুকে জয় করবে, দান দ্বারা কৃপণকে জয় করবে আর সত্য দ্বারা মিথ্যাবাদীকে জয় করবে।

এইখানে ক্রোধ মুক্তির মহৌষধ হলো মৈত্রী অনুশীলন। অর্থাৎ, রাগ হলো মনের বিষ, যা ধ্যান ও নৈতিক সংযম (শীল) দ্বারা নিরোধযোগ্য। তার সাথে সম্যক প্রচেষ্টা রাগ উৎপন্ন হওয়ার আগেই তা রোধ করার শিক্ষা দেয়। যে ব্যক্তি রাগ জয় করেছে, সে শান্তির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে। তাই ব্যক্তিকে রাগ জাতীয় বিষ, যা ধ্যান ও প্রজ্ঞা দ্বারা দূর করতে হবে।

রাজ্যে/রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, সামাজিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বুদ্ধ নির্দেশিত নিম্নের উক্তিটি মহোষীধ হিসেবে কাজ করে। বুদ্ধের অহিংসাকে শান্তি স্থাপন ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূল ভিত্তি বলা যায়। রাষ্ট্রের নীতি ও কর্মকাণ্ডে অহিংসা ও শান্তির পথ অনুসরণ করা উচিত। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য অহিংসার পথ অনুসরণ করা অপরিহার্য। বুদ্ধের মতে, লোভ, দ্বেষ হিংসা ও সংঘাত দ্বারা কোনো সমস্যার সমাধান

সম্ভব নয়। কিন্ত অহিংসা পথ প্রর্দশেন মাধ্যমেই পৃথিবীতে স্থায়ীভাবে শান্তি স্থাপিত হয়। সকল প্রাণীর প্রতি সহানুভূতি ও দয়া প্রদর্শন করাই হলো অহিংসা। বুদ্ধ কাউকে প্রতিহিংসা এবং প্রতিঘাত না করার কথা বলেছেন। 'ধর্মপদ' গ্রন্থের *'যমক বর্গে'* বুদ্ধ বলেছেন ;

নহি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং

অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো।[৬২]

অর্থাৎ, পৃথিবীতে শত্রুতার দ্বারা কখনই শত্রুতা দমন করা যায় না, মিত্রতার দ্বারা শত্রুতার উপশম করা যায়। ইহাই সনাতন ধর্ম।

উপরি-উক্ত বাণীটি অহিংসার মহিমা তুলে ধরে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অহিংসার পথ অনুশীলনের উপদেশ দেয়। শান্তি হলো সমাজের শৃঙ্খলার ভিত্তি। শান্তি একটি সমাজ বা রাষ্ট্রকে নীতি নৈতিকতার মধ্যে গড়ে তোলে। আর এই শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একজন যোগ্য নীতিবান শাসককে অবশ্যই অহিংসার পথ অনুসরণ করতে হবে এবং সংঘাত ও হিংসা পরিত্যাগ করতে হবে। একমাত্র শান্তির মাধ্যমেই সমাজে স্থিতিশীলতা ও উন্নতি সম্ভব। সকল রাষ্ট্রের নীতি ও কর্মকাণ্ডে অহিংসা ও শান্তির পথ অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন। শাসককে সকল প্রকার যুদ্ধ, সংঘাত ও হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড পরিহার করতে হবে। এক্ষেত্রে শাসক যদি অহিংসার পথে চলেন, তবে তার রাজ্যে শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হবে। সংঘাত সদ্ভাব, সম্প্রীতি, বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য অহিংসা হলো সর্বোত্তম পথ। হিংসার মাধ্যমে কখনো শত্রুতার সমাধান করা যায় না; বরং তা দিনদিন সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। অহিংসার মাধ্যমে শত্রুতাকে বন্ধুত্বে পরিনত করা যায় এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়।

বুদ্ধের এই নীতি শিক্ষা অনুসারে, মগধের রাজা বিম্বিসার ও কোশলের রাজা প্রসেনজিত, সম্রাট অশোক তাদের রাজ্যে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বুদ্ধের অহিংসা ও শান্তির বাণী আজ বিশ্বব্যাপী প্রাসঙ্গিক। এমনকি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রগামী মহাত্মা গান্ধী, বিখ্যাত আফ্রিকান-আমেরিকান মানবাধিকার কর্মী মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ বিরোধী আন্দোলনের নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার মতো মহান ব্যক্তিত্ব অহিংসার পথ অনুসরণ করে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন এনেছেন। বর্তমান সময়ে রাষ্ট্রের সংঘাত নিরসন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বুদ্ধের অহিংসার নীতি অনুসরণ করে সহজেই সমস্যা নিরসন সম্ভব। তাই সুশাসন প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রের নীতি ও কর্মকাণ্ডে অহিংসা ও শান্তির পথ অনুসরণ করা উচিত। বুদ্ধের সর্বজনীন শিক্ষা বিশ্বশান্তি ও সামাজিক সম্প্রীতি ও সুশৃঙ্খল সমাজ বিনির্মাণের জন্য অনুসরণীয় অনুকরণীয়।

৪.২.৮. অবিহিংসা

'অবিহিংসা' হলো অহিংসা প্রদর্শন। বৌদ্ধ দর্শনের ভিত্তিভূমি তথা মূল হলো অহিংসা নীতি। সকলের সাথে ভালো ব্যবহার, সহমর্মী আচরণ ব্যক্তির ন্যায্য অধিকার, শ্রদ্ধা, সম্মান প্রদান এই অবিহিংসার মধ্যে রয়েছে উদারতা। যেটি ব্যক্তিকে সকল প্রাণীর প্রতি ভালোবাসাতে শেখায় যাকিনা আদর্শ সামাজিক জীবনযাপনে সহায়ক ভূমিকা পালন

করে। অহিংসক ব্যক্তির মধ্যে পূর্ণরূপে মৈত্রী উৎপন্ন নয়। আর মৈত্রীসম্পন্ন ব্যক্তি পরিবার, সমাজ, সম্প্রদায়, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য আশির্বাদস্বরূপ। বুদ্ধ বলেন যে ব্যক্তি কায়-বাক্য-মনে হিংসা করে না অপরের বিহিংসা করে না - সেই প্রকৃত অহিংসক।[৬৩] শাসককে অহিংসার পথ অনুসরণ করতে হবে। তিনি কোনো প্রকার হিংসা বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করবেন না। অহিংসা শাসককে ন্যায় ও শান্তির পথে পরিচালিত করে। '*করণীয় মৈত্রী সূত্রে*' বুদ্ধ বলেছেন:

" মাতা যথা নিযং পুত্তং, আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে;
এবম্পি সব্বভূতেসু, মানসং ভাবযে অপরিমানং।"[৬৪]

অর্থাৎ, মাতা যেমন নিজের গর্ভজাত একমাত্র পুত্রকে নিজের জীবন দিয়ে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেন, তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমেয় মৈত্রীভাব পোষণ করতে বলেছেন।

বুদ্ধ মূলশিক্ষা অহিংসা। তিনি অহিংসার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অহিংসা যে অসামান্য ভূমিকা রাখে তা বলাবাহুল্য। এটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি যাতে সামাজিক সংঘাত হ্রাস এবং সকলের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করে। ফলশ্রুতিতে অনেকাংশে সমাজের সংঘাত নিরসন হয়। বুদ্ধ '*ধম্মপদ' গ্রন্থে* বলেছেন :

সব্বে তসন্তি দণ্ডস্স সব্বে ভাযন্তি মচ্চুনো
অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেয্য ঘাতযে।[৬৫]

অর্থাৎ, সবাই দণ্ডকে ভয় করে, সবাই মৃত্যুকে ভয় করে, তাই নিজের সাথে তুলনা করে কাউকে হত্যা কিংবা আঘাত করবে না।

তাছাড়া কেউ যদি ক্রোধবশতঃ নির্দোষীকে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি প্রদান করে তাকে নিম্নের দশটি[৬৬] অবস্থার মধ্যে যে কোনো প্রকার গতি প্রাপ্ত হতে হয়। এগুলো হলো : নিদারুণ বেদনা, ধনক্ষয়, অঙ্গহানি, কঠিন ব্যাধি, চিত্তবিকৃত (পাগল), রাজদণ্ড, অদৃষ্ট, অশ্রুত, অচিন্ত্যপূর্ব কোন প্রকার দুর্ঘটনা, জ্ঞাতিবিয়োগ, সম্পদহানি এবং গৃহদাহ। এগুলো ছাড়াও অন্যায়ভাবে দণ্ড প্রদানকারী ব্যক্তি মৃত্যুর পর নরকযন্ত্রনা ভোগ করে বলে উল্লেখ রয়েছে।

অহিংস ভাবে রাজ্য পারিচালনাকে বুদ্ধ প্রশংসা করেন। মানবিক ও ন্যায়-পরায়ণতা রাজ্য বা রাষ্ট্র পরিচালনা করার মূলভিত্তি। সুখ-শান্তি, সম্প্রীতি-সদ্ভাব ও সমৃদ্ধির জন্য অহিংসা নীতি অনুসরণ করা আবশ্যক। হিংসা, সংঘাত, সংঘর্ষ দিয়ে কখনো শান্তি আসে না। বরঞ্চ অহিংসা নীতির মাধ্যমে শান্তি লাভ হয়। সুতরাং হিংসা নয়, ঘাত-প্রতিঘাত নয়। দরকার মৈত্রী। বুদ্ধ এ প্রসঙ্গে বলেন :

নহি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো।[৬৭]

অর্থাৎ, পৃথিবীতে শত্রুতার দ্বারা কখনই শত্রুতা দমন করা যায় না কিন্তু মিত্রতার দ্বারা শত্রুতার উপশম করা যায়। ইহাই সনাতন ধর্ম।

৪.২.৯. ক্ষান্তি

ক্ষান্তি দ্বারা ব্যক্তির উদার মনের পরিচয় পাওয়া যায়। ক্ষান্তি হলো ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, নিবৃত্তি, দোষ মার্জনা, বিরতি ইত্যাদি। মহামতি বুদ্ধ ক্ষান্তিকে পরম সম্পদ বলে অভিহিত করেছেন।[৬৮] তাছাড়া বুদ্ধ ক্ষান্তির চেয়ে অধিকতর কিছু নেই বলে জানান।[৬৯] তাছাড়া Narada ক্ষান্তির চেয়ে আর কোনো অনুশাসন নেই বলে জানান।[৭০] ক্ষমা মহত্বের লক্ষণ যা শাসককে ধৈর্যশীল হতে শেখায়। তিনি প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ধৈর্য ধারণ করবেন এবং ধীরস্থিরভাবে সমস্যার সমাধান করবেন। *'চরিয়াপিটক'* গ্রন্থে ক্ষান্তি সম্পর্কে বুদ্ধ বলেছেন :

যথাপি পঠবী নাম সুচি পি অসুচি পি চ,

সব্বং সহতি নিক্খেপং ন করোতি পটিঘং দযং

তথেব ত্বং পি সব্বেসং সম্মানাবমানক্খমো

খন্তি পারমিতা গন্ত্বা সম্বোধিং পাপুনিস্সসি।[৭১]

অর্থাৎ, পৃথিবীতে শুচি বা অশুচি বিভিন্ন বস্তু নিক্ষেপ করা হলেও পৃথিবী কখনো তার প্রতি দয়া বা ক্রোধ বা হিংসা প্রদর্শন করে না। সমস্ত নিক্ষেপ নিরবে সহ্য করে। এরূপ সকল সম্মান ও অপমান সহ্য করে ক্ষান্তি পারমী পূর্ণ করে সম্বোধি লাভ করা উচিত।

ধৈর্য রাজা বা শাসককে সম্যকভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে এবং রাজ্যের সর্বস্তরের জনগণের আস্থা অর্জনে সাহায্য করে। *'বোধিচর্য্যাবতার'* গ্রন্থে উল্লেখ আছে :

ই চ দ্বেষ পাপং ন চ ক্ষান্তিসমং তপঃ।

তস্মাৎ ক্ষান্তিং প্রযত্নেন ভাবযেদ বিবিধৈর্নয়ৈঃ।[৭২]

অর্থাৎ, দ্বেষের মত পাপ নেই, ক্ষমার সমান তপস্যা বা পূণ্য নেই। অতএব যত্নসহকারে বিভিন্ন উপায়ে ক্ষমার অভ্যাস করা উচিত।

ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ক্ষান্তির অনুশীলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেননা সৎ শাসক সর্বদা সকল আসক্তি ত্যাগ করে সহিষ্ণুতার চর্চা করে নিজেকে শ্রেষ্ঠ সাথে অবস্থান করিয়ে সমাজের কল্যাণে নৈতিকতা, ন্যায়-পরায়ণতা, সমৃদ্ধি অর্জনে নিজেকে নিয়োজিত রাখে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় :

সব্বত্থ বে সপ্পুরিসো চজন্তি ন কাম কামা লপযন্তি সন্তো

সুখেন ফুট্ঠা অথবা দুক্খেন ন উচ্চাবচং পণ্ডিতা দস্সযন্তি।[৭৩]

অর্থাৎ, সৎ ব্যক্তিগণ সর্বত্র আসক্তি ত্যাগ করেন, কাম্যবস্তুর বিষয় আলাপ করেন না, সুখে ও দুঃখে তাঁরা উল্লসিত বা অবসাদগ্রস্থ হন না।

বুদ্ধ অষ্টবিধলোক ধর্মে অবিচল থাকার কথা বলেছেন, সেগুলো হলো : লাভ-অলাভ, যশ-অযশ, নিন্দা-প্রশংসা ও সুখ-দুঃখ। যারা এই নীতিগুলো অনুশীলন করতে পারেন তিনি অপরকে খুব সহজে ক্ষমা করতে পারেন। এই ক্ষান্তির পাঁচ প্রকারের কুফল ও সুফল পাওয়া যায়। নিম্নে[৭৪] তা দেওয়া হলো : বলা চলে ব্যক্তির বহুবিধ গুণের মধ্যে ক্ষান্তি অন্যতম গুরুত্ববহন করে।

ক্রমিক	ক্ষান্তিহীনের কুফল	ক্ষান্তিবাদীর সুফল
১	বহুজনের অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ হয়	বহুজনের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হয়
২	নির্দয় হয়	নির্দয় হয় না
৩	অনুশোচনা প্রাপ্ত হয়	অনুশোচনা প্রাপ্ত হয় না
৪	মোহাচ্ছন্ন হয়ে কালগত হয়	মোহাচ্ছন্ন হয়ে কালগত হয় না
৫	কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দূর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়	কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়

সারণি : ৭

৪.২.১০. অবিরোধ

'অবিরোধ' বলতে অহিংসা বা পক্ষপাতহীনতাকে বোঝায়। *'খুদ্দক নিকায়'* এর *'সুত্তনিপাত'* গ্রন্থে সকলে প্রতি হিংসাহীন হবার কথা জানা যায়।[৭৫] রাজ্য পরিচালনায় রাজা বা শাসককে সৎ-ন্যায়ের পথে অবিচল থাকতে হবে। তিনি কোনো প্রকার অন্যায় বা অবিচারের পথ গ্রহণ করবেন না। অবিরোধ বা অবিচলতা শাসককে ন্যায়বিচার ও সততার পথে চলতে অনুপ্রাণিত করে।

৪.২.১১. দশবিধ রাজধর্মের গুরুত্ব

চরিত্র গঠন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে দশবিধ রাজধর্ম রাজা শাসকের রক্ষাকবচ হিসেবে বিবেচিত। এই গুণগুলো শাসককে জনগণের আস্থা-সম্মান অর্জনে সাহায্য করার পাশাপাশি এবং সমাজে সুখ,শান্তি, সমৃদ্ধি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্মভাবে সহায়তা করে। বুদ্ধের মতে, শাসক যদি এই দশটি গুণের অধিকারী হন, তবে রাজ্যে সুখ ও শান্তি বিরাজ করবে। বুদ্ধের সময়ে মগধের রাজা বিম্বিসার ও কোশলের রাজা প্রসেনজিত বুদ্ধের উপদেশ অনুসারে তাদের রাজ্য পরিচালনা করতেন। তারা দশ রাজধর্মের নীতিগুলো অনুসরণ করতেন যা তাদের রাজ্যে শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ছিল। দশ রাজধর্ম বুদ্ধের রাজনৈতিক দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি শাসকের নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলীর উপর জোর দেয় এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় ন্যায়বিচার, শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। এই নীতিগুলো আজও শাসক ও নেতাদের জন্য অনুসরণীয় ও প্রাসঙ্গিক।নিচে রাজা/শাসকের করণীয় দশবিধ গুণাবলির একটি চিত্র উপস্থাপিত হলো।

ক্রমিক নং	গুণাবলীর নাম	রাজা বা শাসকের করণীয়
১	দান	রাজা বা শাসকে উদার মন-মাননিকতার হতে হয়। প্রয়োজনে প্রজাসাধারণকে ধন-সম্পদ দিয়ে সহায়তা করবেন। তাছাড়া সময় সময় সৎ পরামর্শ দিবেন। রাজ্য/রাষ্ট্রে সততার সাথে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন। দান চেতনা রাজা/শাসককে নিরঙ্কারী ও জনসেবামুখী করে তোলে।
২	শীল	রাজা/শাসকের ব্যক্তিগত জীবন তথা রাষ্ট্র পরিচালনায় শীল বা নৈতিকতা পালন করা আবশ্যক। নানাবিধ অকুশল কর্ম থেকে বিরত থাকা, মিথ্যা বলা, চুরি করা, মিথ্যা ব্যভিচার করা এবং মাদক জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত থেকে পুত-পবিত্র জীবনযাপন করাই হলো শীল।
৩.	পরিচাগ	রাজা/শাসককে আত্মত্যাগী হতে হবে। এখানে রাজা/শাসক কখনো জনসাধারণের কল্যাণ, সুখ, শান্তি সমৃদ্ধির চেয়ে নিজের সুখ, শান্তি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধিকে বড় করে না দেখেন। ক্ষমতার বাহিরে এসে রাজা.শাসককে জনসাধারণের পাশে এসে দাঁড়ানো আবশ্যক।
৪.	অজ্জব	রাজা/শাসক হবে সহজ ও সরল। তাঁদের আচার-আচরণে কখনো মিথ্যা আশ্বাস থাকবে না। সর্বস্তরের জনসাধারণের সাথে কখনোই প্রতারণামূলক আচরণ করবেন না। এরূপ করলে শাসন ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে।
৫	মজ্জব	রাজা/শাসককে সকল প্রকার অহংকার, দাম্ভিকতা, পরিহার করে সতত বিনয়ী হয়ে জনসাধারণের সাথে সুন্দর আচার-আচরণ করতে হয়। এতে রাজ্য/রাষ্ট্রের সর্বত্রে শান্তি, সম্প্রীতি এবং সদ্ভাব বজায় থাকে।
৬	তপ	রাজা/শাসককে সংযমী হতে হয়। নিজেক দমন করতে হয়। অর্থাৎ, একজন ন্যায়-পরায়ণ রাজা/শাসকের জীবন কখনোই বিলাসিতাযুক্ত হবে না। তাই লোভ, কামনা, বাসনা সর্বোপরি সকলপ্রকার ভোগ-বিলাস থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে।
৭	অক্কোধ	রাজা/শাসক কখনো ক্রোদবশঃ কারও প্রতি অন্যায় আচার-আচরণ করতে পারবে না। রাজ্য/রাজ্যে শান্তি এবং সম্প্রীতিভাব বজায় রাখতে হলে দরকার অহিংস মনোভাব এবং ক্রোধহীনতা।
৮	অবিহিংসা	অবিহিংসা বা অহিংসা পরায়ণ হতে হয় রাজা/শাসককে। শাসক যেন হিংস্র না হয়। রাজ্য/রাষ্ট্রে দমন-নিপীড়নের পরিবর্তে সহানুভূতিশীল আচার-আচরণ ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।
৯	ক্ষান্তি	রাজা/শাসককে সর্বক্ষেত্রে ধৈর্যশীল হতে হয়। সকল প্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তাঁকে সংযমতার পরিচয় দিতে হয়। রাজা বা শাসকের ধৈর্য পুরো সমাজ কিংবা রাজ্য/রাষ্ট্রকে উদার মন-মানসিকতার অধিকারী হতে শেখায়।
১০	অবিরোধ	রাজা/শাসককে অহিংসক কিংবা পক্ষপাতহীন হতে হয়। ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে কোনোরকম পক্ষপাত কিংবা ক্রোধ যেন প্রদর্শন না করেন। রাজ্য বা রাষ্ট্রের সর্বস্তরের জনসাধারণের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সুশাককের দায়িত্ব-কর্তব্য

সারণি : ৮

উপরি-উক্ত নীতিগুলোর যথার্থ প্রয়োগ করা একান্ত প্রয়োজন। তাহলো সমাজে এর সুফল পাওয়া যাবে।

৪.২.১২. সম্রাট অশোক ও দশবিধ রাজধর্ম

সম্রাটদের ইতিহাসে পৃথিবীতে সম্রাট অশোক এক অবিস্মরণীয় নাম। ইতিহাসের পাতায় তিনি আজও অমর। তিনি বহু শিলালিপি ও স্তম্ভলিপিতে তাঁর ধর্মীয়, নৈতিকতা, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক মতাদর্শ সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩-২৭২-এ মৌর্য সম্রাট বিন্দুসারের মৃত্যু হলে পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকারের লড়াই শুরু হয়। চারবছর ধরে এই লড়াই সংগ্রাম চলার পর খ্রি.পূর্ব ২৬৯-২৬৮-এ পিতা বিন্দুসারের যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে অশোক সিংহাসেন আরোহণ করেন বলে উল্লেখ রয়েছে।[৭৬] তিনি বুদ্ধের আর্দশ ও শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে বৌদ্ধিক আচার-আচরণে রাজ্য পরিচালনা করেন।[৭৭] তিনি বলেছিলেন : ধর্ম বিজয়ই আমার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ লাভ। আমি চাই সকল মানুষের সুখ-শান্তি, কল্যাণ, সমৃদ্ধি, সংযম, দান, সম-অধিকার, সম-ব্যবহার।[৭৮] তিনি রাজ্যের প্রজাসাধারণের সুখ-শান্তি বৃদ্ধি, দুঃখ মোচন এবং তাদেরকে ধর্মতঃ জীবনযাপনের দিকে খুবই যত্নবান ছিলেন। তিনি রাজ্যের একছত্রাধিপতি হলেও মানবতার মাধ্যমে প্রজাপালন এবং রাজ্য শাসনে তিনি বিন্দুমাত্র কার্পণ্যতা প্রদর্শন করেননি। সারাক্ষণ প্রজাসাধারণের জন্য হিতকর কর্ম ছিল তাঁর ধ্যান-ধারণা এবং চিন্তা-চেতনা। সম্রাট অশোকের মধ্যে অপরিমেয় প্রজাহিতকর মঙ্গলশক্তি দেখে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে অন্তর থেকে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এভাবে :

> "এ ভারতবর্ষ একদিন মহাসম্রাট অশোক তাঁর রাজশক্তিকে ধর্ম বিস্তার কার্যে মঙ্গল সাধন কার্যে নিযুক্ত করেছিলেন। রাজশক্তির মাদকতা যে কী সুতীব্র তা আমার সকলেই জানি; সে শক্তি ক্ষুধিত অগ্নির মতো গৃহ হতে গৃহান্তরে, গ্রাম হতে গ্রামান্তরে, দেশ হতে দেশান্তরে আপনার জ্বালাময়ী লোলুপ রসনাকে প্রেরণ করার জন্য ব্যগ্র। সে বিশ্বলুব্দ রাজশক্তিকে মহারাজ অশোক মঙ্গলের দাসত্বে নিযুক্ত করেছিলেন, তৃপ্তিহীন ভোগকে বির্সজন দিয়ে তিনি শ্রান্তিহীন সেবাকে গ্রহণ করেছিলেন। রাজত্বের পক্ষে এটা প্রয়োজন ছিল না-এটা যুদ্ধ সজ্জা নহে, দেশ জয় নহে, বাণিজ্য বিস্তার নহে; এটা মঙ্গলশক্তির অপর্যাপ্ত প্রাচুর্য, এটা সহসা চক্রবর্তী রাজাকে আশ্রয় করে তাঁর সমস্ত রাজাড়ম্বরকে এক মুহূর্তে হীনপ্রভ করে দিয়ে সমস্ত মনুষ্যকে সমুজ্জ্বল করে তুলেছে। কত বড়ো বড়ো রাজার বড়ো বড়ো সাম্রাজ্য বিধধ্বস্ত বিস্মৃত ধুলিসাৎ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু অশোকের মধ্যে এ রাজশক্তির মহান আবির্ভাব, এটা আমাদের গৌরবের ধন হয়ে আজও আমাদের যা কিছু সত্য হয়ে উঠেছে, তার গৌরব হতে, তার সহায়তা হতে মানুষ আর কোনাদিন বঞ্চিত হবে না। আজ মানুষের মধ্যে সমস্ত স্বার্থজয়ী এ অদ্ভুত মঙ্গলশক্তির মহিমা স্মরণ করে আমরা পরিচিত অপরিচিত সকলে মিলে উৎসব করতে প্রবৃত্ত হয়েছি"।[৭৯]

রাজ্য শাসনে সম্রাট অশোক খুবই উদার ও মানবিক ছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি জীববৈচিত্র্য রক্ষায় নানাপ্রজাতির বৃক্ষ রোপন করেছিলেন। পথিকদের বিশ্রামের বহু বিশ্রামাগার নির্মাণ করেছিলেন। তিনি শুধু মানুষ নয়, সকল প্রাণীর প্রতি অহিংসা মনোভাব প্রদর্শনকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি দশবিধ রাজধর্মকে কেবল ধর্মীয় আদর্শ নয় বরঞ্চ এটি একটি কার্যকর রাষ্ট্রনীতি যা রাজ্যের সর্বস্তরের প্রজাসাধারণের ন্যায়-নৈতিকতা, শান্তি, কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য খুবই অপরিহার্য। সম্রাট অশোক এমন এক রাষ্ট্র নায়ক যিনি উপরি-উক্ত দশবিধ রাজধর্ম মেনে অহিংসা, অস্থিতিশীল কল্যাণকর ন্যায়ভিত্তিক ও সহানভূতিশীল রাজ্যগঠন করেছিলেন। অশোকের রাজ্য শাসননীতিতে এই দশবিধ রাজধর্মের প্রভাব দেখা যায়। একটি সারণির[৮০] মাধ্যমে তা নিচে উপস্থাপিত হলো :

Core values of Asoka	Ten Royal virtue
Generosity (PE II)	Dana (Munificence, Generosity)
Minimum Sins Maximum virtues (PE II)	*Sīla* (Excellent character, Law abiding)
Sense of Duty (*Kalinga* RE I) For the welfare and happiness (several edicts)	*Pariccaga* (Sacrifice, altruism)
Truthfulness (PE II)	*Ajjava* (Honesty, integrity and accountability)
Kindheartedness (PE II)	*Maddava*(tenderness)
Self-control (RE VII)	*Tapo* (self-control, restraint)
Gratitude (RE VII)	*Akkhodha* (non-hatred)
Conquest by *Dhamma* (RE XIII)	Ahimsa (non-violence)
Forgiveness (RE XIII)	*Khanti* (tolerance, patience)
Purity of heart (RE VII)	*Avirodha* (uprightness and conformity)

সারণি : ৯

তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে ন্যায়শাসন ভিত্তিক একটি সামাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে দশবিধ রাজধর্মের প্রতিফলন দেখা যায়। নিচে তা ছকাকারে তুলে ধরা হলো।

ক্রমিক নং	দশবিধ রাজধর্ম	সম্রাট অশোকের কার্যাবলি
১.	দান	মৌর্য সম্রাট অশোক উদার ও দানশীল রাজা ছিলেন যিনি হাসপাতাল, বিশ্রামাগার, পুকুর ও জলাধার খনন করেছিলেন।
২.	শীল	তিনি নীতিবান ছিলেন। নৈতিকভাবে জীবনযাপন করতেন। কোনোরকম বিলাসিতা তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি।
৩.	পরিচাগ	তিনি কখনো নিজের স্বার্থকে বড় করে দেখেননি। নিজের চেয়ে প্রজাদের সুখ-শান্তি ও কল্যাণকে সর্বাগ্রে অগ্রাধিকার দিতেন।
৪.	অজ্জব	তিনি রাজ্য পরিচালনায় সততা ও ন্যায্যতা বজায় রাখেন।
৫.	মজ্জব	সর্বতোভাবে অহঙ্কার পরিত্যাগ করে প্রজাদের অভিভাবক বলে পরিচয় দিতেন।
৬.	তপ	সংযমী হয়ে জীবনযাপন করতেন বিলাসিতায় নয়।
৭.	অক্কোধ	সততার মাধ্যমে রাজ্য শাসন করা।
৮.	অবিহিংসা	কলিঙ্গ যুদ্ধের পার সকল অকল্যাণকর কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করে অহিংসনীতিতে রাজ্য পরিচালনা করেন।
৯.	ক্ষান্তি	ক্ষান্তিবাদী তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য
১০.	অবিরোধ	সকল ধর্ম, বর্ণ গোত্রের প্রতি সহনশীল আচরণ এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা করেন।

সারণি : ১০

৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ব্রহ্মবিহার

বুদ্ধ নির্দেশিত ব্রহ্মবিহার সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। শুধু তাই নয়, এটি মানবতার বিকাশেও অগ্রণী ভূমিকা রাখে। এই গুণাবলির মাধ্যমে বুদ্ধ মানবতার সর্বোত্তম কথা বলেছেন। 'ব্রহ্মবিহার' বিহার হচ্ছে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, হিংসা, বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতার উর্ধে প্রশান্তযুক্ত অবস্থান। এটার মাধ্যমে চৈতন্য অকৃত্রিম ভালোবাসায় উদ্ভাসিত হয়। বুদ্ধ মানুষকে সকল প্রকার স্বার্থপরতা ও জড়তা বিদূরিত করার নির্দেশনা দিয়েছেন ব্রহ্মবিহারের মাধ্যমে। এটির মাধ্যমে মানুষ সকলপ্রকার দুঃখ থেকে মুক্তি পায় বলেই এই পথকে প্রকৃষ্ট বলা হয়। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায়ও ব্রহ্মবিহার বেশ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। এটি এমন একটি মানবিক পথ যার মাধ্যমে শুভ চিন্তা-চেতনা,

বিবেকবোধ, শুভবোধ বিকশিত হয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়টি যখন ব্যাখ্যা করা হয় সেখানে ব্রহ্মবিহার ভাবনা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। মানব আচরণের কিছু গুণ চারটি জোড়ালো শক্তিরূপে এখানে প্রকাশ পায়। যেটি সমাজের অতি প্রয়োজনীয় অবশ্য পালনীয়, আচরণীয় নীতি যা কিনা সমাজের কল্যাণে, শান্তি স্থাপনে অনবদ্য অবদান রেখে চলেছে। ব্যক্তির কর্মের দ্বারা যেমন তার মহত্বের পরিচয় পাওয়া যায় ঠিক তেমনি ব্রহ্মবিহার ভাবনার দ্বারা ব্যক্তির বিশুদ্ধ মনের আলোকিত দিকটির পরিচয় পাওয়া যায়। আর একজন আলোকিত ব্যক্তির আলোকচ্ছটায় সমাজ আলোকিত হয়। এই ব্রহ্মবিহারের[৮১] চারটি বিশেষ গুণগত দিক রয়েছে। শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধ পণ্ডিত Narada Maha Thera এই আচরণিক গুণসমূহ সম্পর্কে বলেন :

> 'The four sublime virtues are also termed illimitable (appamaññā). They are so called becouse they find no barrier or limit and should be extended towards all beings without exception. They embrace all living beings anomals.'[৮২]

গুরুত্বপূর্ণ চারটি বিষয় নিম্নোক্ত :

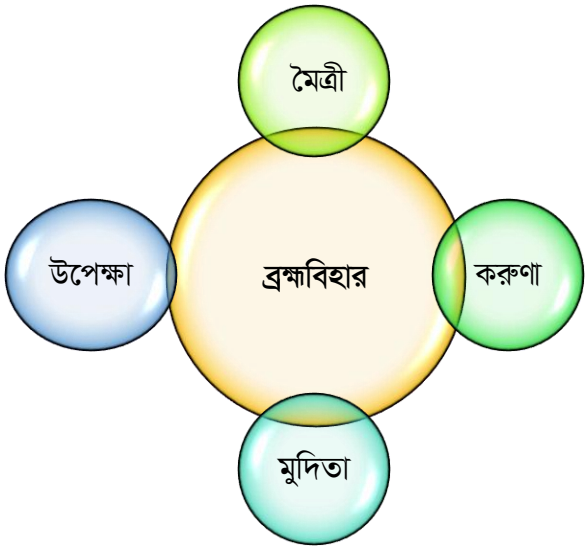

চিত্র ৫ : ব্রহ্মবিহার

বুদ্ধ মানবকল্যাণে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা প্রচার করেছেন যা বিশ্বমৈত্রী ও অহিংসা প্রতিষ্ঠা করে। কেননা ব্রহ্মবিহার হলো শান্ত, স্থিত, সমাহিতভাবের অধিকারী হয়ে বসবাস করা। অর্থাৎ, সকল প্রকার বিদ্বেষ, হিংসা, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ও পরশ্রীকাতরতা মুক্ত চিত্তের প্রশান্তময় অবস্থা। *'সূত্র পিটক'* গ্রন্থের *'খুদ্দক নিকায়'* বর্ণিত আছে,

তিট্‌ঠ নিসিন্নো বা সযনো ব, যাবতাস্‌স বিতমিদ্ধো

এতং সতিং অধিট্‌ঠয্য, ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু।[৮৩]

অর্থাৎ, দাঁড়ানো অবস্থায়, পথে চলমান অবস্থায়, বসা অবস্থায় অথবা শয্যাগত অবস্থায় যতক্ষণ জাগ্রত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত দৃঢ়তার সাথে স্মৃতিমান হয়ে মৈত্রীচিত্তে অবস্থান করাকে ব্রহ্মবিহার বলে। মূলত যারা উপরিউক্ত চারটি বিশেষ গুণসম্পন্ন হন তারাই ব্রহ্মবিহারের অধিকারী। বর্তমান অস্থির মানবসমাজে সামাজিক শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ প্রতিষ্ঠায় এর অনুশীলন করা খুব প্রয়োজন। ব্রহ্মবিহারের যথার্থ অনুশীলনে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, রাষ্ট্র সর্বোপরি বিশ্বে শান্তি সুশাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সমাজ বিনির্মাণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৫.১. মৈত্রী

'মৈত্রী' ছোট একটি শব্দ কিন্তু এটির গভীরতা ও বিশালত্ব অত্যন্ত প্রবল যা ব্রহ্মবিহারের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রথম শক্তশালী ধাপ। শব্দটি দ্বারা প্রেম, প্রীতি, মিত্রতা, ভালোবাসা, বন্ধুত্ব প্রভৃতি প্রকাশ পায়। স্বার্থময় এই পৃথিবীতে এই ভালোবাসা যেন হয় সকল প্রাণীর প্রতি সন্তানসম, নিঃস্বার্থ, অবাদ। আর মৈত্রীর স্বার্থকতা এখানেই। মৈত্রীযুক্ত চিত্তে কর্ম সম্পাদনের ফলে লোভ, দ্বেষ, মোহ, আত্মঅহমিকা, ক্রোধ ও অহংবোধ একেবারে চিরতরে বিলোপ সাধিত হয়। ফলশ্রুতিতে মানুষের মনে অপরিমেয় ভালোবাস জাগে। মৈত্রীকে বিশ্বমৈত্রীও বলা হয়। জাতি-ধর্মবর্ণগোত্র নির্বিশেষে সকলের প্রতি মৈত্রীযুক্ত মনোভাব পোষণ করাকে মৈত্রীর অন্যতম মূখ্য উদ্দেশ্য বলা হয়। সমাজজীবনে সংযমের সাথে মৈত্রীর দ্বারা সকল প্রকার দ্বেষ, সংঘাত, সন্দেহ, সংঘর্ষ, হিংসা, ঘৃণাকে পরিত্যাগ করে সুন্দরজীবন গঠনে সবাইকে স্বাগত জানায়। বুদ্ধ বলেছেন :

দিট্ঠ বা যেব অদি্টঠা, যে ব দূরে বসন্তি অবিদূরে

ভূত বা সম্ভবেসী ব, সব্বে সত্তা অবন্তু সুখিতত্তা।[৮৪]

অর্থাৎ, দৃশ্যমান, নিকটে বা দূরে, জলে বা স্থলে, আকাশে ও অনন্ত চক্রবালে স্থিত, অদৃষ্ট, যারা জন্মেছে এবং জন্মাবে সমস্ত প্রাণী সুখী হোক এরূপ অপ্রমেয় মৈত্রী পোষণ করতে হবে।

মৈত্রী হলো এক অভিনব আলোকময় জাগরণ যা সম্প্রীতি-সদভাব সম্প্রসারণে কার্যকরি ভূমিকা পালন করে। মৈত্রীময় চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা-এর ফলে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর প্রতি দয়ালু মনোভাব উৎপন্ন হয়। বুদ্ধ আরও বলেন যিনি মৈত্রচিত্তে শ্রদ্ধাচিত্তে বিনয়ী আচার-আচরণ তিনি সকল প্রকার থেকে সংস্কার উপশম করে সুখ শান্তপদ লাভ করেন। এ বিষয়ে বিখ্যাত পণ্ডিত K. Sri. Dhammananda বলেন :

> 'Metta-loving-kindness is the most effective method to maintain purify of mind of to purity the mentally polluted atmosphere. [৮৬]

'দীর্ঘ নিকায়' গ্রন্থে বর্ণিত বুদ্ধের একটি উপদেশ হলো : সকল ক্ষেত্রে মৈত্রী, অপ্রমেয়, অবৈরী, অহিংসা চিত্ত দ্বারা বিচরণ করবে।[৮৭] মৈত্রীযুক্ত চিত্তে অবস্থার করার ফলে চিত্ত শান্ত-স্থির ও সুরক্ষিত থাকে। কারও প্রতি কোনো ক্রোধ

কিংবা বিদ্বেষ ভাব থাকে না। মৈত্রী চিত্তসম্পন্ন ব্যক্তির কোনো শত্রুতা থাকে না বলে জানা যায়।[৮৮] মৈত্রীর অনুশীলন কঠিন কিন্তু অসম্ভব নয়। নিজেকে ভালোবাসার মাধ্যমে এর শুভ সূচনা করা যায় একই সাথে নিজের জীবনের মতো অন্যকে ভালোবাসতে হবে।

কর্ম অনুসারে যেমন ফল পাওয়া যায় ঠিক তেমন করে মৈত্রীবান উত্তমরূপে মৈত্রীর অনুশীলন করে এগার প্রকার ফল প্রাপ্ত হন।[৮৯] সেগুলো হলো :

ক্রমিক	মৈত্রীর অনুশীলন-এর ফল	মানবজীবনে-এর প্রভাব
১	সুখে নিদ্রা প্রাপ্ত হয়	মানসিক শান্তি উৎপন্ন হয় ফলে ঘুম সুখময় হয় যা ব্যক্তির শারীরিক সুস্থতা নিশ্চিত করে
২	সুখে জাগ্রত হয়	জাগরণও সুখময় হয় যার ফলে কর্মে উদ্যেম সৃষ্টি হয়
৩	কোনোরূপ দুঃস্বপ্ন দেখে না	চিত্ত তথা মনের বিশুদ্ধিতার ফলে নেতিবাচক স্বপ্ন দেখা কমে যায় মনে প্রসন্নতা উৎপন্ন হয়
৪	মনুষ্যদের প্রিয় হয়	সকলের নিকট বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেন ফলে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়
৫	অমানুষ্যদেরও সুপ্রিয় হয়	সমাজে ব্যক্তির পাশাপাশি প্রাণীদের নিকটও ভরসার স্থান অর্জন করেন
৬	দেবতারা সব সময় রক্ষা করেন	ধর্মীয় বিশ্বাসে দেবতারা এমন ব্যক্তিকে সহায়তা করেন
৭	শরীরে অগ্নি বিষ বা অস্ত্র দিয়ে আঘাত করতে পারে না	শারীরিক নিরাপত্তা সৃষ্টি হয়
৮	সহসা চিত্ত সমাধিস্থ হয়	একাগ্রতায় চির চঞ্চল মন দ্রুত স্থিত হয়।
৯	মুখের চেহারা সতত সুপ্রসন্ন থাকে	মুখমণ্ডলে অভ্যন্তরীণ শান্তি বাহ্যিক রূপে প্রকাশ পায়।
১০	সজ্ঞানে মৃতুবরণ করে	সচেতন মৃত্যু অর্থাৎ, মৃত্যুকালে ভয়হীন ও সজ্ঞানে থাকা
১১	মৃত্যুর পর অর্হৎ পদ লাভ করতে না পারলে ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন	পুনর্জন্মে উত্তম গতি অর্হৎ পদ না পেলে ব্রহ্মলোকে জন্ম (মহাযানে বোধিসত্ত্বের পথ)।

সারণি : ১১

উপরি-উক্ত বিষয় দেখা যায় যারা এই অনুশীলনকে জীবনের প্রধান ব্রত হিসেবে পালন করেন তারা সর্বক্ষেত্রে প্রশংসিত ও নন্দিত হয়। তাছাড় সকল হিংসাত্মক, পাপময়, অকরণীয়, মন্দ বা খারাপ কাজ সম্পাদন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে যার প্রভাব সমাজের সর্বত্রে ছড়িয়ে পড়ে। 'মৈত্রী' সম্পর্কে আরও উল্লেখ রয়েছে :

যথাপি উদকং নাম কল্যাণে পাপকে জনে,
সমং ফরতি সীতেন পবাহেতি রজোমলং।
তথেব ত্বম্পি অহিতহিতে সমং মেত্তায ভাবয।
মেত্তা পারমিতং গন্ত্বা সম্বোধিং পাপুণিস্সসি।[৯০]

অর্থাৎ, জল যেমন সৎ-অসৎ, হীন-উত্তম সকলকেই শীতলতার দ্বারা শান্ত করে এবং শরীরের ময়লা বিদূরিত করে, তেমনি শত্রু-মিত্র সকলের প্রতি সমান প্রীতিভাব পোষণ করে মৈত্রী ভাবনা পূর্ণ করতে হয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠাকরণের পাশাপাশি মৈত্রী পৃথিবীতে সামাজিক-সম্প্রীতি ও সদ্ভাব সংরক্ষণে বেশ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। এ বিষয়ে বিশিষ্ট বৌদ্ধ পণ্ডিত ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়ার "Loving-Kindness to Bring Global Peace: A Study in the Light of Buddha's Teachings" শিরোনামীয় প্রবন্ধ মন্তব্যটি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। তিনি বলেন :

> 'The thoughtful role of Loving-kindness (mettā) in promoting inner and universal peace through the Buddhist lens. Loving-Kindness (mettā), rooted in the sincere wish for all beings to be glad, transcends mere goodwill, representing a transformative force for pleasant coexistence across realms. The study expounds the core values of peace and the vital pillars of loving-kindness, highlighting its moral, spiritual and societal dimensions. It proposes that the cultivation of mettafosters an exemplary life, contributing meaningfully to global harmony'.[৯১]

৫.২. করুণা

বুদ্ধের শিক্ষায় সহানুভূতি ও করুণার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সুশাসনের জন্য নেতা ও নাগরিকদের মধ্যে সহানুভূতি ও করুণা থাকা অপরিহার্য, কারণ এটি সামাজিক সংহতি ও শান্তি বজায় রাখে। করুণার দ্বারা অপরের প্রতি সহানুভূতি, দয়া, কৃপা, অনুকম্পা উৎপন্ন হয়। ব্যক্তি বিবিধ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে করুণা অন্যতম অঙ্গ হিসেবে পরিগনিত। যখন অপরের দুঃখ দেখে নিজের দুঃখ অনুভূত হয় এবং তা দূর করার জন্য অভিপ্রায় জাগে তাই করুণা। এটির দুটি দিক রয়েছে। একটিকে বলা হয় প্রবণতা বা আন্তরিকতাবোধ এবং অপরটিকে বলা হয় আর্তপীড়িতের দুঃখ-দুর্দশা মোচনের ব্যবস্থা করা। উপরি-উক্ত দুটি দিকের মধ্যে একটিকে চেতনাভিত্তিক এবং অপরটিকে কর্মভিত্তিক বলা হয়। বুদ্ধ প্রর্দশিত করুণার সর্বজনীন আদর্শ প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন: 'বুদ্ধের করুণা সন্তান বাৎসল্য নয়, দেশানুরাগও নয়-বৎস যেমন গাভী মাতার পুর্ণ

স্তন হইতে দুগ্ধ আকর্ষণ করিয়া লয়, সেইরূপ ক্ষুদ্র অথবা মহৎ কোনো শ্রেণীর স্বার্থ প্রবৃত্তি সেই করুণাকে আকর্ষণ করিয়া লইতে না। তাহা জল ভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের ন্যায় আপনার প্রভূত প্রাচুর্য্যে নির্বিশেষে সর্বলোকের উপর বর্ষণ করিতেছে। ইহাই ঐশ্বর্য'।[৯২] দুঃখে পিড়িত জীবের প্রতি করুণা প্রসারিত হয়। এ প্রসঙ্গে Narda Thera যথার্থই বলেছেন :

> 'A mother has equal compassion towards all her children, still may have more compassion towards a sick child. Even so, greater compassion should be excised towards the spiritually sick as their sicknesses runs their character. [৯৩]

৫.৩. মুদিতা

'মুদিতা' একটি অর্থবোধক শব্দের নাম। ইংরেজিতে তাকে বলা হয় sympathetic joy। পালি-বাংলা অভিধান গ্রন্থে মুদিতা-এর অর্থ করা হয়েছে এরূপ : কোমল হৃদয়তা, আনন্দিত, হর্ষোৎফুল্ল, প্রসন্ন, সন্তুষ্ট ইত্যাদি।[৯৪] এখানে তুষ্টি লাভ করা, আনন্দ প্রকাশ করা, অপরের সুখও যশকে নিজের মতো করে উপভোগ করতে পারাই হলো মুদিতা। এর মাধ্যমে ব্যক্তির মহত্বতার প্রকাশ পায়। মুদিতা শিক্ষা হলো জগতের সকল প্রাণী যেন সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধিময় হয়ে বসবাস করে কেউ যেন দুঃখগ্রস্থ, অশান্তিগ্রস্থ না হয়। মুদিতার লক্ষণ পরের সুখ সৌভাগ্যের অনুমোদন করা।[৯৫] মুদিতা যেন কোনো অবস্থাতেই সহানুভূতিমূলক আচরণ না হয়। ব্যক্তি থেকে যেন সর্বদা কল্যাণভাবনা উৎপন্ন হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। যথার্থভাবে মুদিতা অনুশীলন করলে অপরের প্রতি শত্রুতা ভাব, দ্বেষ ভাব, ঈর্ষা ভাব, ও হিংসা চিরতে বিদূরিত হবে। মুদিতা ব্যক্তি বিশেষ থেকে শুরু সর্বক্ষেত্রে সকলের কল্যাণ কামনায় নিয়োজিত থাকে অপরের সকল প্রকার উন্নতিতে সাহায্যকারী ভূমিকায় উপনিত হয়। মুদিতা সকলের কল্যাণ, মঙ্গল ও সমৃদ্ধি কামনায় নিয়োজিত। এখানে আপন-পর, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, শত্রু-মিত্র ভেদাভেদ ধনী-দরিদ্র, নেই। মুদিতার ফলে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে, ঐক্যের বন্ধন রচিত হয়। একইসাথে সূচিত হয় পরস্পর সমৃদ্ধময় জীবনযাপন প্রণালী। মুদিতায় পরের সুখকে নিজের সুখ ও পরের দুঃখে নিজের দুঃখ হিসেবে গ্রহণ করতে পারার মানসিকতা তৈরি করা। সবশেষে পণ্ডিত Siddhi Butr-Indr উদ্ধৃত করছি। তিনি বলেন :

> 'It Counteracts conceits of all kinds, and its growth and progress check craving's hold in the emotion of man, A person, is mostly one who is under the influence of jealousy, is advised to encourage this societal emotion of sympathetic joy'.[৯৬]

মুদিতা হলো অপরের সুখ-সাফল্যে সুখী, খুশী এবং আনন্দিত হওয়া। এটিকে ব্রহ্মবিহারের তৃতীয় স্তম্ভ বলা হয়। সমাজজীবনে এটির নিম্নলিখিত তিনটি মাত্রা দেখা যায়।

স্তর	বিশেষত্বের ধারণা	প্রয়োগ
সাধারণ	অপরের সুখ-শান্তি, সাফল্য খুশী ও আনন্দিত হওয়া	প্রাত্যহিক জীবনে সামাজিক সম্পর্ক
গভীর	এমন কি শত্রুর সকল প্রকার উন্নত, যশ-খ্যাতিতে খুশী ও আনন্দিত হওয়া	সংঘাত বা দ্বন্দ্ব নিরসন
সর্বোচ্চ	সকল প্রাণীর সুখে আনন্দিত হওয়া	চিত্তের একাগ্রতা

সারণি : ১২

৫.৪. উপেক্ষা

উপেক্ষা হলো ব্যক্তির লোভ দ্বেষ-মোহ মুক্ত সত্যের অনুভূতি। মধ্যস্থভাব, সমচিত্ততা এবং সাম্য প্রভৃতি বিষয়ের মাধ্যমে উপেক্ষ প্রকাশ পায়। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা এর পরের অবস্থাকে বলা হয় উপেক্ষা। প্রিয়ও নয়, অপ্রিয়ও নয় এমন একজন ব্যক্তিকে দেখে মনে আনন্দ কিংবা বেদনা কোনোটিরই সঞ্চার হয় না। নিরপেক্ষ ভাব (নিরপেক্ষতা) ইহার মূখ্য লক্ষণ।[৯৭] লাভ-অলাভ, যশ-অযশ, নিন্দা-প্রশংসা, সুখ-দুঃখ এই আট প্রকার লোকধর্মে অবিচলিত থাকা, শোকহীনতা, লোভ-দ্বেষ-মোহরূপ কলুষহীন হয়ে অবস্থান করা মাধ্যমে উপেক্ষা প্রতিষ্ঠা পায়।

সবশেষে বলা যায়, ব্রহ্মবিহারের উপরি-উক্ত চারটি গুণাবলী চর্চা শাসকের জন্য খুবই প্রয়োজন। কেননা, এই গুণবলি চর্চার মাধ্যম রাজা বা প্রশাসক জনসাধারণ ও বহিঃরাষ্ট্রের সাথে আন্তঃসম্পর্ক বৃদ্ধি করে ন্যায়-পরায়ণতার সাথে রাজ্য/রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারেন। এ বিষয়ে নিচের উক্তিটি অনুধাবন যোগ্য:

> ‘These qualities promote positive emotions, kindheartedness, and courage, guiding perfect interactions with all beings. They effectively alleviate tension, resolve societal conflicts, and heal life’s wounds. They level social barriers, build harmonious communities, awaken slumbering magnanimity long forgotten, revive happiness and hope long abandoned, and encourage human brotherhood against the forces of egotism.[৯৮]

৬. সুশাসন ও প্রজ্ঞা

মহামতি বুদ্ধ শুধু মুক্তির পথই নির্দেশ করেনি বরঞ্চ সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয়জীবনের জন্য নৈতিক ও বুদ্ধিভিত্তিক শিক্ষা প্রদান করেন। তাঁর নির্দেশিত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সুশাসনে জন্য আজও খুবই প্রাসঙ্গিক। এই দুটি গভীর অর্থবোধক শব্দের সমন্বয়ে মানুষ যেমন নিজেন মুক্তির পথ অনুসন্ধান করতে পারে তেমনি আবার সততা, ন্যায়-পরায়ণতার সাথে সমাজ, রাষ্ট্র/রাজ্য পরিচালন করতে পারে। সুশাসনের জন্য নেতা ও নাগরিকদের মধ্যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থাকা প্রয়োজন। কারণ এটি সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং সমস্যার সমাধানে সাহায্য করে। কেননা, মানবশক্তি সমাজে সকল প্রকার শক্তির মধ্যে অন্যতম। সমাজের মধ্যে বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে মানবশক্তি ব্যক্তির প্রজ্ঞার বিকশিত রূপ হিসেবে কাজ করে। মানুষ প্রজ্ঞা ও জ্ঞানবলে তার উচ্চ অবস্থানকে ধরে রাখতে সক্ষম। কূটদন্ত সূত্রে রাজা মহাবিজিত অষ্টাঙ্গ সমন্নাগত প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায় যা ব্যক্তির সামগ্রিক জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ। সেগুলো[৯৯] হলো :

- মাতা-পিতার উভয় দিক হতে সুজাত, ঊর্ধ্বতন সপ্তপুরুষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ গর্ভজাত, জাতি সম্বন্ধে নিষ্কল ও নির্দোষ।
- অভিরূপ, দর্শনীয়, প্রাসাদিক, পরম বর্ণ সৌন্দর্যে সমন্নাগত, ব্রহ্মবর্ণী, ব্রহ্মদেহী ও মহৎ দর্শন।
- আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগী, প্রভূত স্বর্ণ-রৌপ্যাদি বিত্ত উপকরণ ও ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ রাজভাণ্ডার সম্পন্ন।
- পরাক্রান্ত, রাজভক্ত আদেশানুবর্তী চতুরঙ্গিনী সেনাসমন্বিত, স্বীয় যশ-গৌরব দ্বারা যেন শত্রু দহনকারী।
- শ্রদ্ধাবান, দায়ক, দানপতি, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ-নিঃস্ব দরিদ্র যাচকগণের তৃষ্ণানিবারী উৎস, পুণ্য কর্মকারী।
- সর্ববিধ বিদ্যায় বহুশ্রুত।
- ভাষিতের অর্থজ্ঞান সম্পন্ন অর্থাৎ, এই কথার এই অর্থ, এই কথার এই অর্থ বলে জানা।
- পণ্ডিত, নিপুণ মেধাবী, ভূত-ভবিষ্যত ও বর্তমানের চিন্তা করণে সক্ষম।

উপরি-উক্ত গুণসম্পন্ন কারও হাতে রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব থাকলে দেশ তথা রাষ্ট্রের সুনাম বহিঃবিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। দেশটি হয়ে উঠবে সকলের অনুকরণীয় অনুসরনীয়। কেননা, প্রজ্ঞা ও জ্ঞানবলে ব্যক্তি নিজেকে পরিচালিত করে সমাজ তথা রাষ্ট্রের জন্য সঠিক পরিবর্তন করতে পারে। একই সাথে দেশকে অবনতির হাত থেকে রক্ষা করে ও তার শক্তি ব্যবহার করে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করে তুলে। মিলিন্দপ্রশ্ন গ্রন্থে রাজা মিলিন্দ বড় পণ্ডিত, চতুর মেধাবী ও ভূত, ভবিষ্যৎ বর্তমান মন্ত্র ও যোগবিধান ক্রিয়ার আচরণ করে পরীক্ষা করতেন। তিনি অনেক বিদ্যা অধ্যায়ন প্রজ্ঞা প্রাপ্ত হন। তিনি ঊনবিংশ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন।[১০০] যথা :

(১) শ্রুতি (২) স্মৃতি (৩) সাংখ্য (৪) যোগ (৫) ন্যায় (৬) বৈশেষিক (৭) গণিত (৮) সঙ্গীত (৯) চিকিৎসা (১০) চতুর্বেদ (মতান্তরে ধনুবিদ্যা) (১১) পুরাণ (১২) ইতিহাস (১৩) জ্যোতিষ (১৪) যাদুবিদ্যা (১৫) হেতু বা তর্ক (১৬) মন্ত্রণা (১৭) যুদ্ধবিদ্যা (১৮) ছন্দ এবং (১৯) সামুদ্রিক এই ঊনবিংশতি শাস্ত্রে তিনি পারদর্শী ছিলেন। তিনি

ছিলেন তার্কিক, দুর্ধর্ষ, দুঃসহ বিভিন্ন তীর্থঙ্করদের মধ্যে অগ্রণীরূপে সম্মানিত। সমগ্র জম্বুদ্বীপে মিলিন্দ রাজার ন্যায় শৌর্য, বীর্য ও পরাক্রমে এবং প্রজ্ঞায় অপর কেউ ছিলেন না। তিনি ধনাঢ্য, মহাধনী এবং বিপুল সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় রাজা-প্রশাসকে অবশ্যই জ্ঞানবান এবং প্রজ্ঞার অধিকারী হতে হবে। তাহলে দেশ সমৃদ্ধ হবে। দেশের নাগরিক সুনাগরিক হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

৭. সামাজিক দায়িত্ব কর্তব্য

সমাজ, রাষ্ট্র/রাজ্য এবং ব্যক্তি প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। ব্যক্তি যদি যথাযথ ভাবে তার উপর দায়িত্ব কর্তব্য পালন করে তবে সমাজ সুসংহত ও সমৃদ্ধ হয়। সমাজ সত্য, সুন্দর ও ন্যায়ের পথে চললে রাষ্ট্রের সর্বত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। বুদ্ধ জনকল্যাণের উদ্দ্যেশে বলেছেন, চরথ ভিকখবে চারিকং বহুজন হিতায, বহুজন সুখায, লোকানুকম্পায, অত্থায হিতায, সুখায দেব মনুস্সানং। দেসেথ ভিক্খবে ধম্মং আদি কল্যাণং, মজ্ঝে কল্যাণং, পরিযোসান কল্যাণং। অর্থৎ, তোমরা বহুজনের হিত কল্যাণের জন্য দিকে দিকে বিচরণ কর। এমন ধর্ম দেশনা কর যার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ এবং অন্তে কল্যাণ।

বুদ্ধের শিক্ষা-দর্শন ছিল মানুষের মুক্তি, মানবিকতা, কল্যাণ ও ন্যায়-নীতির পক্ষে। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বুদ্ধের সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এখানে বুদ্ধ ছয়টি দায়িত্ব-কর্তব্যের নির্দেশনা দিয়েছেন যা পালন করা প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য। নিচে সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্যের একটি চিত্র[১০১] উপস্থাপন করা হলো।

চিত্র ৬ : জনকল্যাণ ও সামাজিক দায়িত্ব কর্তব্য

বুদ্ধ এই কর্তব্যের ছয় দিক বলে অভিহিত করেন এভাবে : ১. মাতা-পিতা : পূর্বদিক, ২. আচার্য বা শিক্ষক : দক্ষিণ দিক, ৩. স্ত্রী-পুত্র : পশ্চিম দিক, ৪. বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজন : উত্তর দিক, ৫. গৃহকর্মী বা ভৃত্য : অধোদিক, এবং ৬. শ্রমণ-ব্রাহ্মণ : ঊর্ধদিক।

৭.১. মাতা-পিতার সম্পর্ক

বর্তমান ভোগবাদী ব্যস্ত সমাজে পারিবারিক বন্ধনে টানাপোড়ন দেখা যায়। সেই প্রভাব পড়ছে সংসারে মূল দিক বৃদ্ধ পিতা-মাতার উপর। যেই পিতা-মাতা তাদের সমস্ত কিছু দিয়ে সন্তানদের লালন-পালন করেছেন সেই সন্তান একসময় পিতামাতার দায়িত্ব নিতে অপারগতা প্রকাশ করে। চিত্রটি দিন দিন প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। আর একই সাথে বেড়ে চলেছে বৃদ্ধাশ্রম। অনেক সময় বৃদ্ধাশ্রমে পিতা-মাতাকে রেখে এসে তাদের কোনো প্রকার খোঁজ খবর নেন না যার প্রভাব পরবর্তী উত্তরাধিকারীর উপর পড়ছে। আজ থেকে আড়াই হাজার পূর্বে বুদ্ধ পিতা-মাতার প্রতি সন্তানদের দায়িত্ব কর্তব্যের বিষয়ে বর্ণনা করে গেছেন এবং সন্তানদের প্রতি পিতা মাতার দায়িত্বের কথাও সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে। মাতা-পিতারূপ পূর্বদিক রক্ষা করে পুত্র-কণ্যার পাঁচ প্রকার কর্তব্য সম্পাদনের মাধ্যমে পুত্র কর্তৃক মাতা-পিতারূপ পূর্বদিক রক্ষা করা যায়।[১০২] সেগুলো হলো :

ক্রমিক	সন্তান কর্তৃক মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য	সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার কর্তব্য
১	ভরণ-পোষণ করতে হয়	পাপকাজ হতে বিরত রাখেন
২	তাঁদের প্রয়োজনীয় কাজ করে দিতে হয়	মঙ্গলজনক কাজে উৎসাহ দেন
৩	বংশ মর্যাদা বজায় রাখতে হয়	শিল্প শিক্ষা দেন
৪	তাঁদের পরামর্শ মেনে বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতে হয়	যথাসময়ে আবাহ-বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করান
৫	পরলোকগত মাতা-পিতার পারলৌকিক সদ্‌গতি কামনায় পুণ্য কাজ করতে হয়।	যথাযথ বয়সে বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকার দিয়ে দেন

সারণি : ১৩

উপরি-উক্ত শিক্ষা অনুসারে পারিবারিক বন্ধনের পাশাপাশি সমাজিক বন্ধন দৃঢ় হবে। এই বিষয়ের সাথে বুদ্ধের আরেকটি শিক্ষা হলো : মাতাপিতু উপট্ঠানং, এতং মঙ্গল মুত্তমং।[১০৩] অর্থাৎ, মাতাপিতার সেবাকরা উত্তম মঙ্গল। বুদ্ধ এ বিষয়ে আরও বলেছেন :

যো মাতরং, পিতরং বা, জিন্নকং গতযোব্বনং,

পহূসন্তো ন ভরতি, তং পরাভবতো মুখং।[১০৪]

অর্থাৎ, যে সক্ষম হয়েও মাতা-পিতার ভরণ-পোষণ করে না সে ব্যক্তি জীবনে পরাজিত হয়।

সামাজিক ভাবে এই বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার সচেতন যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে সরকারি ভাবেও এই বিষয়ে চমৎকার একটি প্রজ্ঞাপন রয়েছে। নিম্নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রণিত আইনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধারা নিম্নে[১০৫] তুলে ধরা হলো :

পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ ৩।

(১) প্রত্যেক সন্তানকে তাহার পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ নিশ্চিত করিতে হইবে।

(২) কোনো পিতা-মাতার একাধিক সন্তান থাকিলে সেইক্ষেত্রে সন্তানগণ নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করিয়া তাহাদের পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ নিশ্চিত করিবে।

(৩) এই ধারার অধীন পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ নিশ্চিত করিবার ক্ষেত্রে প্রত্যেক সন্তানকে পিতা-মাতার একইসঙ্গে একই স্থানে বসবাস নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৪) কোনো সন্তান তাহার পিতা বা মাতাকে বা উভয়কে তাহার, বা ক্ষেত্রমত, তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কোন বৃদ্ধ নিবাস কিংবা অন্য কোথাও একত্রে কিংবা আলাদা আলাদাভাবে বসবাস করিতে বাধ্য করিবে না।

(৫) প্রত্যেক সন্তান তাহার পিতা এবং মাতার স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজ খবর রাখিবে, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা ও পরিচর্যা করিবে।

(৬) পিতা বা মাতা কিংবা উভয়, সন্তান হইতে পৃথকভাবে বসবাস করিলে, সেইক্ষেত্রে প্রত্যেক সন্তানকে নিয়মিতভাবে তাহার, বা ক্ষেত্রমত, তাহাদের সহিত সাক্ষাত করিতে হইবে।

(৭) কোনো পিতা বা মাতা কিংবা উভয়ে, সন্তানদের সহিত বসবাস না করিয়া পৃথকভাবে বসবাস করিলে, সেইক্ষেত্রে উক্ত পিতা বা মাতার প্রত্যেক সন্তান তাহার দৈনন্দিন আয়-রোজগার, বা ক্ষেত্রমত, মাসিক আয় বা বাৎসরিক আয় হইতে যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ অর্থ পিতা বা মাতা, বা ক্ষেত্রমত, উভয়কে নিয়মিত প্রদান করিবে।

পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ না করিবার দণ্ড ৫।

(১) কোনো সন্তান কর্তৃক ধারা ৩ এর যে কোন উপ-ধারার বিধান কিংবা ধারা ৪ এর বিধান লংঘন অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য অনূর্ধ্ব ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে; বা উক্ত অর্থদণ্ড অনাদায়ের ক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

(২) কোনো সন্তানের স্ত্রী, বা ক্ষেত্রমত, স্বামী কিংবা পুত্র-কন্যা বা অন্য কোন নিকট আত্মীয় ব্যক্তি

(ক) পিতা-মাতার বা দাদা-দাদীর বা নানা-নানীর ভরণ-পোষণ প্রদানে বাধা প্রদান করিলে; বা

(খ) পিতা-মাতার বা দাদা-দাদীর বা নানা-নানীর ভরণ-পোষণ প্রদানে অসহযোগিতা করিলে

তিনি উক্তরূপ অপরাধ সংঘটনে সহায়তা করিয়াছে গণ্যে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

৭.২. ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক

শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্ক একটি পুত-পবিত্র সম্পর্ক যা গড়ে ওঠে শিক্ষা, আদর্শ, নীতি, নৈতিকতা, বিনয়, নিয়ম, মর্যাদাবোধ, সম্মান ও ন্যায়নিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে। এটি এমন একটি সম্পর্ক যেখানে মাতা-পিতার সম্পর্কের পরে ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কে অগ্রে স্থান দেওয়া হয়। কিন্তু আজ এই পবিত্র সম্পর্কে যেন ছেদ দেখা যায়। ফলে সমাজের একটি বড় শক্তি একদিকে সমাজ গড়ার কারিগর অপর দিকে যুব শক্তি যাদের দ্বারা সমাজ এগিয়ে যাবে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে দূরত্ব। যা কিনা একটি সমাজের জন্য অশুসংকেত বহন করে। কেননা, এতে সমাজের মধ্যে বিদ্বেষ বেড়ে যাবে। এই বিষয়ে বুদ্ধের শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। বুদ্ধ আচার্য বা শিক্ষকরূপ দক্ষিণদিক রক্ষা করে আচার্য বা শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীর কর্তব্যের বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেছেন। শিক্ষার্থীদের পাঁচ প্রকার নিয়ম পালনের মাধ্যমে আচার্য বা শিক্ষকরূপ দক্ষিণ দিক রক্ষা করতে হয়।[১০৬] পাঁচ প্রকারে সেবিত হয়ে আচার্য বা শিক্ষক শিক্ষার্থীর প্রতি পাঁচ প্রকার দায়িত্ব পালন করেন।

ক্রমিক	শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীর কর্তব্য	শিক্ষক শিক্ষার্থীর প্রতি পাঁচ প্রকার অনুকম্পা করেন।
১	শিক্ষকের সম্মুখে ভদ্রতার সাথে আসন গ্রহণ করতে হয় এবং ভদ্রতার সাথে আসন ত্যাগ করতে হয়	শিক্ষার্থীকে সুবিনীত করেন
২	যথাসাধ্য শিক্ষকের সেবা-যত্ন করতে হয়	উত্তমরূপে শিক্ষা দেন,
৩	শিক্ষকের আদেশ-উপদেশ পালন করতে হয়	উপযুক্ত সকলপ্রকার বিদ্যা শিক্ষা দেন
৪	মনযোগ সহকারে আচার্যের উপদেশ শ্রবণ করতে হয়	কোন ধরনের লোকের সাথে বন্ধুত্ব করবে তার নির্দেশটি প্রদান করেন।
৫	মনযোগ সহকারে সসম্মানে বিদ্যাভ্যাস করতে হয়	সর্বধরনের আপদ-বিপদসহ শিক্ষার্থীকে সর্ব দিকে রক্ষা করেন।

সারণি : ১৪

৭.৩. স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক

পরিবার তথা পরিবারের শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি হয় স্বামী-স্ত্রীকে কেন্দ্র করেই। বলতে দ্বিধা নেই,সম্পর্কটি মূখ্য ভূমিকা পালন করে। স্ত্রী-পুত্ররূপ পশ্চিম দিক রক্ষা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য পাঁচ প্রকার কর্তব্য কর্ম সম্পাদনে স্বামীকে স্ত্রীরূপ পশ্চিম দিক রক্ষা করতে হয়। স্বামী কর্তৃক পাঁচ প্রকার অধিকার পেয়ে স্ত্রীকেও স্বামীর প্রতি পাঁচ প্রকার কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করতে হয়।[১০৭]

ক্রমিক	স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য	স্ত্রীর স্বামীর প্রতি কর্তব্য কর্ম
১	স্ত্রীকে প্রাপ্য সম্মান প্রদান করতে হয়	গৃহকর্ম সুচারুরূপে সম্পাদন করতে হয়,
২	সবধরনের অবজ্ঞা সূচক আচার-ব্যবহার করা হতে বিরত থাকতে হয়	পরিজন বর্গকে উত্তমরূপে প্রতিপালন করতে হয়
৩	অন্যকোনো রমনীর প্রতি অনুরক্ত না হয়ে স্বীয় স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত থাকতে হয়	পর পুরুষের প্রতি আসক্ত না হয়ে স্বীয় স্বামীর প্রতি আসক্ত থাকতে হয়,
৪	স্ত্রীকে স্বীয় সম্পদের উপর কর্তৃত্ব দিতে হয়	স্বামীর ধন-সম্পদ যাতে অপচয় না হয় সে বিষয়ে সজাগ থাকতে হয়
৫	স্ত্রীকে যথাশক্তি বসন-ভূষণ দিতে হয়।	সকলপ্রকার কর্মে দক্ষ ও আলস্যহীন হতে হয়।

সারণি : ১৫

বুদ্ধ মানবজীবনের পরাজয়ের কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন :

সেহি দারেহি সন্তুট্ঠো, বেসিযাসু পদিস্সতি,
দুস্সতি পরদারেসু, তং পরাভবতো মুখং।[১০৮]

অর্থাৎ, যে স্বামী নিজের স্ত্রীতে অসন্তুষ্ট হয়ে পর স্ত্রীলোকের সাথে জড়িত হয়, পরস্ত্রীর সাথে কামসেবা করে তা হলে জীবনে পরাজয় হয়।

বুদ্ধ নারী, স্ত্রী তথা মাতৃজাতির মর্যাদার ও সম্মান কথা বার বার তাঁর দেশনায় বলেছেন। এ প্রসঙ্গে 'মঙ্গল সূত্রে' মানব জীবনের মঙ্গলবিষয়ক ৩৮ প্রকার মঙ্গলের মধ্যে উল্লেখ আছে:

"পুত্তাদারস্স সঙ্গহো মঙ্গলমুত্তমং"[১০৯]

অর্থাৎ, স্ত্রী-পুত্রের ভরণ- পোষণ করা উত্তম মঙ্গল।

এ থেকে পরিবারের একজন মূখ্য সদস্য হিসেবে নারীদের মূল্যায়নের বিষয় উঠে আসে।

৭.৪. বন্ধু-বান্ধব সম্পর্ক

বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনরূপ উত্তর দিক রক্ষা করে কুল পুত্রগণ পাঁচ প্রকার কর্তব্য কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়- স্বজনরূপ উত্তর দিক রক্ষা করেন। বন্ধু- বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনরা কুলপুত্র কর্তৃক পাঁচ প্রকারে সেবিত হয়ে তাঁরাও নিম্নোক্ত প্রকারে কুলপুত্রকে অনুকম্পা করেন।[১১০]

ক্রমিক	বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনের প্রতি কর্তব্য	কুলপুত্রের প্রতি বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনের কর্তব্য
১	কুলপুত্রগণ আপদ-বিপদে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে যথাশক্তি সাহার্য্য করেন	কুলপুত্র ভুল পথে পরিচালিত হলে বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজন তাকে সৎ পথে আনার প্রচেষ্ঠা করেন
২	তাঁদের প্রতি সদা প্রিয়ভাষণ করেন	তাঁর বিষয় সম্পদ রক্ষা করেন
৩	ভালো কর্মানুষ্ঠানে তাদেরকে কাছে রাখেন	বিপদ-আপদ আসলে তাঁকে আশ্রয় দেন
৪	তাঁদের প্রতি প্রগাঢ় সহানুভূতিশীল থাকেন	যে কোনো বিপদের সময় তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেন না
৫	তাঁদের প্রতি সদা সরলতাপূর্ণ আচরণ ও উদার মনোভাব পোষণ করেন	তাঁর পরিবারের অপরাপর সকলের সম্মান রক্ষা করেন

সারণি : ১৬

৭.৫. গৃহকর্মী-গৃহকর্তা সম্পর্ক

গৃহকর্মী একটি পরিবারের সাহায্যকারীরূপে পরিগনিত হয়। পরিবারের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে। সকল সদস্যের সেবা যত্ন করে। দীর্ঘসময় এই সেবা প্রদান করতে গিয়ে পরিবারের একজন সদস্যের মতো হয়ে যায়। ফলে গৃহকর্মীর দায়িত্ব কর্তব্যের তৈরি হয়। দুঃখের বিষয় হলো এই যে মাঝে মাঝে সমাজের কিছু কথিত শিক্ষিত বিবেক বর্জিত ব্যক্তির দ্বারা এই গৃহকর্মী তথা ভৃত্যরা বিভিন্ন ভাবে অত্যাচারের শিকার হচ্ছে, আঘাত প্রাপ্ত হচ্ছে, ব্যভিচারের শিকার হচ্ছে। আবার গৃহকর্মীরা ও গৃহকর্তার বিশ্বস্ত হয়ে তাদের অর্থ সম্পদ লুট করতে দেখা যায়। বুদ্ধের শিক্ষায় এই গৃহকর্মী বিষয়টিও উল্লেখ পাওয়া যায় যাতে গৃহকর্মী বা ভৃত্যের প্রতি গৃহকর্তার কর্তব্য পাঁচ প্রকার নিয়মের মাধ্যমে গৃহকর্তাকে ভৃত্যরূপ অধোদিক রক্ষা করতে হয়। গৃহকর্তা কর্তৃক মর্যাদা পেয়ে ভৃত্যকেও পাঁচ প্রকার নিয়ম পালনের মাধ্যমে গৃহকর্তার প্রতি আনুগত্য পোষণ করতে হয়।[১১১]

ক্রমিক	ভৃত্যেও প্রতি গৃহকর্তার কর্তব্য	গৃহকর্তার প্রতি ভৃত্যেও কর্তব্য
১	গৃহকর্তাকে ভৃত্যের শক্তি-সামর্থ্য অনুসারে কাজের দায়িত্ব দিতে হয়	গৃহকর্তার আগে ঘুম হতে উঠতে হবে
২	ভৃত্যেও উপযুক্ত মজুরি দিতে হয়	গৃহকর্তার পরে ঘুমাতে হবে
৩	অসুস্থতায় সেবা করতে হয়	চৌর্যবৃত্তি পরিহার করতে হয়
৪	উৎকৃষ্ট খাবার অংশ দিতে হয়	মনোযোগী হয়ে উত্তমরূপে কাজ করতে হয়
৫	কাজের মাঝে মাঝে ছুটির ব্যবস্থা করতে হয়	সকলের কাছে গৃহকর্তার কীর্তি ও প্রশংসা করতে হয়

সারণি : ১৭

৭.৬. শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সম্পর্ক

শ্রমণ-ব্রাহ্মণরূপ ঊর্ধ্বদিক রক্ষা শ্রমণ-ব্রাহ্মণের প্রতি কর্তব্য শ্রমণ-ব্রাহ্মণরূপ উর্ধদিক রক্ষার জন্যে পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়। শ্রমণ-ব্রাহ্মণকেও ছয়টি কর্মেও মাধ্যমে কুলপুত্রের প্রতি কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়।[১১২]

ক্রমিক	শ্রমণ-ব্রাহ্মণের প্রতি কর্তব্য	কুলপুত্রের প্রতি শ্রমণ-ব্রাহ্মণের কর্তব্য
১	শ্রদ্ধাসহকারে শ্রমণ-ব্রাহ্মণের সেবা-যত্ন করতে হয়	কুলপুত্রকে পাপ হতে রক্ষা করতে হয়
২	অবারিত চিত্তে অন্ন-বস্ত্র দান দাও, পূজা ও সম্মান কর, ধর্ম শ্রবণ কর বলে জনগণকে শ্রদ্ধা সম্পন্ন করে তুলতে হয়	ভালো কাজে নিয়োজিত হবার পরামর্শ দিতে হয়
৩	মৈত্রীযুক্ত বাচনিক কর্মের দ্বারা তাঁদের মঙ্গল কামনা করতে হয়	সর্বদা মঙ্গল চিন্তা করতে হয়
৪	সর্বদা মৈত্রীযুক্ত মানসিক কর্মের মাধ্যমে অভ্যর্থনা করতে হয়	অশ্রুত মঙ্গল বিষয় শোনাতে হয়
৫	উৎকৃষ্ট আহার্য বস্তু দান দিতে হয়।	জানা ভুল বিষয় সংশোধন করে দিতে হয়
৬		ভালো-মন্দ, স্বর্গ মার্গ প্রদর্শন করাতে হয়।

সারণি : ১৮

উপর্যক্ত আলোচনার মাধ্যমে নির্দ্বিধায় বলা যায় সামাজিক দায়িত্ব কর্তব্য পালনে নি:সন্দেহে পরিপূর্ণ পদ্ধতি এগুলো। এ নিয়মগুলো যথাযথ অনুশীলন করলে অবশ্যই শৃঙ্খলাবদ্ধ, সুন্দও, সার্থক সমাজজীবন গঠিত হবে।

'চক্কবত্তি সিংহনাদ সূত্রে' বুদ্ধ আদর্শ শাসকের দায়িত্ব কর্তব্যসমূহের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। এর মাধ্যমে বুদ্ধ একজন আদর্শ শাসক/রাজার দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ কেমন হওয়া উচিত সেই সম্পর্কে একটি অসাধারণ ধারণা প্রদান করেন। আদর্শ শাসক/রাজার দায়িত্ব-কর্তব্যগুলো হলো[১১৩] :

চিত্র ৭ : আদর্শ শাসকের দায়িত্ব কর্তব্য

তাছাড়াও মহাসুদস্সন সূত্রে বুদ্ধেও বর্ণিত শিক্ষা, রাজাপ্রজার সম্পর্ক হবে পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যকার সম্পর্কেও মতো।[১১৪] এর মাধ্যমে আদর্শ শাসকের নৈতিক দিকটি ফুটে ওঠে।

সুশাসনের জন্য সহিষ্ণুতা ও সাম্যতা

বুদ্ধেও শিক্ষায় সহিষ্ণুতা ও সাম্যেও উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনায় সকল নাগরিকের প্রতি সমান দৃষ্টিভঙ্গি ও সুযোগ প্রদান করা উচিত। ব্যক্তি তথা শাসক ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ বা সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের প্রতি সম্মান ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সহিষ্ণুতা হলো সকল মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও সম্মান প্রদর্শন। ধর্মীয় সহিষ্ণুতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সকল ধর্মেও মানুষের প্রতি যথার্থ মর্যাদা, সম্মান ও সহানুভূতি প্রদর্শন করতে হবে। সহিষ্ণু ও সম্মানজনক আচরণ করতে হবে। সহিষ্ণুতা ও সাম্য সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ তৈরি করে। বৌদ্ধধর্মেও প্রবর্তক অহিংসা, শান্তি, মৈত্রীতে বিশ্বাসী ভগবান গৌতম বুদ্ধ যে ধর্ম ও বিনয় প্রচার করেছিলেন

তার মূলভিত্তি হলো সহিষ্ণুতা। বৌদ্ধধর্মেও প্রতিটি পরতে পরতে ফুটে উঠেছে সহিষ্ণুতার ছাপ। স্বয়ং বুদ্ধ তার ধর্ম প্রচারের সর্বক্ষেত্রেই সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন। মহামানব গৌতম বুদ্ধ তার জন্মগ্রহণের পর বাল্যকাল থেকে শুরু কওে গৃহত্যাগ, সাধনা, বুদ্ধত্ব লাভ ও ধর্মপ্রচারসহ সকল ক্ষেত্রে সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। রাজপুত্র হয়েও তিনি দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছেন। দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় বের করতে তিনি ধ্যানসাধনায় যে ধৈর্য শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা অুলনীয়।[১১৫] বোধিসত্ত্বরূপী ভগবান বুদ্ধেও ক্ষান্তির পরিচয় পাওয়া যায় যা সহিষ্ণুতার মূলভিত্তি। ক্ষান্তিবাদী জাতকে দেখা যায় বোধিসত্ব এশবার কুন্ডাল কুমার নামে জন্মগস্থহণ করেছিলেন। একদিন বারানসীর রাজা কলাবুর নর্তকীরা নৃত্য-গীত বন্ধকওে বোধিসত্ত্ব তাপসের নিকট ধর্মশ্রবণে মগ্ন হয়। তখন রাজা রাগান্বিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেন, তাপস, তুমি কোন মতালম্বী? উত্তওে বোধিসত্ত্ব বলেন, "ধামি ক্ষান্তিবাদী।" অত:পর রাজা যতবার জিজ্ঞেস করলেন তিনি একই উল্টর দিলেন। অুঃপর রাজা জল্লাদ ডেকে বোধিসত্ত্বেও হাত, পা, কর্ণ প্রভৃতি ছেদন করলেন এবং অনেক অত্যাচার করলেন। কিন্তু তারপরও বোধিসত্ত্ব রাজার প্রতি সহনশীল ছিলেন। তাঁর সহনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় নিম্নোক্ত গাঁথার মাধ্যমে :

"হস্ত, পদ, নাসা, কর্ণ, ছেদিয়া যে জন
করিলেন মোর এই দারুণ পীড়ন;
চিরজীবি হয়ে যেই থাকুক নৃপতি,
মাদৃশ জনের ক্রোধ অসম্ভব অতি।"[১১৬]

চিত্তের একাগ্রতাই সমাধি। তীব্র কামনা-বাসনা, হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতি মনোভাব হতে মুক্ত হয়ে একটি নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে উন্নীত হওয়া এবং এ স্তওে নিজের চিত্তকে ধওে রাখার সাধন প্রক্রিয়াই সম্যক সমাধি। অর্থাৎ, এক্ষেত্রেও চিত্তকে ধওে রাখার ক্ষেত্রে সহিষ্ণুতা অর্থাৎ, ধৈর্যশীল মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে।

সকল প্রকার পরিস্থিতিতে ধৈর্যধারণ কওে ক্ষমাশীল হওয়ার নামই ক্ষান্তি। আর ক্ষান্তি পারমী হচ্ছে সহনশীলতার সাধনা। 'ক্ষান্তি' শব্দের অর্থ হল ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, নিবৃত্তি ইত্যাদি। ক্ষমা মহত্ত্বেও লক্ষণ। *'বুদ্ধদেব'* গ্রন্থে বলা হয়েছে, "পৃথিবীতে নানাবিধ শুচি অশুচি বস্তু নিক্ষিপ্ত হলেও পৃথিবী নিরবে সহ্য কওে, নিক্ষিপ্তকারীর প্রতি দয়া বা ক্রোধ কিছুই প্রদর্শন কওে না। সেরূপ সকল মান-অপমান সহ্য কওে ক্ষান্তি পারমী পূর্ণ কওে সম্বোধি লাভ করতে হয়।"[১১৭] এখানে মূলত সহিষ্ণুতাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। *'মহাকপি জাতকে'*[১১৮] ক্ষান্তি পারমী পূরণের মাধ্যমে সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়। *'মহাকপি জাতকে'* আরও উল্লেখ আছে্ "মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে অসহ্য যন্ত্রণাক্রিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও বোধিসত্ত্বরূপী বানওে লোকটির প্রতি কোন প্রকার শত্রুভাবাপন্ন মওেত্তির উদয় করেনি।"[১১৯] এখানে দেখা যায়, বানর লোকটিকে ক্ষমা কওে দিয়েছেন এবং সব কিছু সহ্য কওে নিয়েছেন। সকল প্রকার জীবের সুখ ও কল্যাণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করার নামই বীর্য পারমী। পরাক্রম, দৃঢ়তা, সহনশীলতা হলো বীর্য এর প্রতীক। মহাকপি জাতকের দশ পারমীর মধ্যে বীর্য পারমী অন্যতম। মহাকপি জাতকে লোকটিকে কুপ থেকে ওানোর সময়

যাতে দুর্ঘটনায় কবলিত না হন তা নিশ্চিত হওয়ার জন্যে বানর পিঠে পাথরখণ্ড রেখে যে পরীক্ষা করেছিল তা হল বীর্য পারমী।[১২০] এখানে বানর পিঠে পাথরখন্ড রেখে পরীক্ষা করার সময় অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন যা সহিষ্ণুতার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

মহাবোধি জাতকে দেখা যায়, মহাবোধিরূপী বোধিস্বত্ত্ব তাপস রাজার সমস্ত অপমান সহ্য কওে, মিশ্র অন্ন ভোজন কওে রাজ্যেও মঙ্গল চিন্তা কওে সেখানেই অবস্থান করছিলেন। নিজের মৃত্যু হবে জেনেও সহনশীল চিত্তে নিজের কর্ম কওে যাচ্ছিলেন।[১২১] এখানে সহনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

'*ধম্মপদ*'-এর অন্তর্গত অপ্রমাদ বর্গে দৃঢ়, ধৈর্যশীল, সহনশীল হওয়ার কথা বলা হয়েছে তা অপ্রমাদ বর্গেও গাথায় বলা হয়েছে :

"তে ঝাযিনো সাততিকা নিচ্চং দলহপরক্কমা,
ফুসন্তি ধীরা নিব্বানং যোগকখেমং অনুওরং॥"[১২২]

অর্থাৎ, যে সকল ধ্যানী, অধ্যবসায়ী উদ্যোগী ও নিয়ত দৃঢ়পরাক্রমশালী, তারা ক্রমে প্রশান্ত নির্বাণ লাভ করবেন। কেউ ধ্যানী, অধ্যবসায়ী হতে চাইলে অবশ্যই সহনশীল হতে হবে। কোনো অবস্থাতেই বাধাকে বাধা মনে করা যাবে না। সব বাধাকে জয় করতে হবে। চিত্ত স্বভাবত চঞ্চল। এ চঞ্চল চিত্তকে স্থিও রাখাও এক প্রকার দৃঢ়তা। সংযত চিত্তের ক্ষেত্রে সহিষ্ণুতার গুরুত্ব অপরিসীম। '*ধম্মপদ*'-এর অন্তর্গত '*চিত্তবর্গে*' আছে :

"দুন্নিগ্‌গহস্‌স লহুনো যত্থকাম নিপাতিনো
চিত্তস্‌স দমতো সাধু, চিত্তং দন্তং সুখাবহং।"[১২৩]

অর্থাৎ, দুর্দমনীয়, লঘু, যথেচ্ছ বিচরণশীল চঞ্চল চিত্তকে দমন করাই ভালো। সংযত চিত্তই সুখ প্রদান করে।

আবার '*ধম্মপদ*'-এর অন্তর্গত '*যমকবর্গে*' বলা হয়েছে

"ন হি বেরেন বেরানি সম্মন্তী'ধ কুদাচনং
অবেরেন চা সম্মন্তি, এস ধম্মো সনন্তনো॥"[১২৪]

অর্থাৎ, শত্রুতার দ্বারা কখনো শত্রুতা প্রশমিত হয় না। শত্রুহীনতার দ্বারাই শত্রুতা প্রশমিত হয়। এটিই হলো সনাতন ধর্ম।

শত্রুর সাথে সহনশীল থেকে শত্রুতা না কওে মিত্রতার মাধ্যমে শত্রুকে জয় করতে হবে।

সহিষ্ণুতার অন্যতম একটি গুণ হল ধৈর্য্য। বিদুরপণ্ডিত জাতকে[১২৫] দেখা যায় যক্ষ সেনাপতি পূর্ণক বিদুর পণ্ডিতকে পাথরের সাথে আঘাত করলে, এমনকি মারতে চাইলে বিদুর পণ্ডিত রাগান্বিত না হয়ে ধৈর্য্যেও সাথে সব কিছু সহ্য কওে পূর্ণকের কাছে স্থানন্ত বৃত্তান্ত জানার পর পূর্ণকে সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল চিত্তে বিদুর পন্ডিত ক্ষমা কওে দিয়ে তাদেও ইচ্ছা পুরণ করেন এবং ধর্মদেশনা করেন।

পঞ্চশীলের প্রথম শীলে বলা হয়েছে- 'পাণাতিপাতা বেরমণী সিকখাপদং সমাদিযামি।'[১২৬] এখানে প্রাণীহত্যা থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে। সকল প্রাণীর প্রতি সহনশীল বজায় রাখতে হবে। যাতে অসাবধানতাবশত: ও কোনো প্রাণী হত্যা না করতে হয়।

বজ্রাসনে বুদ্ধেও দৃঢ়তা অন্যতম। বজ্রাসন হচ্ছে যে আসনে বসে বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন সিদ্ধার্থ গৌতম। এখানে বসে বুদ্ধ সকল বাধা সহ্য কওে দৃঢ়তার সাথে ধ্যান সাধনা কওে গেছেন। বুদ্ধ নিজে সম্যকরূপে চিত্তের একাগ্রতা সাধন কওে বোধিজ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়েছেলেন। তিনি বলেন :

ইহাসনে শুষ্যতমে শরীরং ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং কল্প দুলাভং নৈবাসনাৎকায়মতশ্চলিষ্যতে।[১২৭]

অর্থাৎ, এ আসনে আমার শরীর শুকিয়ে যাক, চর্ম, অস্থি, মাংস প্রলয়ে ডুবে যাক। বোধিজ্ঞান লাভ না করা পর্যন্ত আমি এ আসন ত্যাগ করবো না। চার ব্রহ্মবিহারের প্রথম ধাপ মৈত্রী। মৈত্রী অর্থ মিত্রতা, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা ইত্যাদি। মৈত্রী ভাবনার মাধ্যমে ক্ষমাশীল হওয়া যায়। দেবদত্তের প্ররোচনায় অৎাতশত্রু বুদ্ধেও প্রাণনাশের জন্য ঘাতক নিযুক্ত করেছিলেন। গুপ্ত ঘাতক জেনেও বুদ্ধ অৎাতশত্রুকে ক্ষমা প্রদর্শন করেছিলেন।[১২৮] মৈত্রী বাণী দেশনা কওে তাকে স্বধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন। সহিষ্ণুতার অন্যতম দৃষ্টান্ত এটি।

৮. সুশাসন ও সপ্ত অপরিহানীয় নীতি

মহামতি বুদ্ধ প্রতিষ্ঠিত সংঘ গণতান্ত্রিক ধারার প্রতীক যার মাধ্যমে বহুজনের মতামতকে প্রাধান দেওয়ার কথা জানা যায়। বলা যায় সংঘ গণতান্ত্রিক চুেনার ধারাকে বেগবান কওে আর গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে অগ্রে স্থান দেয়। রাজ্য সুন্দও ও সততার সাথে পরিচালনা করার জন্য সর্বস্তরের পরামর্শ নেওয়ার কথা বলেন বুদ্ধ।[১২৯] বুদ্ধ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন যা তাঁর সময়ে সংযুক্ত গুরাজ্য থেকে ধারণা পাওয়া যায়। বুদ্ধেও সময়কালে বৃজিদেও আটটি গণ রাজ্য ছিল। এই গুরাজ্যগুলো গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাত্যহিক কর্তব্য সম্পাদন করতো। বৃজিরা সাহসী, উদার, মানবিক, প্রজ্ঞাবান ও যোগ্য নেতৃত্বকে গোষ্ঠীর প্রধান হিসেবে নির্বাচন করতেন। বৃজিদেও মধ্যে সহজেই নিরাপরাধ কাউকে শাস্তি পেতে হতো না। বুদ্ধ সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বহুত্ববাদী মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে রাজ্য/রাষ্ট্র পরিচালনা করার কথা বলেন। বলেন ঐক্যবদ্ধতার কথা। মৈত্রীর কথা। মৈত্রীযুক্ত চিত্তে এবং ঐক্যবদ্ধতায় কোনো সিদ্ধান্ত গস্থহণ করলে রাজ্যে কোনো প্রকার অশান্তি থাকে না। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় না। এক সময় বুদ্ধ বৃজিদেও যশঃ-খ্যাতি, সমৃদ্ধিও কথা বলতে গিয়ে সপ্তঅপরিহানীয় নীতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন। এই নীতিগুলোর মধ্যে গণতান্ত্রিক চুেনার বীজ দেখা যায়।

গণতন্ত্র চর্চা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এই সপ্ত অপরিহানীয় নীতি জোড়ালো ভূমিকা পালন করে। বুদ্ধ বৃজিদেও প্রশংসা করতে গিয়ে যে মূল্যবান উপদেশ[১৩০] প্রদান করেন তা নিম্নরূপ :

Dhaka University Institutional Repository

- যাবকীবঞ্চ বজ্জী অভিণ্হা সন্নিপাতা সন্নিপাতবহুলা ভবিস্সন্তি বুদ্ধিযেব পাটিকঙ্খা নো পরিহানি। অর্থাৎ, বৃজিরা যতদিন সর্বদা সভা-সমিতিতে একত্রিত হয়ে গমন করবে ততদিন তাদেও পরাজয় হবে না।
- যাবকীবঞ্চ বজ্জী সমগ্গা সন্নিপতিস্সন্তি সমগ্গা বুট্ঠহিসস্ন্তি সমগ্গা বজ্জী করণীয়ানি করিস্সন্তি বুদ্ধিযেব পাটিকঙ্খা নো পরিহানি। অর্থাৎ, যতদিন বৃজিরা একতাবদ্ধভাবে সভা-সমিতিতে সম্মিলিত হয়ে সভা শেষে একত্রে চলে যাওয়া এবং সভায় প্রস্তাবিত কার্যাবলি ঐক্যমতের ভিত্তিতে সম্পাদন করবে ততদিন তাদেও পরাজয় হবে না।
- যাবকীবঞ্চ বজ্জী অপঞ্ঞত্তং ন পঞ্ঞপেস্সন্তি, পঞ্ঞত্তং ন সমুচ্ছিন্দিস্সন্তি যথা পঞ্ঞত্তে বজ্জীধম্মে সমাদায বত্তিস্সন্তি বজ্জীনং নো পাটিকঙ্খা পরিহানি। অর্থাৎ, যতদিন বৃজিরা সমাজ ও দেশে পূর্বে প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থার পরিবর্তন করবে না এবং যথাবিহিত প্রাচীন বিধিব্যবস্থাসমূহ পালন করবে ততদিন তাদেও পরাজয় হবে না।
- যাবকীবঞ্চ বজ্জী যে তে বজ্জীনং বজ্জী মহল্লকা তে সক্করিস্সন্তি মানেসসন্তি পূজেস্সন্তি তসঞ্চ সোতব্বং মঞ্ঞিস্সন্তি বজ্জীনং নো পাটিকঙ্খা পরিহানি। অর্থাৎ, যতদিন বৃজিরা গুরু, বয়োঃবৃদ্ধ ও জ্ঞান বৃদ্ধদেও প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করবে এবং তাঁদেও উপদেশ মেনে চলবে ততদিন তাদেও পরাজয় হবে না।
- যাবকীবঞ্চ বজ্জী যা তা কলিত্থিযো, কুলকুমারিয়ো, তা ন ওক্কস্স পসয্হ বাসেসন্তি বুদ্ধযেব বজ্জীনং পাটিকঙ্খা নো পরিহানি। অর্থাৎ, কুলবধূ ও কুলকুমারী (নারীদের) প্রতি যতদিন বৃজিরা সম্মান প্রদর্শন ও তাঁদেও মর্যাদা রক্ষা করবেন ততদিন তাদেও পরাজয় হবে না।
- যাবকীবঞ্চ বজ্জী যানি তানি বজ্জীনং বজ্জিচেতিযানি, অব্ভন্তরানি চেব বাহিরানি চ, তানি সক্করিস্সন্তি গুরু করিসসন্তি মানেসসন্তি পূজেস্সন্তি তসঞ্চ দিন্নংপুব্বং কুপুব্বং ধম্মিকং বলিং পরিহাপেসসন্তি বজ্জীনং পাটিকঙ্খা নো পরিহানি। অর্থাৎ, যতদিত বৃজিরা অভ্যন্তওে ও বহির্ভাগে প্রতিষ্ঠিত চৈত্যগুলোর সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্মান প্রদর্শন করবে এবং প্রাপ্ত রাজস্বাদি আত্মসাৎ না করবে না ততদিন তাদেও পরাজয় হবে না।
- যাবকীবঞ্চ আনন্দ বজ্জীনং অরহন্তেসু ধম্মিকারক্খাবরণগুত্তি সুসংবিহিতা ভবিস্সন্তি কিন্তি অনাগতা চ অরহন্তো বিজিতং আগচ্ছেয্যুং আগতা চ অরহন্তো বিজিতে ফাসুং বিহরেয্যুন্তি বজ্জীনং পাটিকঙ্খা নো পরিহানি। অর্থাৎ, যতদিন বৃজিরা শীলবান সৎপুরুষদেও সেবা করবে, ভরণ-পোষণ করবে ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে ততদিন তাদেও পরাজয় হবে না।

বর্তমান প্রযুক্তি নির্ভও বিশ্ব টেশসই সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে কাজ কওে যাচ্ছে। টেশসই সমাজ যেখানে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের পাশাপাশি সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। আর এই উন্নয়নে বুদ্ধ নির্দেশিত সপ্ত অপরিহানীয় নীতির গুরুত্ব অপরিসীম । সাতটি নীতির আলোকে বলা যায় যে, এর প্রথমে ঐকের বিষয়ে উল্লেখ পাওয়া যায়। 'ঐক্য' মানে একতা শক্তি সকল পরিস্থিতিতে সবার ঐক্যবদ্ধ থাকা। সমাজজীবনে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই নীতির ভুমিকা রয়েছে। ঐক্যবদ্ধশক্তির দ্বারা সকলপ্রকার পরিস্থিতি মোকাবেলা করা যায় এবং যেকোনো লক্ষ্য অর্জন করা সহজ হয়। কেননা, ঐক্যবদ্ধ চুনার ওপর নির্ভও কওে সমাজ ও দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও স্থিতিশীল। ঐক্যেও

Dhaka University Institutional Repository

শক্তিতে সভ্যতার বিবর্তন এসেছে, হয়েছে বিকশিত ও প্রকাশিত। সমাজে শান্তিপূর্ণ ও পরিপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য ঐক্যবদ্ধ থাকার বিকল্প নেই। অর্থাৎ, বুদ্ধ প্রদর্শিত সাতটি নীতি আজ মানবসমাজ জাতি ও সম্প্রদায়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সপ্ত অপরিহানীয় নীতি শিক্ষায় পাওয়া যায় ব্যক্তিবর্গ যখন সমাবেশে একত্রে মিলিত হয়, তখন ঐক্য ও সংহতি থাকে। যখন একটি সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, সংগঠন একত্রে সংগঠিত হয়ে সভায় উপস্থিত হন এবং সর্বসম্মতভাবে তাদেও উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে সম্মত হয়, তখন ঐক্য ও সংহতির নীতিগুলি আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

যখন মন্দ, অমঙ্গলজনক, অশল্যাণ নীতি ও ধারণা বাস্তবায়ন থেকে বিরত থাকে, সৎ ও উৎকৃষ্ট নিয়ম-কানুন মেনে চলে এবং সকলের কল্যাণের জন্য পূর্ব থেকে প্রচলিত হয়ে আসা সকল বিধি-বিধান ও বিচার-বিধান অনুসরণ কওে, তখন সেই জাতি সর্বত্র প্রশংসিত, গৃহিত হয়। যখন একটি জাতি তথা সমাজ প্রবীণদেও সম্মান, শ্রদ্ধা কওে এবং তাদেও আদেশ-উপদেশ-নির্দেশনা অনুসরণ কওে, তখন সেখানে ঐক্য, সংহতি, শান্তি এবং শৃঙ্খলা বিরাজমান হয়। যখন একটি রাষ্ট্র নারীদেও নির্যাতন না কওে যথার্থ সম্মান, মর্যাদা, তাদেও অধিকার প্রদান কওে সেখানে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা পায় এবং নারীর ক্ষমতায়ন সুনিশ্চিত হয়। একটি জাতি, সমাজ, রাষ্ট্র যখন সকল ধর্মকে সম্মান কওে তখন সকল ধর্মেও মধ্যে সম্প্রীতি বিদ্ধমান থাকে। অবশেষে, যখন একটি জাতি ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে সম্মান ও যথার্থ মর্যাদা প্রদান কওে, তখন সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। তখন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সদ্ভাব, সর্বত্র বিরাজ করে। যার ফলশ্রুতিতে সম্প্রদায়, সমাজ ও রাষ্ট্র আদর্শ সমাজের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। মোটকথা, বুদ্ধেও নির্দেশিত এই গুরুত্বপূর্ণ সাতটি নীতি মেনে জীবনযাপন করলে অসুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দলাদলি, দ্বন্ধ, বিশৃঙ্খলা এবং অভ্যন্তরীণ কলহ-বিবাদ দূও হয়ে যাবে। অতএব, বুদ্ধেও সপ্ত অপরিহানীয় নীতি অনুসরণ করা হলে ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও বিজয় অনিবার্য। যেটি সমাজের চালিকাশক্তি গণতন্ত্র ও সুশাসন সুপ্রতিষ্ঠায় কার্যকারী ভূমিকা পালন করে। নৈতিক ও ধর্মীয় নীতি ছাড়া একটি আদর্শ সমাজব্যবস্থার কোন ভিত্তি নেই। সামাজিক উন্নতি বিকাশের ক্ষেত্রে, নৈতিক নীতিগুলি সমাজকে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। একটি সমাজ নৈতিক নীতি ছাড়া সুষ্ঠভাবে চলতে পাওে না, তেমনি নৈতিকতাও নির্ভও কওে সমাজে নৈতিকতার শিক্ষা কতটা গুরুত্বেও সাথে নেয় তার উপর। শুধুমাত্র এই দুটি গতিশীলতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক দিয়ে একটি রাষ্ট্র উন্নতি থেকে উন্নতি করতে পাওে, যেমনটি বৈশালী করেছিলেন সপ্ত অপরিহানীয় নীতি অনুসরণ করে।

বর্তমানে সকলের ২১২ খশান্তি সমৃদ্ধিময় জীবনযাপনের জন্যে টেশসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় ১৭টি আন্তঃসংযুক্ত বৈশ্বিক লক্ষ্যেও পরিকল্পনা করা হয়েছে। ১৭টি লক্ষ্যে মধ্যে লক্ষ্য ৫ হলো নারী পুরুষের সমতা। এখানে বলা হচ্ছে লিঙ্গ সমতা এবং সকল নারী ও মেয়েদেও ক্ষমতায়ন। লক্ষ্য ১৬ হলো শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান। এখানে বলা হচ্ছে টেশসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভূক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তওে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ সপ্ত অপরিহানীয়

Dhaka University Institutional Repository

নীতিগুলো মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে বুদ্ধ প্রদর্শিত সপ্ত অপরিহানীয় নীতিগুলো সুশৃঙ্খল ও টেশসই সমাজ বিনির্মাণে অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করে।

৯. সুশাসন ও সম্যক জীবিকা

বুদ্ধ সমাজবিনির্মাণের জন্য সকলের পালনীয় একটি নির্দেশনা প্রদান করেন যা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ নামে পরিচিত। এগুলো হলো : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, এবং সম্যক সমাধি।[১৩১] সম্যক জীবিকা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে পঞ্চমত মার্গ। এখানে 'সম্যক' বলতে প্রকৃত অর্থ শুদ্ধ, যথার্থ, সঠিক, সুন্দও, এবং পত-পবিত্রতা, নির্মল ও নিষ্কলুষতাকে বোঝায়। জীবিকা মানে অবলম্বন। বুদ্ধ মিথ্যা জীবিকাকে সর্বতোভাবে ত্যাগ কওে সতত সুন্দও, বিশুদ্ধ, নিষ্কলুষ জীবনযাপনকে সম্যক জীবিকা বলে অভিহিত করেন।[১৩২] এটি হলো নৈতিক ও সামাজিক জীবনের মূলভিত্তিগুলোর একটি। সম্যক জীবিকার অন্তর্নিহিত স্বরূপ সম্পর্কে জানার জন্য নিচের উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য:

> 'there is the case where a noble disciple having abandoned untruthful living keeps his life going with true livelihood. This is called livelihood'.[১৩৩]

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জীবিকা অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করে। যাপিত জীবনে জীবিকার উপওে সুখ-যশ-খ্যাতি সবই নির্ভও করে। পুত-পবিত্র জীবন ধারণের জন্য সৎ, মহান ও কুশল পেশা আবশ্যক। ফলশ্রুতিতে জীবন সুন্দও হয়। '*সুত্তনিপাত*' গ্রন্থে বুদ্ধ সৎভাবে জীবনধারণ করাকে উত্তম মঙ্গল কথা বলে উল্লেখ করা রয়েছে।[১৩৪] জীবিকা গ্রহণের ক্ষেত্রে চিত্তকে প্রাধান্য দিতে হয়। কারণ চিত্তই বন্ধু। চিত্তই ধ্বংসের কারণ। এ বিষয়ে '*ধম্মপদ*' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে : 'সতত সুন্দরভাবে জীবনধারণে চিত্ত মানুষের যে উপকার করতে পাওে মাতা-পিতা কিংবা আর কোনো জ্ঞাতি বা আত্মীয়-স্বজন তা করতে পাওে না কখনো।[১৩৫] সৎভাবে জীবন যাপন করলে কোনো প্রকার অশান্তি হয় না শান্তি স্থাপিত হয়। ঝসড়া-বিবাদ থাকে না। নানারকম অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চিরতওে বিদূরিত হয়। একজন সুশাসককে ন্যায়-পরায়ণ হতে হয়। পক্ষপাতহীন হতে হয়। সুশাসকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে '*জাতক*' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে এভাবে : 'রাজা বিচারিক কার্যক্রম অত্যন্ত সততা ও ন্যায়-পরায়ণতার সম্পদন করতেন। বিচারিক কার্যক্রম সুন্দরভাবে সম্পাদন হতো বলে কোনো মন্দব্যক্তিকে দেখা যেতো না। বিচার প্রার্থীদেও কোনো প্রকার উচ্চধ্বনি বা উচ্চস্বও শোনা যায় না। এমন কি বিচার কার্য সম্পাদনকারী অমাত্য বিচারকার্য সম্পাদনের জন্য দীর্ঘক্ষণ বসে থেকে বিচারের জন্য কাউকে না পেয়ে দিন শেষে আনন্দ মনে বাড়ি ফিওে যেতেন।[১৩৬] মানুষ জীবিকা অন্বেষণে পেশা নির্বাচনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। পেশার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি সমাজে মাথা উঁচু কওে দাঁড়াতে পারে। সমাজে মাথা নত হয় কিংবা মান-সম্মান বির্সজিত হয় এমন কর্ম বা পেশা গস্থহণ না করই উত্তম। মানুষ মাত্রই জীবিকার উপর নির্ভরশীল। এমতাবস্থায় '*অঙ্গুত্তর নিকায়*' গ্রন্থেও মাধ্যমে জানা যায়, বুদ্ধ পাঁচ প্রকারের বাণিজ্য থেকে দূওে থাকার কথা বলেন।[১৩৭] যথা :

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৮ : পঞ্চ বাণিজ্য

উপরি-উক্ত বাণিজ্যগুলো সকলের জন্য ক্ষতিকর। রাষ্ট্র এবং সমাজের কথা চিন্তা কওে এই পঞ্চবিধ বাণিজ্য করা থেকে বিরত থাকার কথা উল্লেখ রয়েছে।[১৩৮] সম্যক জীবিকাকে নৈতিক আচার-আচরণের উপর প্রতিষ্ঠিত শান্ত, স্থিতিশীল অর্থনৈতিক ও সামাজিক আচরণ বলা হয়। সম্যক জীবিকার মূল বৈশিষ্ট্য নিচে একটি চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো। চিত্রটি নিম্নরূপ:

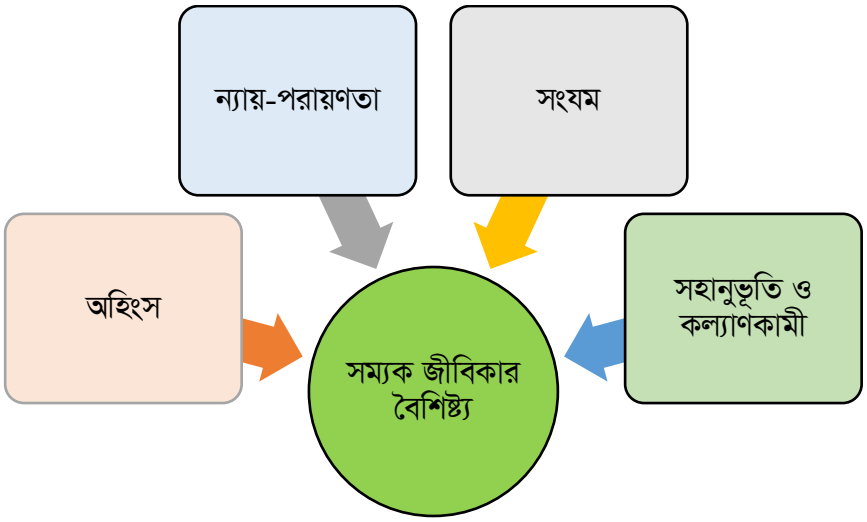

চিত্র ৯ : সম্যক জীবিকার বৈশিষ্ট্য

রাজ্য বা রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রজাসাধারণের জন্য সৎ জীবিকা ব্যবস্থা করা শাসকের দায়িত্ব-কর্তব্য। সৎ জীবিকায় সুশাসন যেমন স্থিতিশীল থাকে তেমনি আবার রাজ্য/রাষ্ট্র থাকে শান্ত। সুতরাং সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি সর্বস্তরের জনসাধারণের সুখ, সমৃদ্ধি ও কল্যাণের জন্য সৎ জীবিকা বা সম্যক জীবিকা অবলম্বণ করা

Dhaka University Institutional Repository

আবশ্যক। এতে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং সর্বোপরি রাজ্য/রাষ্ট্রে পারস্পরিক আন্তরিকতা, বিশ্বাস, মর্যাদা, সদ্ভাব, সম্প্রীতি শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে। সুশাসক মাত্রই সম্যক জীবিকার মাধ্যমে জীবনধারণে সবাইকে উৎসাহী কওে তুলবে। আধুনিক সমাজব্যবস্থায়ও বুদ্ধ নির্দেশিত সম্যক জীবিকায় জীবনধারণ করা সম্ভব। এরূপ একটি ব্যাখ্যা নিম্নরূপ:

সম্যক জীবিকার ক্ষেত্র	সম্যক জীবিকার প্রয়োগ
ব্যবসা-বাণিজ্য	সততা ও ন্যায়-পরায়ণতার সাথে পরিবেশবান্ধব ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রদান করা।
কৃষি	টেশসই কৃষি পদ্ধতির ব্যবহার যেখানে কোনো প্রকার রাসায়নিক দেওয়া হয় না।
চাকুরি	এমন চাকুরি করতে হবে যেখানে অন্যায় কোনো কাজ করতে না হয়। অর্থাৎ. এমন চাকুরিতে নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে যার মাধ্যমে অন্যেও যেন কোনো ক্ষতির কারণ না হয়।
প্রযুক্তি	নৈতিক প্রয়োজনে উদ্ভাবন এবং ব্যবহার

সারণি : ১৯

১০. উপসংহার

বুদ্ধের নৈতিক শিক্ষা সুশাসনের জন্য একটি আদর্শ ভিত্তি প্রদান করে। এটি ন্যায়বিচার, শান্তি, সহানুভূতি এবং জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, যা একটি সুস্থ ও উন্নত সমাজ গঠনের জন্য অপরিহার্য। বুদ্ধের শিক্ষা অনুসরণ করে নেতা ও নাগরিকরা একটি ন্যায়সঙ্গত ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গঠন করতে পারেন। এইক্ষেত্রে বুদ্ধ প্রদর্শিত পঞ্চশীল, অষ্টবিধ মার্গ, দশবিধ রাজধর্ম, সপ্ত অপরিহানীয় নীতি শুধুমাত্র কতগুলো প্রচলিত নিয়ম নয়। নীতিগুলো গণতন্ত্রকে সুসংহত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করে সুশাসন নিশ্চিত করেন। একবিংশ শতাব্দীতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বুদ্ধের চিন্তা-চেতনা গুরুত্ব যেন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ ও টীকা :

১. *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, পরিমার্জিত সংস্করণ (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০১৪), পৃ. ১১৬৬

২. Hasnat Abdul Hye, *Goverance South Asian Perpectives,* 1st ed. (Dhaka : The University Press Limited, 2000), p. 166

৩. Rao, D. B. S., *Guidelines for Good Governence,* 1st ed. (Dhaka : Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pasific (CIRDAP) 2005), p. 142

৪. *Towards Sustainable Development that Leaves no one behind*, 2013, p. 1-27 https://www.atd-fourthworld.org/wp content/uploads/sites/5/2015/07/Working_Paper_ATD_Fourth_World_Participatory_Research_June_2013.pdf

৫. Dr. Rahul Tripathi, *Good Governance : Origin, Importance and Development in India*. *International Journal of Development Research* (IJDR), 2017 Vol. 07, Issue, 11, p. 16968-16970

৬. Ibid, p. 50

৭. ভদন্ত ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, ভদন্ত সুমন স্থবির ও অন্যান্য অনূদিত, *অঙ্গুত্তর নিকায়*, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ নিপাত, তৃতীয় প্রকাশ (রাঙ্গামাটি : বনভন্তে প্রকাশনী, ২০১৫), পৃ. ৭৪-৭৫

৮. প্রাগুপ্ত, পৃ. ৭৬-৭৭।

৯. শ্রী ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত, *জাতক*, দ্বিতীয় খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ (কলিকাতা: করুণা প্রকাশনী, ১৩৮৪ বাংলা), পৃ. ১২

১০. ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, *দীর্ঘ নিকায়*, তৃতীয় খণ্ড, তৃতীয় প্রকাশ (রাঙ্গামাটি : ২০০৭), পৃ. ৯৫

১১. প্রাগুপ্ত, পৃ. ৪২-৭৫।

১২. অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া অনূদিত, *অঙ্গুত্তর নিকায়*, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ (রাঙ্গামাটি:২০০৪, বনভান্তে প্রকাশনী), পৃ. ১৫২

১৩. গিরিশচন্দ্র বরুয়া, *ধম্মপদ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭), পৃ. ১১৭

১৪. শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত, *জাতক*, ষষ্ঠ খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ (কলিকাতা : করুণা প্রকাশনী, ১৩৯১), পৃ. ৩৩৪-৪২৮

১৫. প্রাগুপ্ত, পৃ. ২২৪-২২৫

১৬. পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত, *মিলিন্দ প্রশ্ন* (কলকাতা : ধর্মাধার বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশনী, ১৯৯৫), পৃ. ১৮২

১৭. প্রাগুপ্ত পৃ. ২৯৬

১৮. Venerable Ajahn Chah, *Living Dhamma* (Taipei : The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, Reprinted, 1995), p. 19

Dhaka University Institutional Repository

১৯. ভদন্ত প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু, *অঙ্গুত্তর নিকায়*, পঞ্চম নিপাত (রাঙামাটি : রাজবন বিহার, ২০০৮), পৃ. ২০১

২০. Sunthorn, P., *Basic Buddhist Course.* 1st ed. (USA: 1991), p. 23

২১. *ধম্মপদ*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৫০

২২. ভিক্ষু শীলভদ্র, *দীর্ঘ নিকায়*, দ্বিতীয় খণ্ড (কলিকাতা : মহাবোধি সোসাইটি, ১৯৫৪), পৃ. ১৬০

২৩. ভদন্ত বুদ্ধবংশ ভিক্ষু, *পারাজিকা*, প্রথম প্রকাশ (চট্টগ্রাম : ২০০৭), পৃ. ৬৪

২৪. *পারাজিকা*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৬৬

২৫. *ধম্মপদ*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৬৬

২৬. সাধনানন্দ মহাস্থবীর অনূদিত, *সুত্তনিপাত* (রাঙ্গামাটি : ১৯৮৭), পৃ. ১০২

২৭. *অঙ্গুত্তর নিকায়*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৪১

২৮. *সুত্তনিপাত*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১১৬

২৯. *ধম্মপদ*, প্রাগুপ্ত পৃ. ১৪১

৩০. রাজগুরু ধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির অনূদিত, *মহাপরিনিব্বানং সূত্তং*, (তাইওয়ান: সন অনুল্লেখিত, করপর‍্যাট বডি অব দি বুদ্ধ এডুকেশনাল ফাউন্ডেশন), পৃ. ২৮-২৯

৩১. Ven. Dr. Hang Lien Bhikkhuni, *Nurturing Inner to Peace to Contribute to World Peace*, *Cultivating Inner Peace for World Peace*, VOL 2, Most Ven. Dr. ich Duc ien Most Ven. Dr. ich Nhat Tu, (Vietnam : Hong Duc Publishing House, 2025) , p. 21

৩২. শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত, *জাতক*, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ (কলিকাতা : করুণা প্রকাশনী, ১৩৯১), পৃ. ১৫৭

৩৩. ধম্মপদ, প্রাগুপ্ত পৃ. ১০৬

৩৪. প্রাগুপ্ত, পৃ. ১০৭

৩৫. John Hamilton Hallowell, *Main currents in Modern Political Thought*, (New York-holt : Rinehart and Winston, 1960), p. 84

৩৬. শান্তপদ মহাস্থবির সংকলিত, *পালি-বাংলা অভিধান*, দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা : বৌদ্ধধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ২০০৮), পৃ. ১৭০১

৩৭. শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত, *জাতক*, প্রথম খণ্ড, পুনমুদ্রণ (কলিকাতা : করুণা প্রকাশনী,১৩৮৪), পৃ.১৮১-১৮২

৩৮. Ajahn Sumedho, *Cittaviveka-The Teaching from the Silent Mind* (Taipei : The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, 1996), p. 38

৩৯. *ধম্মপদ*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১১৭

৪০. শ্রী বেণীমাধব বড়ুয়া অনূদিত, *মধ্যম-নিকায়*, প্রথম খণ্ড (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় : ১৯৪০), পৃ. ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

৪১. Narada, *The Dhammapada (Pali Text & Translation with Stories in Brief & Notes).* 4th ed. (Taiwan: Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, 1993), p. 285

৪২. Butr-Indr, S., *The Social Philosophy of Buddhism.* 3rd ed. (Bangkok : Mahamakut Buddhist University, 1995), p. 150

৪৩. ধম্মপদ, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৫৮

৪৪. T. W Rhys Davids and William Stede, *Pali English Dictionary.* Reprint ed. (Delhi : Motilal Banarisidas Publishers Private Limite, 2003), p. 10

৪৫. Gnanarama, V. P., An *Approach to Buddhsit Social Philosophy*, 1st ed. (Singapore : Ti-Sarana Buddhist Association,1996), p. 57

৪৬. Dhammananda, K. S., *What Buddhist Belive.* 5th ed. (Taiwan: The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, 1993), p. 158

৪৭. *ধম্মপদ*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৪৫

৪৮. *Pali English Dictionary ,* ibid, p. 518

৪৯. *What Buddhist Belive,* ibid, p. 158

৫০. পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্ম্মাধার মহাস্থবির, *মধ্যম নিকায়*, দ্বিতীয় খণ্ড (কলিকাতা : বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর বিহার, ১৯৫৬), পৃ. ৭

৫১. *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, সপ্তদশ পুর্নমুদ্রণ (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০১৪), পৃ. ৫৩৯

৫২. *সুত্ত নিপাত*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৭১

৫৩. ধম্মপদ, প্রাগুপ্ত পৃ. ১১৭

৫৪. *What Buddhist Belive,* ibid, p. 29 p. 158

৫৫. Payutto, P., *A Constition for Living.* 1st impression ed. (Bangkok : Buddhadhamma Foundation, 1998), p. 32

৫৬. শান্তরক্ষিত মহাস্থবির সংকলিত, *পালি-বাংলা অভিধান*, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা : বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ২০০১), পৃ. ৭

৫৭. *ধম্মপদ*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১২৩

৫৮. প্রাগুপ্ত, পৃ. ৫৬

৫৯. অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া, *অঙ্গুত্তর নিকায়*, সপ্তম, অষ্টম, নবম নিপাত, প্রথম প্রকাশ (রাঙ্গামাটি : ২০০৫), পৃ. ৮৪-৮৭

৬০. *সুত্তনিপাত*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১)

৬১. *ধম্মপদ*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৩২

৬২. প্রাগুপ্ত, পৃ. ৪১

Dhaka University Institutional Repository

৬৩. শীলানন্দ ব্রহ্মচারী অনূদিত, *সংযুক্ত নিকায় ১ম খণ্ড*, প্রথম সংস্করণ (কলিকাতা : ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, ১৪০০), পৃ. ১১৩

৬৪. *সুত্ত নিপাত*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৩৭

৬৫. *ধম্মপদ*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৯৪

৬৬. প্রাগুপ্ত, পৃ. ৯৮

৬৭. প্রাগুপ্ত, পৃ. ৪১

৬৮. প্রাগুপ্ত, পৃ. ১১৭

৬৯. *সংযুক্ত নিকায়*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৫৯

৭০. No higher law than tolerance Narada, *The Dhammapada (Pali Text & Translation with Stories in Brief & Notes).* 4th ed. (Taiwan : Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, 1993), p.165

৭১. ড. সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া, *দশপারমী ও চরিয়াপিটক* (চট্টগ্রাম : ১৯৮৮), পৃ. ৮

৭২. শ্রীমৎ স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য ও শ্রীমৎ জ্যোতিঃপাল মহাস্থবির, *বোধিচর্য্যাবতার* (কোলকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০০৫), পৃ. ৫৩

৭৩. *ধম্মপদ*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৭৪

৭৪. *অঙ্গুত্তর নিকায়*, পঞ্চম নিপাত, প্রাগুপ্ত, পৃ. ২৪৩

৭৫. *সুত্ত নিপাত*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৭৩

৭৬. রোমিলা থাপার, *অশোক ও মৌর্যদের পতন* (কলকাতা : কে পে বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২০০০), পৃ. ১৯

৭৭. Professor D.R. Bhandarkar, *Asoka*, Third Edition (Calcutta : Calcutta University, 1955), p. 72

৭৮. অধ্যাপক বনশ্রী মহাথের, *প্রিয়দর্শী অশোক*, দ্বিতীয় প্রকাশকাল (চট্টগ্রাম : ২০১৬), পৃ, ২১

৭৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *উৎসবের দিন* (ধর্ম)

৮০. *Buddhist Approach to Universal through Good Governance: A Study on Ten Royal Virtues.* Biman Chandra Barua & Neeru Barua, 2019, p. 2-7-208

৮১. শ্রীমৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ভিক্ষু, *বিভঙ্গ* (চট্টগ্রাম : ২০১২), পৃ. ৩০৪

৮২. Narada Maha Thera, *The Buddha and His Teachings*, (Taipei : The Corporate Body of the Biddha Educatinal Foundation), p. 364

৮৩. *সুত্ত নিপাত*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৩৮

৮৪. প্রাগুপ্ত, পৃ. ৩৭

৮৫. *ধম্মপদ*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৯৫

Dhaka University Institutional Repository

৮৬. *What Buddhist Belive*, ibid, p. 166

৮৭. রাজগুরু শ্রীমৎ ধর্মরত্ন মহাস্থবির অনূদিত, *দীর্ঘ নিকায়*, প্রথম খন্ড (রেঙ্গুন : ১৯৬২), পৃ. ১৯৭

৮৮. ভদন্ত মেত্তাবংশ স্থবির অনূদিত, *ইতিবুত্তক* (চট্টগ্রাম : ত্রিপিটক রিসার্চ সোসাইটি, ২০১২), পৃ, ৫৭-৫৮

৮৯. ভদন্ত প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু, *অঙ্গুত্তর নিকায়*, দশম ও একাদশ নিপাত (রাঙ্গামাটি : ২০১১), পৃ. ৪৪৭

৯০. *দশপারমী ও চরিয়াপিটক*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৯

৯১. Prof. Dr. Biman Chandra Barua, *Loving-Kindness to Bring Global Peace: A Study in the Light of Buddha's Teachings*, Cultivating Inner Peace for World Peace, VOL 2, Most Ven. Dr. ich Duc ien Most Ven. Dr. ich Nhat Tu, (Vietnam : Hong Duc Publishing House, 2025) , p. 717-750

৯২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *উৎসবের দিন* (কলিকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩১৫), পৃ. ১০৪

৯৩. Narada Thera, The Buddha and His Teachings (Singapore: 1973), P. 372

৯৪. শান্তরক্ষিত মহাস্থবির সংকলিত, *পালি-বাংলা অভিধান* (ঢাকা : বৌদ্ধধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ২০০৮), পৃ. ১২৭৩০

৯৫. সুভূতি রঞ্জন বড়ুয়া অনূদিত, *অভিধর্মার্থ সংগ্রহ*, প্রথম সংস্করণ (কলিকাতা : ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, ১৯৯১), পৃ. ১০৩

৯৬. Siddhi Butr-Indr. The Social Philosophy of Buddhism, Third Edition (Bangkok : Mahamakut Buddhist University, 1995), p. 131

৯৭. *অভিধর্মার্থ সংগ্রহ*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১০৩

৯৮. Paul Gilbert & Choden, *Mindful Compassion, Using the Power of Mindfulness and Compassion to Transform Our Lives*. (Published Britain : 2013), p. 325

৯৯. রাজগুরু শ্রীমৎ ধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির অনূদিত, *দীর্ঘনিকায়*, ১ম খণ্ড (রাজানগর : রাঙ্গুনীয়া, ১৯৬২), পৃ. ১০০-১০১

১০০. পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির কর্ত্তৃক অনূদিত, *মিলিন্দ প্রশ্ন* (কোলকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০১৩), পৃ. ৩

১০১. ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, *দীর্ঘ নিকায়*, তৃতীয় খণ্ড (কলিকাতা : মহাবোধি সোসাইটি, ১৩৬১), পৃ. ১৬৬

১০২. প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৬৬

১০৩. *সুত্ত নিপাত*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৭১

১০৪. প্রাগুপ্ত, পৃ. ২৫

১০৫. পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৯নং আইন, সূত্র:http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-1132.html

১০৬. *দীর্ঘ নিকায়*, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৬৭

Dhaka University Institutional Repository

১০৭. প্রাগুপ্ত, ১৬৭

১০৮. *সুত্ত নিপাত*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ২৭

১০৯. প্রাগুপ্ত, পৃ. ৭১

১১০. *দীর্ঘ নিকায়*, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৬৮

১১১. প্রাগুপ্ত, ১৬৮

১১২. প্রাগুপ্ত, ১৬৮-১৬৯

১১৩. *দীর্ঘ নিকায়*, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৫১-৬৯

১১৪. ডভক্ষু শীলভদ্র, *দীর্ঘনিকায়*, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় প্রকাশ (চট্টগ্রাম : ২০০৭), পৃ. ১৩৩

১১৫. *জাতক*, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুপ্ত, পৃ. ২৫-২৭

১১৬. প্রাগুপ্ত, পৃ. ২৭

১১৭. *দশপারমী ও চরিয়াপিটক*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৭৯

১১৮. *জাতক*, পঞ্চম খণ্ড, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৪১-৪৫

১১৯. *জাতক*, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুপ্ত, পৃ. ২১১-২১৪, *জাতক*, পঞ্চম খণ্ড, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৪১-৪৫

১২০. *জাতক*, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুপ্ত, পৃ. ২১২

১২১. *জাতক*, পঞ্চম খণ্ড, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৩৮-১৪৯

১২২. *ধম্মপদ*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৪৮

১২৩. প্রাগুপ্ত, পৃ. ৫৪

১২৪. প্রাগুপ্ত, পৃ. ৪১

১২৫. *জাতক*, ষষ্ঠ খণ্ড, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৯৩-১৯৫

১২৬. *অঙ্গুত্তর নিকায়*, পঞ্চম নিপাত, পৃ. ২০১

১২৭. ডক্টর জয়দেব গঙ্গোপাধ্যায় শাস্ত্রী, *ললিতবিস্তর* (কলিকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৯), পৃ. ২৩

১২৮. অধ্যাপক রণধীর বড়ুয়া, *মহামানব বুদ্ধ*, দ্বিতীয় সংস্করণ (চট্টগ্রাম : ১৯৮৫), পৃ. ১৯৯-২০০

১২৯. *দীঘ নিকায়*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১০৬

১৩০. *মহাপরিনিব্বানং সূত্তং*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১-৮

১৩১. *দীর্ঘ নিকায়*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৫৭-১৫৮, *দীর্ঘনিকায়*, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুপ্ত, পৃ. ২২৩

১৩২. ড. বিনেয়ন্দ্রনাথ চৌধুরী, *মধ্যম নিকায়*, তৃতীয় খণ্ড (কলিকাতা : ১৯৯৩), পৃ. ১৯১

১৩৩. Thahissaro Bhikkhu, *The Wing to Awakening* (USA : 1996), p. 177

১৩৪. *সুত্তনিপাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

Dhaka University Institutional Repository

১৩৫. *ধম্মপদ*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৩০

১৩৬. শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত, *জাতক*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

১৩৭. *অঙ্গুত্তর নিকায়*, পঞ্চম নিপাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

১৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

মহামানব বুদ্ধ যিনি বোধিজ্ঞান লাভে নিজেকে প্রকাশিত করলেন। তাঁর সেই প্রকাশের আলোকে সত্যদীপ্তিতে প্রকাশ হলো মানব মুক্তির পথ। তাঁর পদর্শিত পথে একটি সমাজকে সুশৃঙ্খলে পরিণত করা যায়। বর্তমানে নানাবিধ দুঃখ, দুর্দশা, ক্ষুব্ধ-বিক্ষুব্ধ, অশান্তি আর অস্থিতিশীলতা ও সংঘাতময় বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বুদ্ধের বাণী খুবই অত্যাবশ্যক। বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে সহনশীল হতে বুদ্ধের শিক্ষা-দর্শন চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। অর্থাৎ, মহামানব বুদ্ধের বোধিজ্ঞান মানবজাতির ইতিহাসে এক যুগান্তকারী মুহূর্ত। তাঁর সাধনার পরিপূর্ণতা লাভ মানবমুক্তির এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিল। বুদ্ধের প্রকাশিত সত্য অর্থাৎ, চতুরার্য সত্য (দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিরোধ এবং নিরোধের পথ) এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ মানবজীবনের গভীরতম সমস্যাগুলোকে স্পর্শ করে অন্ধকারাচ্ছন্ন মনকে আলোকিত করে।

বর্তমান বিশ্ব যেখানে লোভ, দ্বেষ, মোহ, হিংসা, সংঘাত, বৈষম্য, পরনিন্দা, পরচর্চা ও অস্থিরতায় বিদ্ধ সেখানে বুদ্ধের অমৃতবাণী শান্তি ও সহনশীলতা স্থিতিশীলতা ও পুত-পবিত্র জীবনযাপন এক অনন্য পথনির্দেশক। তাঁর এই শিক্ষা সংঘাতপ্রবণ বিশ্বে শান্তির সন্ধান দেওয়ার পাশাপাশি ব্যক্তিগত, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় জীবনে অনিয়ম, দুর্নীতি, ক্রোধ, লোভ ও মোহের দহন থেকে মুক্তির পথ দেখায়। বুদ্ধের মতে, অরাজকতা অস্থিতিশীলতা, অসহিষ্ণুতা ও অশান্তির মূল কারণ হল অবিদ্যা (অজ্ঞানতা) এবং তৃষ্ণা (আসক্তির অন্তহীন চক্র)। তিনি সমাজকে সুশৃঙ্খল করার জন্য পঞ্চশীল (প্রাণিহত্যা না করা, চুরি না করা, মিথ্যা না বলা, কামাচারে লিপ্ত না হওয়া, মাদকতা বর্জন)-এর মতো নৈতিক ভিত্তি দিয়েছেন। এগুলো কেবল যাপিত ব্যক্তিজীবনেই নয়, বরং সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার মূল চাবিকাঠি। সাম্য ও সুশৃঙ্খল সমাজগঠনে বুদ্ধের দর্শন অদ্বিতীয়।

আজকের বিশ্বে যেখানে পারিবারিক ভুল বোঝাবুঝি, অশান্তি, অস্থিরতা সহিংসতা ও অসহিষ্ণুতা বাড়ছে সেখানে বুদ্ধের সকল প্রাণী সুখী হোক মন্ত্রটি মানবতাকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে নিঃসন্দেহে। তাঁর প্রদর্শিত মধ্যম মার্গ অর্থাৎ, কৃচ্ছতা ত্যাগ করে সংযম ও ভারসাম্যের জীবন বর্তমান যুগের অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা কাটিয়ে সুন্দর জীবন গঠনে প্রশান্তির সন্ধান দেয়। বুদ্ধের এই সহনশীলতার শিক্ষা-দর্শন পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের উন্নতি-অগ্রগতির পথের শক্তিরূপে কাজ করে।

বুদ্ধের দর্শন কেবল ধর্মীয় আচার-আচরণই নয়, এটিকে বিশুদ্ধ জীবনগঠনের নৈয়ায়িক পদ্ধতি বলা হয়। তাঁর বাণী আজও চিরঅম্লান, কারণ এটি মানবমুক্তির সার্বজনীন সত্যপ্রকাশ করে মুক্তি এনে দেয়। এই দর্শন অনুসরণ করে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, বিশ্বশান্তি, ন্যায় ও মৈত্রীর পথে এগিয়ে যেতে পারে। যেখানে অন্ধকার, সেখানে বুদ্ধের আলোই হতে পারে মানুষের পথের দিশা। আলোকিত মানবতার পথে এগিয়ে যেতে হলে সমাজজীবনের সর্বত্রে সর্বপ্রথম বুদ্ধের বাণীর প্রয়োগ প্রয়োজন হবে। প্রয়োজন সঠিক অনুশীলন। শুধু তাই নয় এই শিক্ষা হৃদয়ে ধারণ করে সর্বদা আচার

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহারে তা প্রকাশও করতে হবে। তবেই প্রকৃত সুফলতা পাওয়া যাবে। অসুস্থ হলে যেমন ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে রোগ অনুসারে ওষুধ গ্রহণের জন্য ব্যবস্থাপত্র বা প্রেসক্রিপশন প্রদান করেন। সেই ক্ষেত্রে রোগী ওষুধের নাম জানা থাকলেই সুস্থ হবে না, সেই ব্যবস্থাপত্র বা প্রেসক্রিপশন অনুসারে সঠিক নিয়ম মেনে ওষুধ সেবন করতে হবে। তবেই সুস্থতা প্রাপ্ত হয়। ঠিক তেমনি বুদ্ধের শিক্ষা-দর্শন মানবমুক্তির নির্দেশনা প্রদান রয়েছে তা শুধু জানা থাকলেই হবে না সেই অনুসারে তা অনুশীলন করতে হবে তবেই মিলবে মানবমুক্তি।

সমাজে নিম্ন পর্যায় থেকে উচ্চ পর্যায়ে রয়েছে অন্যায়-অবিচার, অনিয়ম আর দুর্নীতি রয়েছে। সমাজের মূল চালিকাশক্তি যুবসমাজ ধ্বংসের অন্যতম প্রধান কারণ নেশা জাতীয় মাদক দ্রব্য। নীতি বর্জিত মানুষ। লিঙ্গ অসমতা থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি পর্যায়ের অসমনীতি। সমাজের ব্যক্তির ভয়ংকর চিত্র। হত্যাসহ মানবজীবনের বহুবিধ সমস্যা, সমস্যার কারণ, সমস্যা সমাধান ও সমাধাণের উপায়সমূহ বিশ্লেষণ করে বুদ্ধের প্রদর্শিত নির্দেশনার উপর গুরুত্ব প্রদান করে এ অভিসন্দর্ভে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া সমাজ বিনির্মাণে বুদ্ধের প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতির ব্যবহারিক প্রয়োগ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে এতে উপস্থাপন করা হয়েছে। সমাজের মূলভিত্তি পরিবেশ। পরিবেশকে অবলম্বন করে সকল প্রকার কাজ কর্ম সম্পাদিত করা হয়। তাই সর্বাগ্রে পরিবেশের সুস্থতা চিন্তা করা আবশ্যক। আর এই পরিবেশের প্রতি প্রবল আকর্ষণ বুদ্ধের শিক্ষা দর্শনের পরতে পরতে পাওয়া যায়। তিনি পরিবেশের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে মহান ভিক্ষু-সংঘ ও উপাসক-উপাসিকাদের বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করে গেছেন। উক্ত অভিসন্দর্ভে সমাজ বিনির্মাণে পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্বসহ প্রয়োজনীয় দিক সম্পর্কে উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে পরিবেশের উপর ব্যক্তির প্রভাবের আলোকে পরিবেশ থেকে ব্যক্তি সমাজের প্রাপ্তির বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, সুস্থ জীবনের জন্য প্রয়োজন সুস্থ পরিবেশ। আর এই সামগ্রিক বিষয় যাদের চিন্তা-চেতনায় নিয়ে সমাজ-রাষ্ট্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অবিবরত কাজ করে চলেছেন তাঁরা হলেন শাসক বা রাজা। বুদ্ধ তাঁর শিক্ষায় আধ্যাত্বিক বিষয়ে মুক্তির পথ যেমন দেখিয়ে গেছেন ঠিক তেমনি তিনি সমাজের কল্যাণের মুক্তির পথ হিসেবে একজন শাসকের আদর্শ, আচার-আচরণ, নীতি, মানবিকতা, উদারতা, সংযম, তপ, দৃঢ়তা, গুণাবলি সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্যের বিষয়েও দিক নির্দেশনা প্রদান করে গেছেন। আর এই আদর্শ নীতি অনুসরণ করে সমাজের সার্বিক চিত্রপট পরিবর্তন করে সুশৃঙ্খল সমাজ বিনির্মাণ করা যাবে। যদি কেউ নিয়ম-নীতিগুলো পরিপালন করে তবে সমাজ সুশৃঙ্খলের সাথে আদর্শসমাজে পরিণত হবে যা টেকসই সমাজের ভিত্তি মজবুত করে তুলবে। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বুদ্ধের নীতিগুলোই পারে একটি সুষম, ন্যায়ভিত্তিক ও শান্তিপূর্ণ সুশৃঙ্গল সমাজগঠনে ভিত্তি রচনা করতে, যা কিনা টেকসই উন্নয়নের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বুদ্ধের নির্দেশিত ব্যক্তিজীবনের ব্যবহারিক দর্শন ও সামগ্রিক নীতিমালা সুশৃঙ্খল সমাজ বিনির্মাণের একটি বিজ্ঞানসম্মত ও আদর্শিক রূপরেখার কাঠামো প্রদান করে। সমাজের সর্বস্তরে বিদ্যমান সকল প্রকার অনিয়ম, দুর্নীতি, মাদকাসক্তি,

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিক অবক্ষয়, সামাজিক বৈষম্য, পরিবেশ বিপর্যয় এবং অমানবিকতাসহ সকলপ্রকার সমস্যার মূলে রয়েছে অজ্ঞানতা, লোভ, দ্বেষ, মোহ, হিংসা, সন্দেহ ও ঘৃণার মতো মানসিক বিষয়সমূহ। বুদ্ধের মানবিক শিক্ষা-দর্শন এই সমস্যাগুলোর গভীর কারণ চিহ্নিত করে সমাধানের পথ দেখায়, যার কেন্দ্রে রয়েছে প্রজ্ঞা (সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প), শীল (সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা) ও সমাধি (সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি)। বুদ্ধের শিক্ষায় যথার্থ জ্ঞান, নৈতিকতা আর অন্তর্নিহিত শুদ্ধতা বিকশিত হয়।

রাজা/শাসক তাঁর শিক্ষা-দর্শন মেনে রাজ্য/রাষ্ট্র শাসন করলে শান্তি, সামাজিক স্থিতিশীলতা, ন্যায়পরায়নতা, বৈষম্যহীনতা, মানবিকতা স্থায়ীত্ব হবে। সমাজে বুদ্ধ নির্দেশিত নীতিমালা টেকসই সমাজগঠনের মূলভিত্তি হিসেবে কাজ করে। তাঁর অভূতপূর্ণ অভিনব উপায় মধ্যম পথ ব্যক্তিগত মুক্তির পাশাপাশি সমষ্টিক শান্তি, শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধিরও পথনির্দেশক। একটি সুশৃঙ্খল সমাজের জন্য প্রয়োজন নৈতিক মূল্যবোধ ও গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার, যা বুদ্ধের শিক্ষা পঞ্চশীল, চারি আর্যসত্য, ব্রহ্মবিহার, অষ্টবিদ মার্গ, সহনশীলতার ও সপ্ত অপরিহানীয় নীতির মাধ্যমে অর্জনযোগ্য।

অভিসন্দর্ভে আলোচিত সমস্যা ও সমাধানসমূহ বিশ্লেষণে স্পষ্ট যে, বুদ্ধের শিক্ষা কেবল ধর্মীয় অনুশাসন নয়, এটি একটি ব্যবহারিক জীবনদর্শন, যা যুগে যুগে সুশৃঙ্খল সমাজ বিনির্মাণে অবদান রাখতে সক্ষম। তাই ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় রাষ্ট্র ও বৈশ্বিক পর্যায়ে এই নীতির প্রয়োগই পারে একটি সুষম, আদর্শ, ন্যায়ভিত্তিক, বৈষম্যহীন, শান্তিপূর্ণ, স্থিতিশীল ও পরিবেশবান্ধব সমাজ গড়ে তুলতে, যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (SDGs) -এর সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ। পরিশেষে বলা যায়, বুদ্ধবাণীর বাস্তবায়নই হতে পারে মানবতার মহাকল্যাণের এক অনন্য মাইলফলক। বুদ্ধের একটি দেশিত গাথার সুরে সুর মিলিয়ে বলা যায়, 'অপ্পমাদো অমতপদং' অপ্রমাদই অমৃতের পথ। অর্থাৎ, সচেতনতা ও দায়িত্ববোধই সুশৃঙ্খল সমাজ বিনির্মাণের চাবিকাঠি।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা বই

অধ্যাপক বনশ্রী মহাথের, *প্রিয়দর্শী অশোক*, দ্বিতীয় প্রকাশ (চট্টগ্রাম : ২০১৬)

অধ্যাপক রণধীর বড়ুয়া, *মহামানব বুদ্ধ*, দ্বিতীয় সংস্করণ (চট্টগ্রাম : ১৯৮৫)

অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া, *অঙ্গুত্তর নিকায়*, প্রথম খণ্ড (এক, দুক, তিক নিপাত), দ্বিতীয় সংস্করণ (রাঙ্গামাটি : বনভান্তে প্রকাশনী, ২০০৪)

অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া অনূদিত, *অঙ্গুত্তর নিকায়*, চতুর্থ খণ্ড, প্রথম প্রকাশ (রাঙ্গামাটি : ২০০৫)

অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া, *অঙ্গুত্তর নিকায়*, সপ্তম, অষ্টম, নবম নিপাত, প্রথম প্রকাশ (রাঙ্গামাটি : ২০০৫)

অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া, *ত্রিপিটকে বৌদ্ধ নীতি-সমীক্ষা ও ধর্ম-দর্শন এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ* (ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০২১)

উপ-সংঘনায়ক অধ্যাপক বনশ্রী মহাথের, *প্রিয়দর্শী অশোক*, দ্বিতীয় প্রকাশ (চট্টগ্রাম : ২০১৬)

করুণানন্দ ভিক্ষু, *পালিসাহিত্যে নগরবিন্যাস ও নগরজীবন*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪)

গিরিশচন্দ্র বড়ুয়া অনূদিত, *ধম্মপদ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী ১৯৭৭),

চারুচন্দ্র বসু সম্পাদিত, *ধম্মপদ*, সপ্তম পুনর্মুদ্রণ (কোলকাতা: ২০১০, মহাবোধি বুক এজেন্সী)

জ্যোতিপাল মহাস্থাবির অনূদিত, *বোধিচর্যাবতার* (ঢাকা : ১৯৯৪, বাংলা একাডেমী)

জ্যোতিপাল ভিক্ষু অনূদিত, *উদানং* (খাগড়াছড়ি : ২০১৩)

ডক্টর জয়দেব গঙ্গোপাধ্যায় শাস্ত্রী, *ললিতবিস্তর* (কলিকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৯)

ড. জিনবোধি ভিক্ষু, *তথাগত বুদ্ধের বোধি-বিধি* (চট্টগ্রাম : ২০০৩)

ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া, *প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়* (ঢাকা : জাগৃতি প্রকাশনী, ২০২৪)

ডক্টর বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী অনূদিত, *মজ্ঝিম নিকায়*, তৃতীয় খণ্ড (কলিকাতা : ধর্মধার বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশনী, ১৯৯৩)

ড. বিনয়েন্দ্র নাথ চৌধুরী অনূদিত, *মধ্যম নিকায়*, তৃতীয় খণ্ড (কলিকাতা : ১৯৯৩)

ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক, *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, বাংলা একাডেমি, সপ্তদশ পুনর্মুদ্রণ ২০১৪

ড. সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া, *দশপারমী ও চরিয়াপিটক* (চট্টগ্রাম : ১৯৮৮)

ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত, *মধ্যম নিকায়*, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ (কলিকাতা : ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, ১৩৯৪ বাংলা)

নীরু বড়ুয়া অনূদিত, *পালি কাব্যে তেলকটাহ গাথা*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা : মিজান পাবলিশার্স, ২০০৮)

পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত, *মধ্যম নিকায়*, দ্বিতীয় খণ্ড (কলিকাতা : ১৯৯৪, ধর্মাধার বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশনী)

পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত, *মিলিন্দ প্রশ্ন* (কলকাতা : ধর্মাধার বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশনী, ১৯৯৫)

পন্ডিত শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির, শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, *মিলিন্দপ্রশ্ন* (কলকাতা : ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, ১৯৯৫)

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমময় দাশগুপ্ত সংকলিত, *ফ-হিয়েনের দেখা ভারত* (কলিকাতা : ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৬)

প্রেমময় দাশগুপ্ত সংকলিত, *হিউয়েন সাঙের দেখা ভারত* (কলিকাতা : ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৭)

প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত, *মহাবর্গ* (তাইওয়ান: সন অনুল্লেখিত, করপর‍্যাট বডি অব দি বুদ্ধ এডুকেশনাল ফাউন্ডেশন)

প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু অনূদিত, *অঙ্গুত্তর নিকায়*, পঞ্চম নিপাত (রাঙ্গামাটি : ২০০৮)

বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, সপ্তদশ পুনর্মুদ্রণ (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০১৪)

বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, পরিমার্জিত সংস্করণ (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০১৪)

বেলু রানী বড়ুয়া অনুদিত, থেরী গাথা (ঢাকা : ২০০৪)

বেণীমাধব বড়ুয়া, *মধ্যম নিকায়*, প্রথম খণ্ড (কলিকাতা : যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ত্রিপিটক বোর্ড, ১৯৪০)

বিনয়াচার্য ভদন্ত সত্যপ্রিয় মহাথের, *চূল্লবর্গ* (রাঙ্গামটি : বনভান্তে প্রকাশনী, ২০০৩)

বিশুদ্ধনন্দ মহাস্থবির, *সত্যদর্শন* (কলিকাতা : ১৯৫৩)

ভদন্ত ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, ভদন্ত সুমন স্থবির, ভদন্ত বঙ্গিস ভিক্ষু, ভদন্ত অজিত ভিক্ষু, ভদন্ত সীবক ভিক্ষু অনূদিত, *অঙ্গুত্তর নিকায়*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, *চতুর্থ নিপাত*, তৃতীয় প্রকাশ (রাঙ্গামাটি : ২০১৫)

ভদন্ত ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু, ভদন্ত বঙ্গিস ভিক্ষু, ভদন্ত অজিত ভিক্ষু, ভদন্ত সীবক ভিক্ষু অনূদিত, *মহানির্দেশ*, প্রথম প্রকাশ (বাংলাদেশ : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, ২০১৪)

ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু, *বিনয় পিটকে পাচিত্তিয* (চট্টগ্রাম : বনভন্তে-প্রজ্ঞাবংশ একাডেমী, ২০০৭)

ভদন্ত প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু, *সূত্র পিটকে অঙ্গুত্তর নিকায়. পঞ্চম নিপাত* (রাঙামাটি : রাজবন বিহার ২০০৮)

ভদন্ত, প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু, *অঙ্গুত্তর নিকায়*, দশম ও একাদশ নিপাত (রাঙ্গামাটি : রাজবন বিহার, ২০১১)

ভদন্ত বুদ্ধবংশ ভিক্ষু অনূদিত, *পারাজিকা*, প্রথম প্রকাশ (চট্টগ্রাম : প্রজ্ঞাবংশ সদ্ধর্মগ্রন্থ প্রকাশনী)

ভদন্ত মেত্তাবংশ স্থবির অনূদিত, *ইতিবুত্তক* (চট্টগ্রাম : ত্রিপিটক রিসার্চ সোসাইটি, ২০১২)

ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, *দীর্ঘনিকায়*, দ্বিতীয় খণ্ড (কলিকাতা : মহাবোধি সোসাইটি, ১৯৫৪)

ভিক্ষু শীলভদ্র, *দীর্ঘ নিকায়*, তৃতীয় খণ্ড, তৃতীয় প্রকাশ (রাঙ্গামাটি : সদ্ধর্মপ্রাণ দায়ক-দায়িকা, ২০০৭)

ভিক্ষু শীলভদ্র, *থেরীগাথা* (কলিকাতা : মহাবোধি সোসাইটি)

মলয় চট্টোপধ্যায় অনূদিত, *বৌদ্ধদর্শন* (কলকাতা : ১৯৯৭)

রাজগুরু শ্রীমৎ ধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির অনূদিত, *দীর্ঘনিকায়*, ১ম খণ্ড (রাজানগর : রাঙ্গুনীয়া, ১৯৬২)

রাজগুরু ধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির অনূদিত, *মহাপরিনিব্বানং সূত্তং* (তাইওয়ান : করপর‍্যাট বডি অব দি বুদ্ধ এডুকেশনাল ফাউন্ডেশন সন অনুল্লেখিত)

রণব্রত সেন অনূদিত, *ধম্মপদ*, দ্বিতীয় মুদ্রণ (কলকাতা : হরফ প্রকাশনী)

রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, *পালি সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড (ঢাকা : বংলা একাডেমী, ১৯৮০)

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *উৎসবের দিন* (কলিকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩১৫)

রোমিলা থাপার, *অশোক ও মৌর্যদের পতন* (কলকাতা : কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২০০০)

শান্তরক্ষিত মহাস্থবির সংকলিত, *পালি-বাংলা অভিধান*, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা : বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ২০০১)

শান্তপদ মহাস্থবির সংকলিত, *পালি-বাংলা অভিধান*, দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা : বৌদ্ধধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ২০০৮)

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত, *জাতক*, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ (কলিকাতা : করুণা প্রকাশনী, ১৩৮৪)

শ্রীঈশান চন্দ্র ঘোষ অনূদিত, *জাতক*, দ্বিতীয় খণ্ড, করুণা প্রকাশনী (কলিকাতা : করুণা প্রকাশনী, ১৩৯৮)

শ্রী ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত, *জাতক*, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ (কলিকাতা : করুণা প্রকাশনী, ১৩৯১ বাংলা)

শ্রী ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত, *জাতক*, চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ (কলিকাতা : করুণা প্রকাশনী, ১৩৯১ বাংলা)

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত, *জাতক*, পঞ্চম খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ (কলিকাতা : করুণা প্রকাশনী, ১৩৯৮)

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত, *জাতক*, ষষ্ঠ খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ (কলিকাতা : করুণা প্রকাশনী, ১৩৯১)

শ্রী জ্যোতিপাল ভিক্ষু অনূদিত, *বোধিসুত্তং*, উদানং (খাগড়াছড়ি : ২০১৩)

শ্রীমৎ জ্যোতিঃপাল ভিক্ষু অনূদিত, *উদান*, পরিমার্জিত সংস্করণ (চট্টগ্রাম : ত্রিপিটক রিসার্চ সোসাইটি, ১০১৯)

শ্রীমৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ভিক্ষু, *অভিধর্ম পিটকে বিভঙ্গ (*চট্রগ্রাম : ২০১২)

শ্রীধর্ম্মজ্যোতিঃ স্থবির, শ্রীনীলাম্বর বড়ুয়া অনূদিত, *খুদ্দক পাঠো* (কলিকাতা : ১৯৫৫)

শ্রীমৎ ধর্মতিলক স্থবির অনূদিত, *বুদ্ধবংশ* (চট্টগ্রাম : ত্রিপিটক রির্সাচ সোসাইটি, ২০১৯)

শ্রীধর্ম্মতিলক স্থবির, *সদ্ধর্ম রত্নাকর* (রেঙ্গুন বৌদ্ধ-মিশন প্রেসে মুদ্রিত, ১৯৩৬)

শ্রী ধর্ম্মজ্যোতি স্থবির, *খুদ্দকপাঠো* (কলিকাতা : ১৯৫৫)

শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত, *মিলিন্দ প্রশ্ন*, (কোলকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০১৩)

শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া অনূদিত, *মধ্যম নিকায়* (কলিকাতা : যোগেন্দ্র রূপসী বালা ত্রিপিটক বোর্ড, ১৯৪০)

শ্রীমৎ বঙ্গীস ভিক্ষু, শ্রীমৎ অজিত ভিক্ষু, শ্রমিৎ প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষৃ অনূদিত, *সংযুক্ত নিকায়*, মহাবর্গ (খাগড়াছড়ি : ২০১১)

শ্রীমৎ স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য ও শ্রীমৎ জ্যোতিঃপাল মহাস্থবির, *বোধিচর্য্যাবতার* (কোলকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০০৫)

শ্রী শীলালঙ্কার মহাস্থবির অনূদিত, *ধম্মপদট্ঠকথা*, প্রথম খণ্ড (কোলকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সী)

শীলানন্দ ব্রহ্মচারী অনূদিত, *সংযুক্ত নিকায় ১ম খণ্ড*, প্রথম সংস্করণ (কলিকাতা : ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, ১৪০০)

শীলানন্দ ব্রহ্মচারী অনূদিত, *সংযুক্ত নিকায়*, ১ম ও ২য় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ (রাঙ্গামাটি : সদ্ধর্মপ্রাণ দায়ক-দায়িকা, ২০০৯)

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বৌদ্ধধর্ম (কলিকাতা : ১৯৯৫, করুণা প্রকাশনী)*

সাধনানন্দ মহাস্থাবর অনূদিত, *সুত্তনিপাত* (বান্দরবান : ২০০৭)

স্থবির, *থেরগাথা*, প্রথম সংস্করণ (রেঙ্গুন বৌদ্ধ মিশন প্রেসে মুদ্রিত : ১৯৩৫)

স্বামী বিদ্যারণ্য, *বৌদ্ধদর্শন ও ধর্ম* (কলিকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৪)

Dhaka University Institutional Repository

সুকোমল চৌধুরী সম্পাদিত, *গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন* (কলিকাতা : ২০০৮)

সুকোমল বড়ুয়া এবং সুমন কান্তি বড়ুয়া, *ত্রিপিটক পরিচিতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০০)

সুকোমল চৌধুরী অনূদিত, *মনুষ্য বিকাশে ধর্ম* (ঢাকা : ১৯৮৮)

সুব্রতকুমার সাহা, *পরিবেশবিজ্ঞান*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৭)

সুভূতিরঞ্জন বড়ুয়া, *বৌদ্ধ মহিয়সী নারী* (কলিকাতা : ১৪০০)

সুভূতি রঞ্জন বড়ুয়া অনূদিত, *অভিধর্মার্থ সংগ্রহ*, প্রথম সংস্করণ (কলিকাতা : ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, ১৯৯১)

সুমঙ্গল বড়ুয়া অনূদিত, *অঙ্গুত্তর নিকায়*, চতুর্থ খণ্ড, বনভান্তে প্রকাশনী, ২০০৫

সোলায়মান আলী সরকার, *ভারতের দর্শন পরিচিতি* (ঢাকা: ২০০৪, বাংলা একাডেমী)

হিল্লো বড়ুয়া সম্পাদিত সৌম্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাকা : বৌদ্ধ ছাত্র সংসদের মুখপত্র, ২০০০)

হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী, *প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস* (কলিকাতা : ১৯৮৯)

Dhaka University Institutional Repository

English Book

Ajaha Sumedho, *Teaching from the silent mind* (Taiwan : The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, 1996)

Ajahn Sumedho, *Cittaviveka-The Teaching from the Silent Mind* (Taipei : The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, 1996)

Biman Chandra Barua & Neeru Barua, *Buddhist Approach to Universal through Good Governance: A Study on Ten Royal Virtues* (Vietnam : Hong Duc Publishing House, 2019)

Buddhadasa Bhikkhu, *Hand Book for Mankind* (Bangkok : Thammasapa, 2002)

Christopher Hobson, *The Rise of Democracy Revolution, War and Transformations in International Politics since 1776* (Edinburgh University Press Ltd : 2015)

Butr-Indr, Siddhi, *The Social Philosophy of Buddhism.* 3rd ed. (Bangkok : Mahamakut Buddhist University, 1995)

Celia E.Deane-Drummond, *The Ethics of Nature* (Oxford : Blackwell, 2004)

Chatsumarn Kabilsingh, Quoted in Buddhism and Ecology- The Interconnection of Dharma and Deeds (Cambridge : Massachusetts, 1997)

Dhammananda, K. S., *What Buddhist Belive,* 5th ed. (Taiwan: The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, 1993)

Darlington, S. M., *The Ordination of a Tree: The Thai Buddhist Environmental Movement* , 2nd edition (Albany : State University of New York Press, 2018)

Dipak Kumar Barua, *Studies in the Gospel of Buddha for Modern Perfectives*, First Edition, Center *for Buddhist Studies* (Varanasi : Banaras Hindu University, 2005)

Daniel H. Henning, *A Manual for Buddhism and Deep Ecology* (World Buddhist University : 2006)

Gnanarama, V. P., An *Approach to Buddhsit Social Philosophy*, 1st ed. (Singapore : Ti-Sarana Buddhist Association,1996)

Hasnat Abdul Hye, *Goverance South Asian Perpectives,* 1st ed. (Dhaka : The University Press Limited, 2000)

John Hamilton Hallowell, *Main currents in Modern Political Thought* (New York-holt : Rinehart and Winston, 1960)

J. Baird Callicott, *Earth's Insights: A Survey of Ecological Ethics from the Mediterranean Basin to the Australian Outback* (Berkeley: University of California Press, 1994)

Dhaka University Institutional Repository

K. Sri Dhammapada, *What Buddhist Believe* (Taiwan: The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, 1996)

Kabilsingh, C, Chankaew, J. & Kabilsingh, P. *Buddhism for Preservation of Nature* (Bangkok: Thammasart University Press, 1991)

Kabilsingh, *A Cry from the Forest* (Bangkok : Printing House Co Ltd, 1987)

Kemper, S., *Rescuing the Buddha: Buddhism, Monks, and the Forest in Sri Lanka,* In *Theravada Buddhism in Colonial Contexts* (Routledge :2020)

Mary Evelyn Tucker and Duncan Rytken Williams, *Buddhism and Ecology- The Interconnection of Dharma and Deeds* (Cambridge : Massachusetts, 1997)

Mary Evelyn Tucker and Duncan Rytken Williams, p. 33-34

Narada, *The Dhammapada (Pali Text & Translation with Stories in Brief & Notes).* 4th edition (Taiwan: Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, 1993)

Narada Maha Thera, *The Buddha and His Teachings* (Taipei : The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation)

Narada Thera, The Buddha and His Teachings (Singapore: 1973)

Oxford Advanced Learner's Dictionary, Sixth edition (Oxford : Oxford University Press, 2000)

Professor D.R. Bhandarkar, *Asoka*, Third Edition (Calcutta : Calcutta University, 1955)

Rao, D. B. S., *Guidelines for Good Governence,* 1st edition (Dhaka : Centre on Integrated Rural

Towards Sustainable Development that Leaves no one behind, 2013, p. 1-27 available at : https://www.atd-fourthworld.org/wp content/uploads/sites/5/2015/07/Working_Paper_ATD_Fourth_World_Participatory_Research_June_2013.pdf

Payutto, P. A., *Toward sustainable science* (Bangkok : Buddhadhamma Foundation, 1995)

Payutto, P., *A Constition for Living.* 1st impression edition (Bangkok : Buddhadhamma Foundation, 1998)

Prof. Dr. Biman Chandra Barua, *Loving-Kindness to Bring Global Peace: A Study in the Light of Buddha's Teachings*, Cultivating Inner Peace for World Peace, VOL 2, Most Ven. Dr. ich Duc ien Most Ven. Dr. ich Nhat Tu, (Vietnam : Hong Duc Publishing House, 2025)

P. A. Payutto, *Buddhist solutions* (Bangkok : Buddhadhamma Foundation, 1994)

Paul Gilbert & Choden, *Mindful Compassion, Using the Power of Mindfulness and Compassion to Transform Our Lives* (Published Britain : 2013)

Dhaka University Institutional Repository

Savindra Singh, *Environmental Geography*, Revised Edition (Allahabad: 2004, Prayag Pustak Bhawan)

Sunthorn, P., *Basic Buddhist Course.* 1st edition (USA: 1991)

Shann. Davies (Ed.), *An ethical approach to environmental education- Buddhism and Protection of nature*, Tree of life (Geneva: Buddhist Perception of Nature, 1987)

Schober, J., *Buddhist Activism and Climate Justice in Myanmar,* In *Routledge Handbook of Religion and Ecology* (Routledge : 2019)

T. W Rhys Davids and William Stede, *Pali English Dictionary,* Reprint (Delhi : Motilal Banarisidas Publishers Private Limite, 2003)

Thahissaro Bhikkhu*, The Wing to Awakening* (USA : 1996)

Venerable Ajahn Chah, *Living Dhamma,* Reprinted (Taipei : The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, 1995)

Ven. Dr. Hang Lien Bhikkhuni, *Nurturing Inner to Peace to Contribute to World Peace*, *Cultivating Inner Peace for World Peace*, VOL 2, Most Ven. Dr. ich Duc ien Most Ven. Dr. ich Nhat Tu, (Vietnam : Hong Duc Publishing House, 2025)

Ven. Pategarna Gnanarama, An Approach to Buddhist Social Philosophy, Ti-Sarana Buddhist Association, First published in (Singapore : 1996)

Vincent A Smith, Asoka-*The Buddhist Emperor of India*, Reprint (Delhi : Low Price Publication, 2013)

Walpola Rahula, *What the Buddha Taught* (Gordon Fraser Gallery : 1978), p.88-89

Research Journal

The Role of Buddhism in Environmental Protection and Sustainable Development in Vietnam Today, Pham Cong Nhat, International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE), *Volume 6, Issue 5, May 2019, PP 74-82,* available at : http://dx.doi.org/10.20431/2349-0381.0605007, www.arcjournals.org

International Mother Earth Day 2020 accessed on 24 May 2025 His Holiness the Dalai Lama's Message for Earth Day 2020, available at : https://tibet.net/his-holiness-the-dalai-lamas-message-for-earth-day-2020/

Kongsak Thathong,A spiritual dimension and environmental education: Buddhism and environmental crisis. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, *46*, 5063-5068. Procedia- Social

Dhaka University Institutional Repository

and Behavioral Sciences 46 (2012) 5063 – 5068, DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.06.386 *available at :* https://www.nasa.gov/people/sunita-l-williams/

Satyarth Prakash, *Application of Applied and Engaged Buddhism in Existing Society*, International Journal of Research in Humanities & Soc. Sciences, Vol. 5, Issue: 5, (May : 2017) ISSN:(P) 2347-5404 ISSN:(O)2320 771X, P. 25.

The View of the Buddhist about the Cause of Violence, Conflict, War and Method of Remedy, Tran Duc Nam, Mindful Leadership for a Sustainable Peace, Editors: Most Ven. Thich Nhat Tu, Most Ven. Thich Duc Thien, Mindful Leadership for a Sustainable Peace, Viernam, Hong Duc Publishing House, 2019, p. 477.

Satyarth Prakash, *Application of Applied and Engaged Buddhism in Existing Society*, International Journal of Research in Humanities & Soc. Sciences. Vol. 5, Issue: 5, (May :2017) ISSN:(P) 2347-5404 ISSN:(O)2320 771X, P. 25.

Dr. Rahul Tripathi, *Good Governance : Origin, Importance and Development in India*. *International Journal of Development Research* (IJDR), 2017 Vol. 07, Issue, 11**,** p. 16968-16970

Development for Asia and the Pasific (CIRDAP) 2005), p. 142

Websites

https://www.bishleshon.com/7229/

https://www.momscleanairforce.org/dalai-lama-climate-appeal-to-the-world-book/

https://www.sundaytimes.lk/110109/Plus/plus_12.html

https://www.researchgate.net/publication/341519914_The_Age_Of_The_Eco-Sattva_Practical_Conservation_Consequences_Of_Buddhist_Belief/figures?lo=1

https://in.pinterest.com/pin/112238215683353613/

https://in.pinterest.com/pin/781163497851991015/

https://a-z-animals.com/articles/discover-the-bodhi-tree-and-why-its-so-important-throughout-the-world/

https://gyokyo.blog/wp-content/uploads/2020/12/bodhi-leaves.jpg

https://peacepaul.wordpress.com/2018/01/21/sujata-the-buddhas-last-teacher/

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Venuvana1.jpg

https://www.pelago.com/en-SG/activity/p2vtmm5l4-pilgrimage-to-jetavana-monastery-lucknowto-shravasti-day-trip-lucknow/

Dhaka University Institutional Repository

https://www.buddhistdoor.net/features/honey-offering-festival-commemorating-service-of-animals-to-the-buddha/

https://elinepa.org/who-owns-the-swan/

https://www.namchak.org/community/blog/ten-virtues-and-non-virtues/

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-1132.html

https://www.artaqua.co/who-80-of-deadly-diseases-from-unsafe-water/

https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/43840/9789241596435_eng.pdf?sequence=1,

Report Title: *"Safer water, better health: Cost, benefits and sustainability of interventions to protect and promote health"*

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/150136/review-compendium-environmental-policies-and-laws-bhutan.pdf, Review and Compendium of Environmental Policies and Laws in Bhutan Input to the Asian Judges Network on Environment Prepared by Antonia Gawel and Irum Ahsan

Socio-economic and environmental issues in development, 692

https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-for-infection-prevention-precautions

http//wwwmindfulnesbell.org.

http://www.raijmr.com/ijrhs/wp-content/uploads/2017/11/IJRHS_2017_vol05_issue_05_04.pdf